মনীষী-জীবনকথা

নূতন তথ্যাবলী সংযোজিত

সুশীল রায়

ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা ১২

ভূমিকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে 'ভারত-পথিক' রামমোহনকে আশ্রয় করে বাংলাদেশে চিন্তায় কল্পনায় ও কর্মে যে নতুন জীবনচেতনা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, বিগত এক শ পঁচিশ-ত্রিশ বছর ধরে আমরা সেই চেতনারই বিকাশ ও বিস্তার প্রত্যক্ষ করে আসছি। যে-সব কর্মবীর, জ্ঞান- ও চিন্তা- বীর মনীষী এই নতুন জীবনচেতনার স্পর্শ পেয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের জীবনকে গড়ে তুলেছিলেন কয়েকটি মৌলিক মূল্যবোধের আশ্রয়ে। এই মৌলিক মূল্যগুলিই উনিশ শতকীয় বাঙালীর সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের মূল। বিংশ শতকের প্রথম পাঁচ দশকেও আমরা সেই মূল্যগুলির জের টেনে চলেছি।

কিন্তু, গত দুই-তিন দশকে সেই উনিশ শতকীয় মূল্যগুলি আমাদের বোধ ও বুদ্ধিতে ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে, তাদের শক্তি ও আবেদন কমে আসছে। তাদের জায়গায় নতুন মূল্যবোধ ক্রমশ দেখা দিচ্ছে, কিন্তু এখনও প্রতিষ্ঠালাভ করছে না; এখনও পুরাতন মূল্যগুলির আকর্ষণ একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় নি। রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত উনিশ শতকীয় বাংলা-সংস্কৃতির সুবর্ণযুগ; কিন্তু তার পরেও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ অনেক জীবনের বিকাশ প্রত্যক্ষ করেছে, যে-জীবনে পুরাতন মূল্যগুলিরই সগৌরব প্রতিষ্ঠা। এ ধরণের জীবন বাংলাদেশে আর বেশি দিন দেখা যাবে না; ইতিহাসের নিয়মেই তা আর সম্ভব হবে না। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বা আচার্য যদুনাথ সরকারের মতন মনীষীর মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে মনে হচ্ছে, সেই উনিশ শতকীয় মূল্যবোধসম্পন্ন বাঙালী বোধ হয় আমাদের মধ্যে আর বেশি বেঁচে নেই; যে দু-চার জন আছেন তাঁদের আয়ুবল ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাঁদের জীবনা-বসানের সঙ্গেসঙ্গেই বাঙালীর ইতিহাসের একটি গৌরবময় পর্ব শেষ হবে, এবং আর-এক নতুন পর্বের উন্মোচন ঘটবে। তার সূচনা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে।

কিন্তু তার আগে যে পর্বটি শেষ হতে যাচ্ছে, তার শেষ অধ্যায়ের স্মরণীয় চরিত্রগুলির কথা একবার স্মরণ করা ভালো। তাঁদের কথা একটু জেনে রাখা, মাঝেমাঝে তাঁদের জীবন অনুধ্যান করা প্রয়োজন, শুধু ঐতিহ্য আয়ত্ত করবার

জন্য নয়, যে নতুন পর্ব উন্মোচিত হতে যাচ্ছে তাকেই সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করবার জন্য।

শ্রীযুক্ত সুশীল রায় মশায়ের এ-বইখানা সেই উদ্দেশ্যে কাজে লাগবে বলে আমার ধারণা।

বইখানাতে সুশীলবাবুর ভূমিকা শ্রদ্ধাবান দর্শনের; সাহিত্যিকের নয়, সাংবাদিকের নয়, ঐতিহাসিকের নয়, জীবনীকারেরও নয়। তিনি ঘুরে ঘুরে সমসাময়িক তেত্রিশ জন বাঙালী মনীষীর সঙ্গে দেখা করেছেন, গল্প করেছেন, এবং গল্পচ্ছলে বসে বসে তাঁদের স্কেচ বা রেখাচিত্র এঁকেছেন ভাষার আশ্রয়ে। এঁকেছেন খুব দ্রুত, স্কেচ যা হয়ে থাকে, কিন্তু রেখার টানগুলো সাজানো-গুছানো, এবং প্রত্যক্ষতার পরিচয় তাঁর রেখারচনায় সুস্পষ্ট। যেহেতু তাঁর ভূমিকা প্রধানত দর্শকের, সেই হেতু তাঁর রচনার মেজাজ হালকা হলেও তথ্যের দিক থেকে হালকা নয়। সমসাময়িক কালের তরুণতরুণীরা, যাদের সুযোগ হয়নি এই মনীষীদের দেখবার এবং এঁদের কর্মকৃতি জানবার, তারা, এবং ভাবীকালের বাঙালী, যাঁরা কখনও এঁদের দেখবেন না বা এঁদের কথা জানবার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন না, তাঁরাও এই রেখাচিত্রগুলোর আশ্রয়ে এঁদের ব্যক্তিচরিত্র ও জীবনের আভাস পাবেন। এর সার্থকতা তুচ্ছ করবার মত নয়।

সমসাময়িকতায় ছোট দেখা দেয় বড় হয়ে, বড় ছোট হয়ে যায়, যথার্থত যা বড় তা অনেক সময়ে চোখেই পড়ে না হয়তো; মূল্যায়ন কঠিন হয়ে ওঠে। এ-গ্রন্থেও হয়তো তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু, সে-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতের প্রশ্ন আছে; সমসাময়িকতার যে-বিপদ তাও থাকবে।

একটি জিনিস অনেকেরই চোখ এড়াবে না। সুশীলবাবুর নানা রং ও আকৃতির, নানা গন্ধ ও গৌরবের ফুলের মালায় কবি ও সাহিত্যিক ফুল একটু কম গাঁথা পড়েছে।

বইখানার মূল্য অবশ্যস্বীকার্য, শুধু সংবাদের দিক থেকে নয়, ইঙ্গিত ও তাৎপর্যের দিক থেকেও। বইখানা শুরু হয়েছে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় মশায়কে নিয়ে, শেষ হয়েছে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে দিয়ে। এর অর্থ হচ্ছে, বিগত প্রায় পঞ্চাশ বছরের বাংলা ও বাঙালীর সংস্কৃতির যাঁরা নায়ক

তাঁদের ব্যক্তিজীবন ও কর্মকৃতির একটি সুপাঠ্য বিবরণ আছে এই বইতে। দ্বিতীয়ত, এই নায়কদের জীবন একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বুঝতে কঠিন হবে না যে, নানা অনৈক্য সত্ত্বেও এঁদের সকলেরই জীবনের মূল কয়েকটি বিশেষ ও মৌলিক জীবনমূল্যে, যে মূল্যগুলির মধ্যে একটি সুগভীর ঐক্য বিদ্যমান এবং যার উপর বিগত এক শ সোয়া শ বছরের বাঙালীর সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা। এঁদের সকলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হোক, এই কামনা করি; সুশীলবাবুর বইখানা তার সহায়ক হোক।

কলকাতা, ১০ জুলাই ১৯৫৮ — নীহাররঞ্জন রায়

জীবনধারণ করবেন তাঁদের ধ্যানে ও ধারণায় তাঁরা তো নূতন-কিছু রচনা করবেনই। এইজন্যে এ জীবনীকে সেইখানেই শেষ বলা যায় না।

তাঁদের জীবনকথা প্রথম-প্রকাশের পর বছর-পাঁচেক গত হয়েছে। এই পাঁচ বছরে তাঁদের প্রত্যেকেরই জীবনের অনেক নূতন তথ্য জমা হয়েছে। এ বইতে সেগুলি সমাহৃত হল।

জীবনের নূতন তথ্য যেমন জমা হয়েছে, সেই সঙ্গে জীবনও শেষ হয়েছে কয়েক জনের। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, যদুনাথ সরকার, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী, মেঘনাদ সাহা ইতিমধ্যে লোকান্তরিত হয়েছেন। তাঁদের বিষয়ে অতিরিক্ত উপকরণাদি এই বইতে সন্নিবিষ্ট করা হল।

আরো কয়েকজনের জীবনকথা রচনা করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তাঁদের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ না হওয়ায় তাঁদের সম্বন্ধে লেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হতে হয়েছে ; যখন এই রচনা-কাজে নিমগ্ন আছি এবং একে-একে সকলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছি, তখন কেউ-কেউ লোকান্তরিত হওয়ায় আমার পরিকল্পনার একাংশ নষ্ট হয়েছে— এঁদের মধ্যে দুজন হচ্ছেন কবি মোহিতলাল মজুমদার ও কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।

জন্মাষ্টমী ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ
১৩-বি কাঁকুলিয়া রোড
বালিগঞ্জ। কলকাতা ১৯

সুশীল রায়

নূতন সংস্করণ

এই কয়বছরের মধ্যে আরও অনেকে লোকান্তরিত হয়েছেন। সে বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে এই সংস্করণে গ্রন্থশেষে নূতন তথ্যাবলী সংযোজিত হয়েছে।

আশ্বিন ১৩৭০

সুশীল রায়

সূচীপত্র

উৎসর্গ

পূজনীয়দের

উদ্দেশে

মনীষী-জীবনকথা

"জীবিত মানুষের জীবনী লিখিয়া আপনি বাংলা সাহিত্যে নূতন দিক আবিষ্কার করিলেন।"

—যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

বাঁকুড়া। কলকাতা থেকে রেলপথে ১৪৪ মাইল। এইখানে বিদ্যানিধি-মহাশয়ের বাস।

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম কথা। স্মিত হেসে তিনি বললেন, "আমার বয়স কত জান ?"

জানতাম। কিন্তু তাঁর মুখ থেকেই শোনার জন্যে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। বললেন, "বিরানব্বই বৎসর। বিরানব্বই বৎসর নয় মাস।"

কিন্তু এখনো তাঁর শরীর শক্ত আছে। তবে ক্ষীণদৃষ্টি হয়ে পড়েছেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা তিনি একটানা কথা ব'লে গেলেন। শেষের দিকে বললাম, "আপনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন নি তো ?"

বললেন, "না, অভ্যাস আছে।"

অভ্যাস আছে। কেননা, এখন নিজে হাতে তিনি স্বাক্ষর করা ছাড়া বড় বেশি লিখতে পারেন না, তাই তাঁর একজন অনুলেখক আছেন। বিদ্যানিধি মহাশয় ব'লে যান, অনুলেখক লেখেন। গলার স্বর একটু দুর্বল হয়েছে, কিন্তু মাথার শক্তি হ্রাস হয় নি, এখনো তিনি দুরূহ গবেষণার কাজে লিপ্ত। বললেন, "সম্প্রতি একটা অতিশয় দুরূহ বিষয়ে পুস্তক-প্রকাশের চেষ্টায় আছি। বইখানির নাম 'বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল'। সম্পূর্ণ মৌলিক বিষয়। এর সাহায্যে এখন বেদপাঠীরা বেদের দেবতা চিনতে পারবেন ; তাঁরা দেখবেন, বেদে খ্রীষ্টজন্মের আট হাজার বৎসর পূর্বের ঋষিদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে।"

বিদ্যানিধি-মহাশয় নামেই বঙ্গবাসী ও বঙ্গসাহিত্য তাঁকে চেনে। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিত-সভা তাঁকে 'বিদ্যানিধি' উপাধি দেন। তাঁর আরও উপাধি আছে। তাঁর পুরো নাম হচ্ছে ডক্টর যোগেশচন্দ্র রায় এম. এ., বিদ্যানিধি, বিজ্ঞানভূষণ, এফ. আর. এ. এস., এফ. আর. এম. এস., রায়বাহাদুর, ডি. লিট.।

বিদ্যানিধি মহাশয় বঙ্গসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থ 'আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ' সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন মন্তব্য করেছিলেন, 'মাতৃভাষার হিতকামনায় অঙ্গুল্যগ্র-গণনীয় যে কতিপয় সুশিক্ষিত আছেন, তন্মধ্যে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ।...আপনি যে বঙ্গসরস্বতীর জন্ত একখানি সুবৃহৎ জ্যোতির্ময় মুকুটের নির্মাণ করিয়াছেন, সেই আকাশোল্লাসী-মহামুল্য-মুকুট মস্তকে সগর্বে পরিধান করিয়া বঙ্গসরস্বতীর নির্মল মুখমণ্ডল আজ স্মিতরেখায় উদ্ভাসিত। মাতাকে এই হার পরাইয়া এই মুকুটে মাতাকে বিভূষিত করিয়া আপনি ধন্ত হইয়াছেন, বঙ্গভূমিকে ধন্ত করিয়াছেন, বঙ্গবাসীকে গর্বিত হইবার অধিকার দিয়াছেন।'

তবুও বিদ্যানিধি-মহাশয় নিজেকে সাহিত্যিক ব'লে স্বীকার করতে সম্মত হলেন না। আমি তাঁর সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করায় তিনি বললেন, "আমি তো সাহিত্যিক নই।"

হয়তো নিজেকে তিনি বিজ্ঞানসাধক হিসাবেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর সেই সাধনার সিদ্ধির সুযোগে তাঁর অজ্ঞাতসারেই বঙ্গসাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েছে।

বয়সের হিসাবে তিনি রবীন্দ্রনাথেরও জ্যেষ্ঠ। ১৭৮১ শক, ১২৬৬ বঙ্গাব্দ, ৪ কার্তিক, ইংরেজি ১৮৫৯ সালের ২০ অক্টোবর, তারিখে বৃহস্পতিবার হুগলী জেলার আরামবাগের চার মাইল দক্ষিণে দিগ্‌ড়া গ্রামে তাঁর জন্ম।

নয় বৎসর পর্যন্ত তিনি বাড়িতে পাঠশালায় লেখাপড়া করেন। এর পর তাঁর পিতা তাঁকে বাঁকুড়ায় নিয়ে আসেন। তখন তাঁর পিতা বাঁকুড়ার সদরআলা (এখনকার সবজজ) ছিলেন। মাস দুই-তিন এখানকার বঙ্গবিদ্যালয়ে প'ড়ে এখানকার জেলা ইস্কুলে তাঁর ইংরেজিতে হাতেখড়ি হয়। পর বৎসর অক্টোবর মাসে তাঁর পিতার কাল হয়। তাঁরা বাড়ি ফিরে যান।

বললেন, "এর দু-তিন মাস পরে আমাদের অঞ্চলে ম্যালেরিয়া মহামারী গ্রাম-কে-গ্রাম উজাড় করে চলেছিল। এই রোগ বর্ধমান থেকে দক্ষিণ দিকে চ'লে আসে। ছয় মাসের মধ্যে গ্রামের দশ আনা লোক মারা যায়। তখন অনেক গ্রামেরই দশা এইরূপ হয়েছিল। এখন সেই ভীষণ ম্যালেরিয়া কেউ

কল্পনাও করতে পারবে না। মৃতদেহ পোড়াবার লোক ছিল না। ওষুধপত্র কিছু ছিল না বললেই হয়। কেউ কেউ শুনেছিল, কুইনিন নামে একটি মহৌষধ আছে, কিন্তু তা পাওয়া যেত না। শত শত লোকে ধর্মঠাকুরের দুয়ার ধ'রে বেঁচে গেল। জগদম্বার কৃপায় আমিও বেঁচে গেলাম। জীবনের এই দুটি বৎসরের কথা মনে পড়ে না, আমি বেঁচে ছিলাম না মরে ছিলাম, জানি না। তখন আমার বয়স বারো।"

আশি বছর আগের কথা। আশি বছর আগের বাংলার একটি দুঃখময় অসহায় অবস্থার চিত্র যেন দেখতে পেলাম এই বিবৃতির মধ্য দিয়ে। বিদ্যানিধি মহাশয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তাঁর চোখের সম্মুখে সেই ভয়ংকর দৃশ্য এখনো স্পষ্টরূপে আঁকা হয়ে আছে। আশি বছর আগের কথা। অথচ তাঁর মনে হচ্ছে, এটা মাত্র সেদিনের ঘটনা।

ক্রমে বর্ধমানে ম্যালেরিয়া একটু কমেছিল। তিনি বর্ধমান-মহারাজার ইস্কুলে ভর্তি হলেন, এবং এই পাঁচ বছর এই বিদ্যালয়ে পড়ে ১৮৭৮ সালে বৃত্তি পেয়ে এনট্রান্স পাস করেন। তারপর হুগলী কলেজে অধ্যয়ন করে ১৮৭৯ সালে কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়ে এফ. এ. পাস করেন। হুগলী কলেজ থেকেই ১৮৮২ সালে প্রথম বিভাগে বি. এ., এবং ১৮৮৩ সালে বটানিতে দ্বিতীয় বিভাগে এম. এ. পাস করেন—ঐ বৎসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনিই একমাত্র ছাত্র বটানিতে এম. এ. পাস করেন।

১৮৮৩ সালে এম. এ. পাস করার পরই তিনি কটক কলেজের লেকচারার ইন্ সায়ান্স নিযুক্ত হন। কটক কলেজে তিনি তখন একাই বিজ্ঞানের শিক্ষক। চারিটি শ্রেণী ছাড়াও এম. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিল একজন। এতগুলি ক্লাস নিয়ে এবং এম. এ.-ছাত্রটিকে পড়িয়ে তাঁর দেহ-মন ক্লান্ত হয়ে পড়ত। বললেন, "তখনকার দিনে শিক্ষাবিভাগে সরকারের কৃপণতা ছিল। আমাকে দিয়ে দুজন শিক্ষকের কাজ করিয়ে নিত। এম. এ.-ছাত্রটি এম. এ. পাস করে। সে-ই কটক কলেজের প্রথম এম. এ.।"

তিন বছর কটক কলেজে কাজ করার পর তিনি কলকাতার মাদ্রাসা কলেজে আসেন। তখন ডক্টর হর্নলে মাদ্রাসা কলেজের প্রিন্সিপাল। ডক্টর

হর্নলে বিদ্যানিধি মহাশয়কে শ্রদ্ধা করতেন, অনেক বিষয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতেন।

"কটক কলেজে আমি কেবল পড়িয়েছি, নিজে পড়বার-শেখবার সময় পাই নি; মাদ্রাসা কলেজে এসে আমার যথেষ্ট অবসর হল। সেখানে মাত্র দুটি এফ. এ. ক্লাস ছিল, বি. এ. ক্লাস ছিল না। ডক্টর হর্নলে আমার পড়াশুনার আবশ্যক বই ও সুযোগ করে দিতেন।" বিশেষ তৃপ্তির সঙ্গে বললেন বিদ্যানিধি-মহাশয়।

এই মাদ্রাসা কলেজে তিনি দুই বৎসর থাকেন। এর পর মাদ্রাসার কলেজ-বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। মাস দেড়েক তিনি চট্টগ্রাম কলেজে, তার পর মাস পাঁচ-ছয় প্রেসিডেন্সি কলেজে থাকেন। কটক কলেজ থেকে তিন বছর তিনি অনুপস্থিত। এই সময় সেখানে বিজ্ঞান-শিক্ষা অনাদৃত হয়েছিল; এই কারণে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর তাঁকে পুনরায় কটকে পাঠিয়ে দেন।

বললেন, "এই দ্বিতীয় বার কটকে গিয়ে সেখানকার কলেজে একটানা ত্রিশ বৎসর কাজ করি। তার পর ১৯১৯ সালে কর্ম থেকে অবসর নিয়ে ১৯২০ সালে বাঁকুড়ায় আসি। তদবধি বাঁকুড়াতেই আছি।"

দশ বৎসর বয়সে তিনি বাঁকুড়া ত্যাগ করেন, অর্ধ শতাব্দী বাদে ষাট বৎসর বয়সে ফিরে আসেন সেই বাঁকুড়ায়। তারপর থেকে এখানেই তাঁর বিজ্ঞান তথা সাহিত্য সাধনা চলেছে। প্রথম তিন বৎসর ভাড়া-বাড়িতে কষ্ট পেয়ে এক নির্জন স্থানে নিজে বাড়ি করেন। স্বস্তির জন্য বাড়ি, তাই এই এই বাড়ির নাম রেখেছেন 'স্বস্তিক'।

অহল্যাবাঈ রোড। স্টেশন থেকে রাস্তাটি শহর পেরিয়ে সোজা চ'লে গিয়েছে জেলা ইস্কুল ও কলেজ ছাড়িয়ে পশ্চিম দিকে। এই রাস্তার দক্ষিণ দিকে ছোট এক ফালি পথ। এই পথে কয়েক পা এগিয়ে গেলেই বিদ্যানিধি মহাশয়ের বাড়ি। এক নিরালা নিভৃতি দিয়ে ঘেরা আছে বাড়িটা। অবসরে পূর্ণ জীবনের একান্ত মনে বাস করার পক্ষে জায়গাটি লোভনীয়।

২২এ শ্রাবণ ১৩৫৯, ৭ই আগস্ট ১৯৫২। বেলা চারটের সময় তাঁর সঙ্গে

দেখা করার কথা। হোটেল থেকে বেরিয়ে বাজারের কাছে ফটো-স্টুডিয়োকে ব'লে গেলাম আধ ঘণ্টা বাদে বিদ্যানিধি-মহাশয়ের বাড়িতে আসতে। আমি একটা সাইকেল-রিক্শা নিয়ে আগে রওনা হলাম। রিক্শা চলেছে আর আমি অনবরত ঘড়ি দেখছি— দেরি হয়ে না যায়। সময় সম্বন্ধে তিনি নাকি ভয়ংকর সজাগ। কিন্তু দেরি হয়ে গেল দশ মিনিট। রিক্শা আমাকে অযথা অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

বিদ্যানিধি-মহাশয় অপেক্ষা ক'রে বসে ছিলেন। গিয়েই বললাম, চেঁচিয়েই বলতে হল, কানে তিনি এখন কম শুনতে পান, বললাম, "দশ মিনিট দেরি হয়ে গেল।"

আমার দিকে তাকালেন, দেখলাম রুষ্ট হন নি। বললেন, "আমার বয়স কত জান? বিরানব্বই বৎসর। বিরানব্বই বৎসর নয় মাস।"

সেই দিন তাঁর সঙ্গে দেখা, যেদিন তার বিরানব্বই বছর নয় মাস বয়স ছিল। তাঁর গলার স্বর এখনো কানে বাজছে।

তার পর কেটে গিয়েছে কয়েকটা বছর। আরো প্রায় পাঁচ বছর। সাতানব্বই বছর বয়সে হঠাৎ তিনি লোকান্তরিত হলেন।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাংলাদেশের একটি শতাব্দীর জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন। তাঁর জীবনের সঙ্গে সঙ্গে শতবর্ষের ইতিহাসের দীর্ঘ অধ্যায়টি সমাপ্ত হয়েছে।

সেই প্রায়-শত বর্ষের ইতিহাস তাঁর নিজের মুখ থেকে শোনার সৌভাগ্যের কথা আজ মনে পড়ে। সেদিনের পর ক্রমশ তাঁর শারীরিক বয়স বাড়তে লাগল, কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর মানসিক বয়সের কোনো তারতম্য হল ব'লে মনে হয় নি। কেননা, তাঁর ধীশক্তি মননশক্তি ও রচনাশক্তি অব্যাহত যে ছিল, তার প্রমাণ তিনি দিয়ে গেছেন। বিভিন্ন পত্রিকায় তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হতে আমরা দেখেছি। যতই দেখেছি, আনন্দে ও বিস্ময়ে হতবাকও হয়েছি ততই; সেই সঙ্গে সম্ভবত লজ্জিতও হয়েছি। প্রায়-শতায়ু বৃদ্ধের পক্ষে যা সম্ভব হচ্ছে হয়তো কোনো তরুণ যুবক কিংবা প্রৌঢ়ের পক্ষে ততটা কর্মক্ষমতা সম্ভব নয়।

তাঁর সঙ্গে দেখা হবার পর থেকে তাঁর পরলোকগমনের কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি মাঝে-মাঝে চিঠি লিখতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর হস্তাক্ষর অস্পষ্ট হয়ে আসছে লক্ষ্য করেছি, কিন্তু চিন্তাশক্তির কোনো দুর্বলতা ধরা যায় নি।

নিজেকে তিনি নিজে নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ জীবনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যে, নিজেকে মানুষ— এবং শেষপর্যন্ত মনীষী— করে গড়ে তুলবার জন্যে তাঁর মধ্যে অসীম প্রেরণা পুঞ্জীভূত ছিল। সেই প্রেরণা সম্বল করে তাঁর জীবনের যাত্রা শুরু, এবং যাত্রা যখন শেষ হল তখনও তাঁর প্রেরণার সমস্তটুকু সঞ্চয় নিঃশেষিত হয় নি। মৃত্যুর পূর্বদিনও সকাল তিনি লিপিকারের সাহায্যে একটি প্রবন্ধ রচনায় ও সন্ধ্যা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসব সম্বন্ধে আলোচনায় অতিবাহিত করেন, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম যুগের ইতিহাস সম্পর্কে স্মৃতিকথা লেখার প্রতিশ্রুতি দেন।

এই ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে—৩০ জুলাই ১৯৫৬, ১৪ই শ্রাবণ ১৩৬৩ প্রত্যুষে—করোনারি থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হয়ে হঠাৎ তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মৃতিকথা লেখার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার সুযোগ তিনি পেলেন না, সম্ভবত তাঁর স্মৃতিকথা লেখার ভারই অর্পণ ক'রে গেলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর।

সমবয়সীর কাছ থেকে সম্মান পাওয়া— সে বড় ভাগ্যের কথা। যোগেশচন্দ্র সেই দুর্লভ ভাগ্যে ভাগ্যমন্ত। তাঁর জীবনদীপ-নির্বাণের মাত্র কয়েক মাস আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্বয়ং বাঁকুড়ায় তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে অনারারি ডক্টরেট অব লিটারেচর উপাধি দিয়ে এসেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর যোগেশচন্দ্র প্রায়-সমবয়সী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তির মাত্র কয়েক মাস তখন বাকি, যোগেশচন্দ্রের শতবর্ষপূর্তি হতেও বাকি ছিল মাত্র তিন বছর।

তাঁর মৃত্যুতে আক্ষেপ নেই বিশেষ কিছু। পরিণত বয়সেই তিনি

লোকান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু আক্ষেপ এই, তিনি তাঁর জীবনের শতপূর্তি করে গেলেন না।

সময়কে মেপে মেপে চলেছেন, সময়ের অপচয় করেন নি, তাই সময়ও বুঝি তাঁর উপর সদয়। তাই তাঁকে এতদিন টিকিয়ে রেখেছিল আমাদের মধ্যে।

তিনি একে একে বলে গেলেন তাঁর জীবনের কথা, তাঁর সময়ের কথা, তাঁর জ্ঞানচর্চার কথা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার কথা।

তার পর বললেন, "আমি বাল্যে ও যৌবনকালে দেশের যে অবস্থা দেখেছি, এখন তার এত অবনতি হয়েছে—এক এক সময় বিশ্বাস হয় না। আজকাল মিথ্যা, প্রবঞ্চনা বেড়েছে। বাল্যকালে দেখেছি, লোকে টাকা কর্জ নিত, কিন্তু তমসুক লেখা-পড়া ছিল না। কর্তাদের খাতায় লেখা হত, তাই যথেষ্ট। খাতকরা যে ঠকাত না, এমন নয়; দু-একজন প্রতারক অবশ্যই ছিল; কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল অল্প। লোকে মোটা ভাত মোটা কাপড় পেলেই তুষ্ট হত। সকলে ভাত পেত, কিন্তু কাপড়ের অভাব ছিল। সকলের কাপাস-চাষ ছিল না, ঘরে চরকা ছিল না, দাম দিয়ে কাপড় কিনতে হত। কাপড় খাদি (ক্ষুদ্র), হাঁটুর চার আঙুল নীচে পর্যন্ত ঝুলত। অভাব-বোধ ছিল অল্প, সভ্যতার এমন চাকচিক্য তখন ছিল না। কাঁধে চাদর ফেলে খালি গায়ে সভায় গিয়ে বসতে লজ্জিত হত না কেউ। গ্রামে বারো মাস তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। গ্রাম-শাসনের চমৎকার ব্যবস্থা ছিল। এখন আইনের দ্বারা তা সম্ভব নয়।"

মাহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের কথা তুললেন তিনি, বললেন, "এ আমাদের চেনা জিনিস। বাল্যকাল থেকেই দেখেছি, লোকে কোনো কিছুর প্রাপ্য আদায় করতে হলে তার বাড়ি গিয়ে ধর্না দিয়ে পড়ত। প্রাণান্ত অনশনকে 'হত্যা দেওয়া' বলত। গ্রামে কোনো পাপীকে দণ্ড দিতে হলে তাকে একঘরে ক'রে রাখার নিয়ম ছিল। এতে পাপী দু-দিনও তিষ্ঠতে পারত না। এ-ই তো অসহযোগ।"

আজকালকার পৃথিবী তাঁর চোখে নতুন রূপে দেখা দিয়েছে, মানুষেরা বদলে গিয়েছে, মানুষের মন গিয়েছে পালটে। আজকাল দেশে এসেছে

কল, দেশে এসেছে ভেজাল। এতে লোকের দুর্গতি ক্রমশ বেড়েই চলেছে বলে তিনি মন্তব্য করলেন। বললেন, "সাধে কি মহাত্মা কলের বিরোধী ছিলেন? একটা ধান-কল পঞ্চাশ-ষাট জন বিধবা নারীর মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। একটা আখ-মাড়া কল কত লোকের অন্ন কেড়ে নিয়েছে তার ঠিক নেই। এখন সবাই সাদা-ধবধবে চিনি খাবে, গুড় খাবে না। চরকায় সুতো কেটে খদ্দর বুনে তাঁতিকুলের ও দরিদ্র নারীর ভরণপোষণের দিন আজ গত।"

তাঁদের সময় ছিল সহযোগের যুগ। সকলের সঙ্গে সকলের ছিল অন্তরঙ্গতা ও আত্মীয়তা, সকলের সঙ্গে ছিল সকলের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। কেউ কাউকে তাই ঠকাতে চাইত না। চাইলেও টিকতে পারত না। আজকাল খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেওয়ার রেওয়াজ হয়েছে। এর মূলে আছে অর্থলোভ এবং পরস্পর পরিচয় ও আত্মীয়তার অভাব। কিন্তু তাঁদের কালে লোকে ভেজাল কথাটাই জানত না। গ্রামের তেলী তেল জোগাত, কে কাকে ঠকাবে? তাকে তো গ্রামেই বাস করতে হবে। তখন যে-কোনো আবশ্যক জিনিস গ্রামে বা নিকটের গ্রামেই পাওয়া যেত। বললেন, "সবার সঙ্গে চেনা-পরিচয়, একজনকে ঠকিয়ে ক'দিন টিকতে পারবে?"

তাঁর বাল্যের জীবন, তাঁর বিদ্যারম্ভের জীবন, বিদ্যাদানের জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা গেল। কিন্তু তাঁর বর্তমান-জীবন অর্থাৎ বিদ্যানিধি-জীবনের সূত্রপাত হল কী করে?—দ্বিতীয় বার যখন তিনি কটক যান তখন অসাধারণ জ্যোতির্বিদ চন্দ্রশেখর সিংহ সামন্তর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন পঞ্জিকা-সংস্কার বিষয়ে উদ্যোগী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার টোলের পরিদর্শক। তিনি যেখানেই যেতেন সেখানেই পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে পঞ্জিকা-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। দৈবাৎ তিনি শুনতে পান যে, উড়িষ্যার এক পার্বত্য ও জাঙ্গল রাজ্যে এক ব্যক্তি আছেন, তিনি নিজে নাকি গ্রহ-নক্ষত্র বেধ করে কী-সব করেন, লোকে বলে তিনি জ্যোতিষী। এই জ্যোতিষী-রাজ্যের নাম খণ্ডপড়া, কটক থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে

অবস্থিত। এই জ্যোতিষীর নাম চন্দ্রশেখর। সাধারণ লোকের কাছে তিনি পঠানী সান্ত নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি খণ্ডপড়ার তৎকালীন রাজার খুল্লতাত ছিলেন। রাজার অনুমতি ব্যতীত তিনি গড়ের বার হতে পারতেন না। ন্যায়রত্ন মহাশয় কমিশনার সাহেবকে দিয়ে পঠানী সান্তকে রাজার নামে চিঠি দিয়ে কটকে আনান।

বিদ্যানিধি-মহাশয় বলেন, "সেই সময় তাঁর বিদ্যাবত্তার, বিশেষ জ্যোতির্বিদ্যার, প্রগাঢ় প্রত্যক্ষ জ্ঞান দেখে আমি আমাদের জ্যোতিষের প্রতি আকৃষ্ট হই। দৈবক্রমে তাঁর রচিত সিদ্ধান্তদর্পণঃ নামে সংস্কৃত গ্রন্থ আমাকে পড়তে বুঝতে ও সম্পাদন করতে হয়।"

সিদ্ধান্তদর্পণের মুখবন্ধে পঠানী সান্তের জীবনচরিত তিনি ইংরেজিতে লেখেন। এর ফলে এদেশে ও বিলাতে পঠানী সান্তের অদ্ভুত কৃতিত্বের ভূয়সী প্রশংসা হয়। ১৯১০ সালে যখন পুরীর পণ্ডিতসভা শ্রীযুত যোগেশচন্দ্র রায়কে বিদ্যানিধি উপাধি দেন, তখন মানপত্রে তাঁকে চন্দ্রশেখরের আবিষ্কর্তা ব'লে উল্লেখ করা হয়।

কটকে অবস্থানকালে তিনি পরিচিত হন যাদবেশ্বর তর্করত্নের সঙ্গে। তর্করত্ন মহাশয় তখন তাঁর পুত্রের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্যে কিছুদিন কটকে ছিলেন। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রখর তর্কবিদ্যার অধিকারী ছিলেন।

বিদ্যানিধি-মহাশয় বললেন, "সেকালের পণ্ডিতেরা বাস্তবিক পণ্ডিত ছিলেন। শুধু একটা বিষয়ে নয়, নানা বিষয়ে তাঁরা চর্চা করতেন। পুরীর মহামহোপাধ্যায় সদাশিব কাব্যকণ্ঠ 'কল্যাপদ্ধর্মসর্বস্বম্' নামে ৮০০ পৃষ্ঠার এক নিবন্ধ লিখেছিলেন।

তিনি এক শ্রুতিধরের কাহিনী বললেন। তাঁর নাম ঘট্টুলাল। মহারাষ্ট্রীয় শতাবধানী। পাঁচ বছর বয়সে বসন্তরোগে তাঁর দু-চোখ নষ্ট হয়ে যায়। তিনি পিতামাতার মুখে শাস্ত্রপাঠ শুনতেন, আর, একবার শুনেই কণ্ঠস্থ হয়ে যেত। একবার কটকে তাঁকে পরীক্ষা করা হয়। এক আসরে কেউ আবৃত্তি করল ইংরেজি এক লাইনের দুটো শব্দ, তার পরেই অপর একজন বাংলায় এক লাইনের দুটো শব্দ, ইতিমধ্যে কেউ দিল ঘণ্টায় এক ঘা, কেউ

ডুগীতে এক ঘা, তার পর আবার আবৃত্তি ওড়িয়ার এক লাইনের দুটো শব্দ —এই রকম চলল অনেকবার। অবশেষে ঘটুলাল ব'লে গেলেন ক'বার বেজেছে ঘণ্টা, ক'বার ডুগী, ইংরেজি-বাংলা-ওড়িয়ায় বলা হয়েছে কি কি কথা।

বিদ্যানিধি-মহাশয়ের জীবনের সাধনার ও প্রেরণার উৎস পণ্ডিতসংসর্গ। এঁদের সংসর্গ ও সাহচর্য তাঁকে জ্ঞানান্বেষণ ও জ্ঞানবিতরণের পথে চালিত করেছে বলা যায়।

আর তিনি বললেন উড়িষ্যার দুই-তিন জন দেশীয় রাজ্যের তদানীন্তন রাজার কথা। ময়ূরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জদেও— প্রবাসীতে (১৩৪১ কার্তিক) এঁর সম্বন্ধে তিনি লিখেওছেন; দ্বিতীয় জন কেওঞ্ঝরের মহারাজা ধনুর্জয় নারায়ণ ভঞ্জদেও; তৃতীয় জন বামণ্ডার (বামড়া) মহারাজা সার্ বাসুদেব সুঢলদেব। এঁদের গুণরাশি দ্বারা তিনি আকৃষ্ট হন কি ভাবে, তা অকপটে তিনি বললেন।

বিদ্যানিধি-মহাশয়ের অগ্রজের ইচ্ছা ছিল যে, বিদ্যানিধি-মহাশয় উকিল হন। এই হেতু তিনি হুগলী কলেজে পড়বার সময় দু বৎসর ল' লেকচার শুনেছিলেন এবং কটকে গিয়ে তৃতীয় বর্ষ সমাপ্ত করেছিলেন। কিন্তু ওকালতি পরীক্ষা দেন নি। অগ্রজের ইচ্ছা পূর্ণ যদি তিনি করতেন তা হলে হয়তো বঙ্গবাসী তাঁকে চিনতে পারত না, হয়তো তিনি তাঁর ক্ষমতার বিকাশ করারও সুযোগ পেতেন না; হয়তো তাঁর জীবন অন্য খাতে গড়িয়ে যেত। কিন্তু তিনি কটকে প্রথম বার গিয়ে তাঁর প্রতিবেশী দুজন উকিলের অবস্থা দেখেন। এতে ওকালতির উপর তাঁর ঘৃণা জন্মে। দুজনেই ছিলেন নব্যউকিল। তাঁদের নিজের বলতে এতটুকু সময় ছিল না। একজন মক্কেলের আশায় বাড়িতে ব'সে থাকতেন, আর একজন চোর ও বদমায়েশ নিয়ে সময় কাটাতেন।—"আমি সেই সময় ওকালতি-মোহ কাটিয়ে শিক্ষাবিভাগে চিরদিন থাকব, এই সংকল্প করেছিলাম।"

তিনি একটু থামলেন। কি-যেন মনে হল তাঁর। বললেন, "আমি বাঁকুড়ার ছাতনায় বড়ু চণ্ডীদাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে

কেউ কিছু জানতেন না। বড়ু আর দ্বিজ চণ্ডীদাস যে দুই পৃথক কবি, তা কারো মনে ওঠে নি। 'বাসলী ও চণ্ডীদাস' নামে ১৩০।১৪০ বৎসর পূর্বের এক পুঁথি পেয়েছি। সে পুঁথি চণ্ডীদাস-চরিত নামে প্রকাশ করেছি। কোনো কোনো পণ্ডিত বইখানিকে জাল মনে করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে এমন-সব পুরাতন তথ্য আছে যে, ইদানীং কোনো লোক সেসব জানতে পারে না। বড়ু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 'সবার উপরে মানুষ সত্য' কথাটার মানেও কেউ বুঝত না।"

তাঁর রচনা শুরু 'নব্যভারত' পত্রিকায়, দেবীপ্রসন্ন রায়চৌধুরী ছিলেন সম্পাদক; তিন-চারটি প্রবন্ধ এই পত্রিকায় লেখেন। তার পর 'দাসী' পত্রিকায় 'নানা কথা' নাম দিয়ে ছোট ছোট বিষয় লেখেন। 'প্রবাসী' পত্রিকার জন্মকাল থেকে এতে লিখছেন। আর লিখেছেন 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য়; সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য', নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকাতেও তিনি লিখেছেন। 'প্রবাসী'তেই লিখেছেন সবচেয়ে বেশি।

বললেন, "লিখতাম বটে, কিন্তু বাংলা ভাষা কখনো শিখি নি, শিখবার অবসর পাই নি। তার পর বাংলা ভাষা শিখতে বসি। তারই ফলস্বরূপ 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে দুই ভাগে বিভক্ত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ সংকলন করি। বাংলা ভাষা চর্চা করবার সময় দেখি, বাংলা সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষরের সংস্কার করতে না পারলে এই ভাষা শিক্ষা সহজ হবে না। রেফাক্রান্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন, সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষরের আকার রক্ষণ এখন অনেক প্রেসে চলেছে। কিন্তু আমিই প্রথম ১৯১২ [বস্তুত, ১৯০৪ ?] সালে এই সূত্র ধরিয়ে দিই। আমার শব্দকোষ এইরকম অক্ষরে ছাপা হয়েছে।"

তাঁর জ্ঞান-চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫১ সালে তিনি তাঁর ***Ancient Indian Life*** গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন; এবং ১৯৫২ সালে 'পূজাপার্বণ' গ্রন্থের জন্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁকে রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কারের দ্বারা সম্মানিত করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৪০ সালে জগত্তারিণী মেডাল ও ১৯৪৭ সালে সরোজিনী মেডাল দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৯৫৫ সালে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয় অনারারি ডক্টরেট উপাধি দিয়ে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন।

কিন্তু সকল সম্মানের শ্রেষ্ঠ সম্মান তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর মাস কয়েক আগে। যোগেশচন্দ্রের প্রায়-সমবয়সী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঁকুড়ায় গিয়ে ১৯৫৬ সালের ১৭ এপ্রিল তারিখে তাঁকে ডক্টরেট উপাধি দিয়ে এসেছেন। বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজের অ্যাসেমব্লি হলে বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার প্রবীণতম মনীষী ৯৭ বৎসর বয়স্ক জ্ঞানতপস্বী আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন চ্যান্সেলার ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাত থেকে কম্পিত হস্তে গ্রহণ করলেন উপাধিপত্র—অনারারি ডক্টরেট অব লিটারেচর। এই তারিখটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে; কলকাতা শহরের বাইরে এরূপ সমাবর্তন-অনুষ্ঠান ইতিপূর্বে হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয় এই মনীষীকে এইভাবে সম্মানিত করার সুযোগ পেয়ে নিজেই সম্মানিত হয়েছেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল অন্তরঙ্গ। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হন। ১৩২৯ থেকে ১৩৩০, ১৩৩৮ থেকে ১৩৪২, ১৩৪৫ থেকে ১৩৪৮ ও ১৩৫৪—এই কয় বৎসর তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সহকারী সভাপতি-পদ এবং ১৩৫৫-৫৬ বঙ্গাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি-পদ অলংকৃত করেন।

এ ছাড়া বিজ্ঞান-পরিষৎ ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠানের তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন এবং শেষজীবন পর্যন্ত কটকের উৎকল-সাহিত্যসমাজের বরেণ্য সভ্য ছিলেন।

১৩২১ বঙ্গাব্দে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের বর্ধমান অধিবেশনে বিজ্ঞান-শাখার সভাপতিত্ব করেন।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২১ অগ্রহায়ণ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের তৎকালীন সহকারী সভাপতি সার্ যদুনাথ সরকার মহাশয়ের সভাপতিত্বে বাঁকুড়া শহরে যোগেশচন্দ্রের ঊননবতিতম জন্মতিথি উপলক্ষে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাঁর গুণমুগ্ধ দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।

দেশবাসীর কাছে তিনি জ্ঞানতাপস, সত্যানুসন্ধী শিক্ষাব্রতী, অক্লান্তকর্মী বৈজ্ঞানিক, একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবী-রূপে পরিচিত হয়ে নিজে ধন্য হয়েছিলেন কি না জানি নে, কিন্তু বঙ্গদেশ এজন্যে নিজেকে ধন্য মনে করে।

তিনি ৩৬ বৎসর শিক্ষকতা করেন। তারই মধ্যে যে অল্পস্বল্প অবসর পেতেন সেই সময়কে তিনি তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রত্যেকটির জন্যে বারোটি করে বছর। "আমি প্রায় ১২ বৎসর বাংলা ভাষা চর্চা করেছি, ১২ বৎসর জ্যোতির্বিদ্যা চর্চা করেছি, আর ১২ বৎসর কেটেছে দেশীয় কলা চর্চায়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্বদেশী ও চরকার নামগন্ধ ছিল না। আমি কটকে 'স্বদেশী ভাণ্ডার' খুলেছিলাম। আর, ছ'মাস চরকার উন্নতি চিন্তা করেছিলাম। 'প্রবাসী'তে (১৩১৩। ৪র্থ সংখ্যা) সে সম্বন্ধে লিখেছি।"

তাঁর কথা শুনতে শুনতে কখন বাইরে নেমে এসেছে অন্ধকার। একটু বাদেই তরল হয়ে এল সে অন্ধকার। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভরে গেল চারদিক। বাঁকুড়ার এই নতুনপটীতে এসে নতুন স্বাদ গ্রহণ করলাম। প্রায় এক শতাব্দী পূর্বের বাংলাদেশের সঙ্গে যেন সাক্ষাৎ-পরিচয় হল। এই নিভৃতে ব'সে সেই পুরাতন বাংলার যে প্রতিনিধি তপস্যায় মগ্ন, মনে হল সেই তপস্যার তাপ যেন একটু লেগেছে আমার গায়ে।

পদধূলি নিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়। সরু রাস্তাটা পেরিয়েই অহল্যাবাঈ রোড। ঘড়িতে তখন রাত সাড়ে সাতটা। ফিরতি ট্রেন নটা দশে।

রচিত গ্রন্থাবলী

সরল পদার্থ-বিজ্ঞান। খ্রী ১৮৮৬

সরল প্রাকৃত ভূগোল। ১২৯৫ বঙ্গাব্দ

সরল রসায়ন। খ্রী ১৮৯৮

A Primer of Physiography। খ্রী ১৮৯৯

পত্রালী। খ্রী ১৯০৩

বিজ্ঞানের তত্ত্ব কাব্যরসে সিক্ত ক'রে আলোচনা

আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ। দুই ভাগ। খ্রী ১৯০৩

হিন্দু জ্যোতিষের উৎপত্তি, বিকাশ, পরিণতি; পুরাণের জ্যোতিষ: চন্দ্রসূর্যাদি গ্রহগণের আকৃতি, পরিমাণ, গতি, অন্তর: ফলিত জ্যোতিষের মূল—ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা

রত্নপরীক্ষা। খ্রী ১৯০৪

হীরা-মানিক প্রভৃতি রত্ন সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃতি সহ বিশদ আলোচনা

শঙ্কুনির্মাণ। খ্রী ১৯০৮

সূর্যঘড়ি নির্মাণের কৌশল-ব্যাখ্যা

Practical Chemistry for Beginners। খ্রী ১৯১০

বাঙ্গালা ভাষা। প্রথম ভাগ। তিন অধ্যায়ে স্বতন্ত্র প্রকাশিত।

প্রথম অধ্যায়: রাঢ়ের ভাষা। ১৩১৫ বঙ্গাব্দ

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাঙ্গালা শব্দ-শিক্ষা। ১৩১৭ বঙ্গাব্দ

তৃতীয় অধ্যায়: ব্যাকরণ। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ

বাঙ্গালা ভাষা। দ্বিতীয় ভাগ। চার খণ্ডে প্রকাশিত।

প্রথম খণ্ড। ১৩২০ বঙ্গাব্দ

দ্বিতীয় খণ্ড। ১৩২০ বঙ্গাব্দ

তৃতীয় খণ্ড। ১৩২১ বঙ্গাব্দ

চতুর্থ খণ্ড। ১৩২২ বঙ্গাব্দ

ক্ষুদ্র ও বৃহৎ। খ্রী ১৯১৯

রাণী বিশ্বেশ্বরী। ১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

The First Point of Aswini। খ্রী ১৯৩৪

Ancient Indian Life। খ্রী ১৯৪৮

শিক্ষাপ্রকল্প। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাসংস্কার। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ

পূজাপার্বণ। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

কোন্ পথে। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

পৌরাণিক উপাখ্যান। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ
যজুর্বেদ। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ
বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ
কি লিখি। ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

সিদ্ধান্তদর্পণঃ [মহামহোপাধ্যায় সামন্ত-শ্রীচন্দ্রশেখর সিংহেন বিরচিত]
খ্রী ১৮৯৯

চণ্ডীদাস-চরিত [কৃষ্ণপ্রসাদ সেন বিরচিত] ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ

চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

কীর্তির শ্মশান কখনোই নয়। কীর্তি তার ম্লান হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো সে কীর্তিমান। বাংলার রাজধানী এখন আর সে নয়, কিন্তু এখনও সে নবদ্বীপ। এই নামেই এর পরিচয়। রাষ্ট্রিক মর্যাদা না থাক্, শাস্ত্রিক ও সাহিত্যিক কদর এখনো এর অক্ষুণ্ণ; এখানকার শাস্ত্রসম্বন্ধীয় বা সাহিত্য-বিষয়ক মতামত এখনো বাংলার শিরোধার্য।

মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি এখানে। ৭ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, ২৩এ নভেম্বর ১৯৫২। শীতের রাত্রি। রাস্তার দু পাশে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলছে টিমটিম করে। ধীরে ধীরে চলেছি আগমেশ্বরীতলার উদ্দেশে।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে গেল দুটি কথা। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পর থেকে নবদ্বীপ বৈষ্ণবদের তীর্থরূপে পরিণত হয়েছে। বহু সাধনার আগুনের শিখায় নিজেদের শোধন করে সিদ্ধিলাভ করেছেন কত অগণিত মহাপুরুষ, এই শ্রীধাম তাঁদের সংস্পর্শে এসে গৌরবান্বিত হয়েছে। চৈতন্যের সময়েই এই নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন আর-এক সাধক, তিনি কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। ইনি শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ও সহাধ্যায়ী, কিন্তু এঁর সাধনার পথ ছিল ভিন্ন—শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ইনি ঘোর তান্ত্রিক হয়ে ওঠেন। বর্তমানে কার্তিক মাসের অমাবস্যায় যে শ্যামাপূজা হয়ে থাকে, এই আগমবাগীশই সেই পূজাপদ্ধতির আবিষ্কারক। তিনি শ্যামামূর্তির বরাভয়-কর কি ভাবে স্থাপিত হওয়া উচিত তা স্থির করেন। কী ক'রে, সে বিষয়ে একটি কাহিনী আছে। কিন্তু সে কথা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়। আগমবাগীশ এই মূর্তির উদ্ভাবক, সেইজন্যে ঐ মূর্তি আগমেশ্বরী নামে খ্যাত হল।

আগমেশ্বরীতলার উদ্দেশে রওনা হয়ে মনে হতে লাগল, নবদ্বীপের ন্যায় বৈষ্ণব-পীঠস্থানে এসে শাক্ত-পীঠের দিকে যেন যাত্রা করেছি। কৃষ্ণানন্দ এই

আগমেশ্বরীতলায়ই তাঁর তন্ত্রসাধনা করে গেছেন। শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের বিরোধ নাকি আছে, কিন্তু সাধনার সঙ্গে সাধনার কোনো দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই নেই। তা না হলে একই সময় একই শ্রীধামে দুইটি বিপরীত সাধনা এভাবে সিদ্ধিলাভ করত না।

সাধনার সঙ্গে সাধনার বিরোধ নেই। মতের সঙ্গে মতের লড়াই হতে পারে, কিন্তু সাধকে সাধকে আপোষ সর্বদেশে। নবদ্বীপ তার ব্যতিক্রম নয়।

আগমেশ্বরীতলার মোড়ে পৌঁছে দেখি, রাস্তা তিন দিকে তিন ভাগ হয়ে গেছে। কোন্ পথ ধরে চলব, ঠিক করতে না পেরে মাঝরাস্তায় আলোর দিকে মুখ করে দাঁড়ালাম। অদূরেই একটি লোক সাইকেল নিয়ে এদিকে আসছিল। তাকে জিজ্ঞেস করতেই সে পথ বাত্‌লে দিল।

মোড়ের একটু আগে একটা সরু গলি— অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। লোকটা বলল, "বেজায় সাপের ভয়। রাত করে যাওয়া বিপদ।" থমকে থেমে বললাম, "তাহলে থাক্, সকালের দিকেই আসা যাবে।" অভয় দিয়ে সে বলল, "না, আসুন। শীতের রাত। ওরা সব গর্তে গেছে।" আমাকে অভয় দিয়ে লোকটা এগলো, বলল, "আসুন, আমি পৌঁছে দিচ্ছি।" সে আগে আগে চলল, স্পষ্ট দেখলাম, সে বড় হুঁশিয়ার, সাইকেলের সামনের চাকা আগে ঠেলে দিয়ে সে পিছিয়ে হাঁটছে।

রাত প্রায় ন'টা হবে। কিন্তু চারিদিক এত নিস্তব্ধ যে মনে হতে লাগল রাতদুপুর যেন বেজে গিয়েছে।

ছোট্ট একটা ঘরের ঝাঁপের বেড়ার ফাঁক দিয়ে আলো দেখতে পেয়ে আশ্বস্ত হয়ে উঠলাম। সংকোচও হতে লাগল। এমন সময় এসে হয়তো ওঁকে বিরক্ত করাই হবে।

কিন্তু বিরক্ত করতে পারলাম না। ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরদিন সকালে যাব বলে চলে এলাম।

রোদ তেতে উঠতে সময় নিল। সে সময়টুকু দিয়ে বেলা নয়টার পর তাঁর কাছে গেলাম। একটি চৌকির উপর তিনি বসে আছেন। দৃষ্টিশক্তি এখন

অতি ক্ষীণ। কাছে গিয়ে বসে পরিচয় দিলাম। আশীর্বাদ করার মত করে তিনি স্মিত হেসে হাত তুললেন। হয়তো এইভাবেই তিনি অভ্যর্থনা করলেন।

বয়সে অতি প্রাচীন হয়েছেন। প্রায় নব্বই বছর বয়স হয়েছে। গত ভাদ্র মাস পর্যন্তও নাকি চলাফেরা করতে পারতেন, তাঁর শরীর এখন অচল হয়ে পড়েছে।

বললেন, "আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি আমাকে যে-পর্যায়ভুক্ত করতে ইচ্ছা করেছেন আমি সে-পর্যায়ের যোগ্য কি না, তাই ভাবছি।"

সব কথা স্পষ্ট বোঝা যায় না; তবু তার মধ্যে থেকেই কথাগুলো খুঁজে বেছে নিতে হয়।

"১২৭২ বঙ্গাব্দের ১৯এ শ্রাবণ [ইংরেজি ১৮৬৫ সালের ২ অগস্ট] ময়মনসিং জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার হালালিয়া গ্রামে আমার জন্ম।"

নিজের ব্যক্তিগত কথা বেশি বললেন না, কেবল বলতে লাগলেন নবদ্বীপের কথা এবং এখানকার পণ্ডিতবর্গের কথা।

বললেন, "নবদ্বীপে বিবুধজননী সভা ছিল। ছাত্র ও অধ্যাপকের একটি তালিকা থাকত। কাজেই তাদের মধ্যে বেশ একটা ভাব ছিল। দেশবিদেশ থেকে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হয়ে আসতেন। অনেক মহাপণ্ডিত আসতেন, বিদায় পেতেন। সেসব এখন ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। পণ্ডিত-সভা এখনো আছে, তবে ভগ্নদশা বলা যেতে পারে। ছাত্ররা বৃত্তি পেতেন মাসে এক টাকা বা পাঁচ সিকা। কোনো ছাত্র প্রথমে এলে তার বিচার হত, তার পর তার বৃত্তি ঠিক হত। আগে কোনো ছাত্র এলে সেখানে শাস্ত্রীয় তর্ক হত। আর এখন?" একটু থেমে বললেন, "এখন আসে স্বার্থসিদ্ধির জন্যে।"

তাঁর দিকে চেয়ে মনে হল যেন তিনি আক্ষেপ করছেন। হয়তো ভাবছেন, সব এমন গোলমাল হয়ে গেল কেন। তাঁরা তাঁদের জীবন সমর্পণ করেছেন যে শাস্ত্রীয় যজ্ঞের অগ্নিতে, আজ সে যজ্ঞের অনল এমন নিস্তেজ হয়ে এসেছে কেন। তাঁর জীবন স্তিমিত হয়ে এসেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে যজ্ঞের তাপ কমে আসবে কেন। নূতন কেউ কি নেই এর ইন্ধন জোগাবার জন্যে?

বললেন, "শিশুকাল থেকে শাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি। আমার পিতার নাম গুরুদাস বিদ্যারত্ন। সম্ভবত পিতার বিদ্যানুশীলনের স্পৃহাই আমর মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেছিল। নিজের গ্রামে ব্যাকরণশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করে ফরিদপুর জেলার কোরকদি গ্রামে জানকীনাথ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট গিয়ে ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ আরম্ভ করি। তার পর নবদ্বীপে এসে হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়তে থাকি। অতঃপর বাংলার অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় রাখালদাস ন্যায়-রত্ন মহাশয়ের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করি, ন্যায়রত্ন মহাশয় ভট্টপল্লী ত্যাগ করে কাশীধামে গেলে তাঁর সঙ্গে কাশী যাই ও পাঠ সমাপ্ত করি।"

অতি সংক্ষেপে তিনি তাঁর ছাত্রজীবন বিবৃত করে গেলেন। মনে হল, যেন এত সহজেই তিনি ন্যায়ের পাঠ সাঙ্গ করেছেন। অথচ এ কাজ অত সহজে সিদ্ধ হয়নি। ১৮৯০ সালে হরিনাথ তর্কসিদ্ধান্ত পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুকালে তাঁর চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা ছিল পঁচাত্তর জন। এত অধিক ছাত্র সচরাচর কোনো টোলে হয় না। কিন্তু হরিনাথের শিক্ষাদানের পদ্ধতির গুণেই ছাত্রগণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতেন। চণ্ডীদাস ছিলেন সেই ছাত্রদের অন্যতম। হরিনাথের ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁরা হচ্ছেন মহা-মহোপাধ্যায় আশুতোষ তর্কভূষণ ও মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ।

ছাত্রজীবনে চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ নবদ্বীপে আগেও এসেছেন। ১৯২৫ সালে তিনি এখানে এলেন অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করে। আশুতোষ তর্কভূষণের মৃত্যুর পর সেই শূন্যপদে অধিষ্ঠিত হন তাঁরই সতীর্থ চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ। তিনি এখানে এলেন গবর্নমেণ্টের ন্যায়াধ্যাপকরূপে। তদবধি নবদ্বীপেই আছেন। একটানা চব্বিশ বৎসর এই অধ্যাপক-পদ অলংকৃত করে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে অবসর গ্রহণ করেন। গবর্নমেণ্টের অধ্যাপক হলেও অবসর গ্রহণের পরে পেন্সনের নিয়ম এখানে নাই, কিন্তু ন্যায়রত্ন মহাশয়ের আসাধারণ বিদ্যাবত্তার জন্য গবর্নমেণ্ট বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারা তাঁকে মাসিক এক শত টাকা হারে পেন্সন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। জস্টিস বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় এই ব্যবস্থার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগ করেছিলেন বলে ইনি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

তাঁর পুত্রদের মধ্যে মাত্র একজন সংস্কৃত-শিক্ষার ধারা রক্ষা করে চলেছেন, ইনি উপস্থিত ছিলেন; এবং যেসব কথা আমি ধরতে পারছিলাম না, তাঁর পিতার সেই কথাগুলি তিনি আমাকে বলে দিচ্ছিলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, "নবদ্বীপে অনেকদিন আছেন। অনেক দেখেছেন। কার কথা আজ বেশি করে মনে পড়ে আপনার?"

বললেন, "মহামহোপাধ্যায় অজিতনাথ ন্যায়রত্ন। ১৯২০ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। আমি এখানে অধ্যাপক-পদ নিয়ে আসার আগে। কিন্তু তাঁকে আমি তার আগে থেকেই চিনি ও জানি। নবদ্বীপে আগেও এসেছি পাঁচ-ছয় বার। তিনি ছিলেন নবদ্বীপের রত্ন। দ্ব্যর্থমূলক সরস শ্লোক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল অপ্রতিহত। সভায় এসে দ্রুত শ্লোক রচনা দ্বারা সভ্যগণকে মোহিত করতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। তিনি কেবল সুকবি ছিলেন এমন নয়; তাঁর ন্যায় শাব্দিক ও আলংকারিক তৎকালে এদেশে দেখা যায় নি। তাঁর রচিত শ্লোকাবলী লোকের মুখে মুখে আজও চলেছে, সেগুলি সংকলিত হলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হতে পারে। তাঁর রচিত কাব্য বকদূত অভিনব শ্লিষ্ট দূতকাব্য— এতে তৎকালীন নবদ্বীপের বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

সাধকে সাধকে বিরোধ নেই বলায় সবটা বলা হয় না, সাধকে সাধকে আছে পরস্পরের প্রতি অনুরাগ। এই জন্যেই বৈষ্ণব-পীঠস্থানে আগমেশ্বরীতলা চিহ্নিত হয়েছে এবং এইজন্যেই চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ অজিতনাথ ন্যায়রত্নের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

গুণের প্রতি ও গুণীর প্রতি এই আকর্ষণ ছিল বলেই সেকালে গড়ে উঠেছিল বিবুধজননী। এবং একালে সেই টান শিথিল হয়ে এসেছে বলেই চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থের ন্যায় পরমবৃদ্ধ মহাপণ্ডিতের জড়িত গলায়ও আক্ষেপের ধ্বনি বেজে উঠতে শোনা যাচ্ছে। হয়তো তিনি ভাবছেন, সাতাশ বছর আগে যখন তিনি অধ্যাপকরূপে এলেন এই নবদ্বীপে, তখন এর শ্রী ছিল কতটা এবং আজই বা এর শ্রী কতটা। তাঁরা এবার চলে যাবেন, তার পর এর রূপের আরও অবনতি ঘটবে কি না— এই হয়তো তাঁর আশঙ্কা।

একটানা অনেকক্ষণ একভাবে কথা বলে চলেছেন। মনে হচ্ছে ওঁর

নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে হচ্ছে এতে। পায়ের উপরে একটি চাদর, গায়ে একটি ছোট জামা। একটি মাংসস্তূপের মত তিনি বসে। শরীর নড়ছে না, কিন্তু ঠোঁট দুটো অনবরতই নড়ছে। তিনি আজ তাঁর জীবনের সব কথা বলে ফেলার জন্য যেন তৈরি হয়ে বসেছেন। কিন্তু সব কথা আমি বুঝতে পারছি নে।

হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠলেন, প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ। প্রায় নব্বই বছরের এই অথর্ব বৃদ্ধের মুখে এই অট্টহাস্য শুনে চমকেই উঠলাম। কথার প্রসঙ্গের সঙ্গে হাসির কোনো যোগ খুঁজে পেলাম না। বাংলাদেশের পণ-প্রথার কথা বলতে গিয়ে তিনি হেসে উঠেছেন। জানিনে, এই হাসির পিছনে কোনো হাহাকার লুকানো আছে কি না।

হেসে ঢোক গিলে বললেন, "ছারখার হয়ে গেল দেশটা। এই প্রথাটা দেশের সর্বনাশ ঘটাল। এ পাপ দেশ থেকে দূর না হলে দেশের কল্যাণ নেই। এর বিরুদ্ধে আপনারা জোর করে লিখুন। এ প্রথা বন্ধ করে দিন।"

অট্টহাস্য করার সাধ্য নেই, মনে মনে হাসলাম। কাগজে দু কলম লেখার উপর এঁর কতখানি আস্থা। কিন্তু এ কাজ কেবল কাগজে লিখলেই যে হবে না, দেশের জননায়কদের ও সমাজসেবীদেরও এ-কাজে যে উদ্যোগী হতে হবে; তা না হলে যে কিছুতেই কিছু হবে না, এ কথা আর তাঁকে বললাম না।

বললেন, "জীবনধারণের জন্যে অর্থের দরকার। কিন্তু জীবনের জন্যে অর্থ না ভেবে যদি অর্থের জন্যেই জীবন মনে করা যায়, তাহলে তখনই অনর্থ শুরু হয়। এখন টোলে ছাত্র পাওয়া দায়। সংস্কৃতশিক্ষার ধারা যে বজায় থাকবে, তার নিশ্চয়তা কী? একজন সাধারণ তর্কতীর্থ আর একজন সাধারণ বি. এ., এ দুয়ের বাজার-মূল্যের পার্থক্য দেখলেই সব বুঝতে পারবেন। নগদবিদায়ের যুগ পড়েছে, তাই যেদিকে আর্থিক লাভ কিছু বেশি, সেই দিকেই সকলে ঝুঁকছে।"

এই প্রসঙ্গে একটা গল্প বললেন। তাঁর ছেলে যে-টোল চালাচ্ছেন তাতে একটি ছাত্র ভর্তি হয়ে কিছুদিন লেখাপড়া করে চলে যায়। সে দেখল এদিকে তার আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা কম। সে টোল ছেড়ে দিয়ে রেল-

ইঞ্জিনের ফায়ারম্যানের কাজ নিল। দু-তিন বছরের মধ্যেই তার উন্নতি হয়ে গেল, সে এখন ইঞ্জিন-ড্রাইভার— মাসিক বেতন পাচ্ছে নাকি সাড়ে তিন শ টাকা।

বললেন, "এসব প্রলোভন ছেড়ে ছেলেরা সংস্কৃত টোলে পড়তে চাইবে কেন? কিন্তু সংস্কৃত যদি এইভাবে চর্চাহীন হয়ে পড়ে, তার ফল কখনো ভালো হবে না।"

জীবনের সায়াহ্নে বসে আজ তিনি হয়তো ভাবছেন, নতুন আর-একটা জীবন পেলে নতুন করে সংস্কৃত-শিক্ষণের জন্যে তিনি উদ্যোগী হতে পারতেন। কিন্তু দেহের শক্তি যতই ক্ষীণ হয়ে আসছে, সেইসঙ্গে চারিদিকের আবহাওয়াও যখন বিশেষ অনুকূল বলে ঠেকছে না— তখন নিজেকে অসহায় মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

বললেন, "কিন্তু কেবল সরকারী ব্যবস্থা দিয়েই সব কাজ হয় না। সেটা একটা যন্ত্রের মত জিনিস। আসল কথা দেশের লোকের মন বদল করতে হবে, রুচি বদলাতে হবে। দেশের মাটিকে, দেশের বাতাসকে, দেশের ভাষাকে ভালোবাসতে শেখাতে হবে। এটা যদি হয়, তাহলে আর কোনো চিন্তাই নেই। তাহলে নিশ্চিন্তে মৃত্যুবরণ করতে পারি। এই শরীর নিয়ে এভাবে বেঁচে লাভ কী? পৃথিবীর কোনো কাজেই আর লাগছিনে যখন, তখন আর থেকে দরকার? আর কোনো আশাও রাখিনে, একমাত্র আশা এখন— মৃত্যুর। এই আশা নিয়ে বেঁচে আছি।"

চোখ বুজলেন চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ। দুই গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

এর কিছুকাল পরে সত্যিই তিনি চোখ বুজেছেন। সেদিন তাঁর গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েনি হয়তো, কিন্তু যাঁরা তাঁর জ্ঞানের ও গুণের খবর রেখেছে তাদের চোখ থেকে সেদিন ধারা নিশ্চয়ই নেমেছিল।

১৯৫৪ সালের ১৬ই মে, ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ২রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার দিন তিনি নবদ্বীপে দেহত্যাগ করেন।

তাঁর মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন করে ১৯ মে ৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে লেখা হয়—

'বিখ্যাত ন্যায়াধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ প্রবীণ বয়সে নবদ্বীপে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙলা দেশের মনীষিসমাজ হইতে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক অন্তর্হিত হইল। দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্যের সহিত সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার যে আশ্চর্য সমন্বয় বাঙলা দেশের সংস্কৃত অধ্যাপকদিগের জীবনে দেখা গিয়াছে মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস তাহার আদর্শ ছিলেন। বর্তমানে সামাজিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রার লক্ষ্য যেভাবে পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে এই আদর্শের ধারা অব্যাহত থাকিবে কিনা জানি না। কিন্তু ইহা সত্য ও সর্বতোভাবে স্বীকার্য যে, ইহা সমাজের প্রভূত কল্যাণ করিয়াছে। প্রবীণ বয়সে এবং পরিপূর্ণ জীবনসাধনার পর পরলোকগত এই মনীষীর জন্য শোক করিব না। তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।'

তাঁর চোখে জল দেখে তাঁকে আর-কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয় না। অনেকক্ষণ কথা বলে তিনি ক্লান্তও হয়েছিলেন। তাঁর পুত্র ছিলেন পাশে, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

স্বর্গত গুরুদাস বিদ্যারত্ন তাঁর আত্মজীবনচরিতে চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছেন। এই বই ১৩১৩ সনে প্রকাশিত হয়েছে। গুরুদাস বিদ্যারত্ন তাঁর গ্রন্থে চণ্ডীদাসের মেধা ও অধ্যবসায় সম্বন্ধে প্রভূত প্রশংসা করছেন।

অধ্যয়নের প্রতি তাঁর টান ছিল অত্যন্ত প্রবল, অধ্যয়নকালে ইনি এমনই তন্ময় হয়ে যেতেন যে, কোনো কোনো দিন রাত্রে আহারের কথা পর্যন্ত ভুলে যেতেন। পাকা টোলে ছাত্রাবস্থায় স্বপাক খাওয়ার রীতি ছিল। চাকর এসে উনুনে আঁচ দিয়ে যেত, কিন্তু উনুন কখন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যেত সে খেয়ালও এঁর হত না, রান্না করাও হত না। অনাহারেই রাত কেটে যেত। যতগুলি পরীক্ষা দিয়েছেন, তাতে বারবার প্রথম স্থান অধিকার করেছেন চণ্ডীদাস। প্রাচীন ন্যায়ের পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ৩৩০৲ টাকা পুরস্কার ও একটি স্বর্ণকেয়ূর পান ; নব্যন্যায়ের উপাধি-পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে ১৮০৲ টাকা পুরস্কার, একটি স্বর্ণপদক ও একটি স্বর্ণকেয়ূর পান।

অধ্যয়ন শেষ ক'রে তিনি টাঙাইলের অন্তর্গত সন্তোষের জমিদার রানী দিনমণি চৌধুরানীর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাকৈর সংস্কৃত কলেজে সাত বৎসর ন্যায়-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করেন, তৎপর কাশিমবাজার-নিবাসিনী রানী আন্নাকালী-দেবী প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর জুবিলি টোলে একুশ বৎসর অধ্যাপনা করে নবদ্বীপে আসেন অধ্যাপক-পদ নিয়ে ১৯২৫ সালে।

চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ যেমন অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, অন্যদিকে তেমনি ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম-রক্ষার প্রতীক। দীর্ঘকাল যাবৎ ইনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ্যসভার সভাপতি।

একটা সুদীর্ঘ জীবন তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে। তাতে যে অমৃত উঠেছে তা আকণ্ঠ পানও করেছেন। তবু তৃষ্ণা হয়তো মেটেনি। এখনো জ্ঞানের পিপাসায় কণ্ঠ হয়তো তাঁর শুষ্ক। কিন্তু আর শক্তিও নেই, আর সামর্থ্যও নেই। তাই তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে চোখ বুজে চিন্তা করেন তাঁর গতজীবনের কথা— যে জীবনটা কেটে গিয়েছে বিদ্যা-আহরণে ও বিদ্যাবিতরণে। যা তিনি অর্জন করেছেন নিজের চেষ্টায় ও সাধনায়, সেই জ্ঞান তিনি বণ্টন করে দিয়েছেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। তাঁর অধ্যাপনা-কালে বহু ছাত্র ন্যায়-শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্কৃতশাস্ত্রের গবেষণা-বিভাগের গবেষক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগচী তর্কবেদান্ততীর্থ তাঁর ছাত্র।

দেশবিদেশ থেকে মহা মহা পণ্ডিতগণ এসে মিলিত হন এই নবদ্বীপে। এই পণ্ডিত-সম্মেলনের মধ্যে অদ্বিতীয়ত্ব অর্জন করার মত জ্ঞান অভিজ্ঞতা বিদ্যা ও বিনয় দিয়ে তৈরি যে পুরুষ তাঁকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে, ইনিই সেই অসামান্য মনীষী। অতি সাধারণ জীবন যাপন করে চলেছেন, নব-দ্বীপের আগমেশ্বরীতলার একটি সরু গলির শেষে একটি ভাড়াটে কুঠিতে বাস করছেন পণ্ডিত চণ্ডীদাস।

বাড়িটার চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলাম। সকালের রোদ এসে উঠোন ও বারান্দা ভরে দিয়েছে। ভালো লাগছিল এই আবহাওয়াটা। গাছে গাছে পাখির ডাক আছে, চড়াই ও শালিকের চটুল ছুটোছুটি আছে। উঁচু দাওয়ার উপর মাঝে মাঝে উড়ন্ত চিলের পাখার ছায়া পড়ছে। এইটেই হয়তো জীবনের পরম শান্তি— এই রৌদ্র আর এই ছায়া এবং এই মনোমুগ্ধকর

পরিবেশ। কিছু-একটা লাভ চাই শেষজীবনে। আর-কিছু না হোক, নবদ্বীপের ভাড়াটে কুঠির এই রমণীয় পরিবেশটাই হয়তো পরমলাভ পণ্ডিত চণ্ডীদাসের।

উঠে দাঁড়িয়ে প্রণাম করতেই তিনি আমার দুটো হাত ব্যগ্র আন্তরিকতার সঙ্গে চেপে ধরে আবেগের সঙ্গে জড়িত গলায় বললেন, "অভ্যর্থনায় যদি কোনো ত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে মার্জনা করবেন।"

এমন কথার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগল, এর কী উত্তর দেবে ভেবে পেলাম না।

ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে। বারান্দা ডিঙিয়ে উঠোনে নামলাম, উঠোন ডিঙিয়ে সরু গলিতে, গলি পার হয়ে রাস্তায়। তাঁর শেষ কথাটায় অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। বড় রাস্তায় পৌঁছে জোরে হাঁটতে শুরু করলাম। কানের মধ্যে বাজতে লাগল তাঁর শেষ কথাটা, একটু পরেই তা ছাপিয়ে বেজে উঠল তাঁর সেই অট্টহাস্যটা।

সম্পাদিত গ্রন্থ

কুসুমাঞ্জলিকারিকা উদয়নাচার্য। আশুতোষ সংস্কৃত সিরিজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বসন্তরঞ্জন রায়

বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের কথা লিখতে বসে অন্য কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। কবি বায়রন বলেছেন যে, একদিন এক সুপ্রভাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে তিনি দেখলেন, তিনি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন ; তাঁর খ্যাতিটা তাঁর কাছে এসেছিল এমনি আকস্মিকভাবে। আর-এক জন হচ্ছেন ন্যুট হ্যামসন ; দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে তিনি লিখলেন একটা বই, তার নাম দিলেন হাঙ্গার। তিনি তখন অখ্যাত অজ্ঞাত ও নেহাতই সাধারণ একটি যুবক। তাঁর রচিত গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য তিনি কয়েকটি প্রকাশকের দ্বারস্থ হন। অবশেষে একটি পুস্তক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠান অনুগ্রহ দেখালেন তাঁর প্রতি—তাঁর পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখবেন বলে স্বীকৃত হলেন। হ্যামসন দিয়ে এলেন তাঁর লেখাটা। কিছুদিত পর সেই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক-মণ্ডলীর বৈঠকে পাণ্ডুলিপি পড়া আরম্ভ হল, সকলে মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছেন : অবশেষে পড়া যখন শেষ হল তখন একজন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করে উঠলেন, 'নাম কি, নাম কি লেখকের ?' যাঁর হাতে পাণ্ডুলিপি ছিল তিনি পাতা উল্টে নামটি পড়লেন, বলে উঠলেন—'ন্যুট হ্যামসন'। মনে হল, সারা পৃথিবীকে উদ্দেশ ক'রে ঘোষণা করা হল নামটি। হ্যামসন অবিলম্বে জগদ্বিখ্যাত হয়ে গেলেন।

বসন্তরঞ্জনের জীবনেও অনেকটা এই রকমই ঘটনা ঘটেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে নীরবে বসে নির্জনে তিনি বঙ্গভারতীর পূজা করে চলেছেন। এই নেপথ্য-পূজারীর পরিচয় কেউ জানত না। কিন্তু একটি শুভদিন এসে গেল ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক। একদিন বসন্তরঞ্জন এসে তাঁকে সংবাদ দিলেন যে, বসন্তরঞ্জন চণ্ডীদাসের একটা নূতন পুস্তক আবিষ্কার করেছেন। এ পুস্তক এমন পুস্তক যে কেউ এর অস্তিত্ব জানত না। সংবাদ শুনে চমকে উঠলেন রামেন্দ্রসুন্দর। এবং হয়তো সেইসঙ্গে চমকে উঠল সারা বাংলাদেশটাই। সঙ্গেসঙ্গে অজ্ঞাত বসন্তরঞ্জন প্রখ্যাত হয়ে উঠলেন। অপরিচিতির যে পর্দার আড়ালে তিনি

ছিলেন, সেই পর্দা যেন উঠে গেল। বাংলা সুধীমণ্ডলীর সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হল বসন্তরঞ্জনের প্রকৃত পরিচয়।

পুঁথি-অন্বেষণ করা বসন্তরঞ্জনের আবাল্যের অভ্যাস।—

যদি কোথা দেখ ছাই
খুঁজিয়া দেখিবে তাই
পাইলে পাইতে পার অমূল্য রতন।

এই উপদেশবাক্যটি তিনি অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন। পুঁথি-অন্বেষণের অভ্যাস ছিল ব'লেই তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। সামান্য একটি সংবাদের উপর নির্ভর করে দুর্গম বন-বাদাড় ভেদ করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটেছেন, যদি কোনো অমূল্য রতন পাওয়া যায়। সব-কয়টি অমূল্য না হলেও অনেক রত্ন তিনি উদ্ধার করেছেন— প্রায় ৮০০ পুঁথি তিনি সংগ্রহ করেছেন। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে একদিন তিনি সত্যিই পেয়ে গেলেন একটি অমূল্য রত্নই— চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এবং এই আবিষ্কারের শুভসংবাদটি তিনি প্রথমেই দিলেন রামেন্দ্রসুন্দরকে।

বসন্তরঞ্জন এ সম্বন্ধে বলেছেন— পুঁথির আদ্যন্তবিহীন খণ্ডিতাংশে কবির পরিচয়, রচনাকাল, লিপিকাল প্রভৃতি কিছুই পাওয়া যায় নি ; এমনকি, পুঁথির নামটি পর্যন্ত না। চণ্ডীদাস-বিরচিত কৃষ্ণকীর্তনের অস্তিত্বের কথা অনেকদিন থেকে তিনি শুনে আসছিলেন, এতদিনে তার সমাধান হল। তিনি যে পুঁথি উদ্ধার করেছেন সেটিই সেই কৃষ্ণকীর্তন, এই ধারণায় এ পুঁথির নাম দেওয়া হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

চণ্ডীদাসের পদাবলীর সঙ্গে আমরা পরিচিত। কিন্তু সে-পদাবলীর ভাষা তো আমাদের সমসাময়িক ভাষারই শামিল। তাহলে কি চণ্ডীদাসের আমলেও বাংলা ভাষার রূপ ছিল আধুনিক বাংলার মতই? তা সম্ভব নয়। খাঁটি চণ্ডীদাসী ভাষা গায়কদের হাতে ও বিভিন্ন কালের পুঁথিলেখকদের হাতে পড়ে পরিমার্জিত ও পরিচ্ছন্ন হতে হতে আমাদের কাছে এসে যখন পৌছল, তখন আমরা তাতে পেলাম একালের ভাষা। আমরা পেলাম—

সই, কে বা শুনাইল শ্যাম নাম

কিন্তু পুরাতন আমলের ভাষা তো এ রকম হওয়া সম্ভব নয়, সে ভাষা হবে—

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি

কালিনী নই কূলে

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে পদ পাওয়া গিয়েছে, তা হচ্ছে এই পদ, তা হচ্ছে এই ভাষা—অকৃত্রিম ও অমার্জিত, অসংস্কৃত ও অনাধুনিকতাপাদিত পুরাতন বাংলার গ্রাম্য পদকারের ভাষা।

এই পুঁথি আবিষ্কারের পরে এর কালনির্ণয়ের জন্যে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে সেটি দাখিল করা হয়। তিনি বিচার ও পরীক্ষা করে বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাংলা পুঁথি।

বসন্তরঞ্জন সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বাংলা পুঁথির আবিষ্কর্তার গৌরব অর্জন করেছেন। এটি তিনি সংগ্রহ করেছেন বন-বিষ্ণুপুরের সন্নিকট কাঁকিল্যা গ্রামে।

শেষ জীবন তিনি অতিবাহিত করছিলেন ঝাড়গ্রামে, সেখানে গিয়ে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করি, এবং তিনি অসুস্থ ছিলেন ব'লে তাঁরই পরামর্শে দিন-কয়েকের জন্যে দেখা করা স্থগিত রাখি। ইতিমধ্যে উপকরণ হিসেবে তিনি তাঁর বংশ-পরিচয়ের কড়চা ও জীবনের ঘটনাবলী লিখে রাখেন। কিন্তু অসুস্থতা থেকে নিষ্কৃতি তিনি পেলেন না। তাঁর শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধানের উত্তরে কয়েক দিন পরে তাঁর পুত্র শ্রীরামপ্রসাদ রায় চিঠি লিখে জানালেন—

'…আপনার পত্র পাইলাম। বাবাকে সুস্থ করিয়া তুলিতে পারিলাম না; তিনি গত ২৩এ কার্তিক ১৩৫৯ [৯ নবেম্বর ১৯৫২] রাত্রি সাড়ে ৯টার সময় সজ্ঞানে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।…'

এই চিঠি পেয়ে স্থির করি, বসন্তরঞ্জন যে তথ্য লিখে রেখে গেছেন তার সাহায্যেই তাঁর জীবনকথা রচনা করব। এবং তাই করা হল।

বংশ-পরিচয়ের যে কড়চাটি তিনি লিখে যান প্রথমে তা উদ্‌ধৃত করি—

'ঘটকদের বর্ণনা অনুসারে বেলিয়াতোড়বাসী গুহ-রায় গোষ্ঠী যশোহর সমাজ ভুক্ত; এবং রাড়ে উপনিবিষ্ট আড়াই ঘর গুহ মধ্যে আধ ঘর। ইঁহারা

যে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ছয় পুত্রের অন্যতম রাজীবলোচন মজুমদারের বংশধর, তাহার সমর্থন পাওয়া যায় সমসাময়িক পুঁথিপত্রে। দেশবলি-বিবৃতিতে বেলিয়াতোড়ের আধা-সংস্কৃত নাম বালিয়াতেটিক। উহাতে আরও আছে, এখানে বহু কায়স্থ জাতির বাস। এবং রাজা গোপাল সিংহের মন্ত্রী রাজীব তথায় বাস করেন। ভগীরথ গুহের সহিত এই বংশের সাক্ষাৎসম্পর্কের একান্ত প্রমাণাভাব। আজও গুহগোষ্ঠী যশোহরের পুরাতন স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছেন। তাহার নিদর্শন দুর্গোৎসবে পূর্ণাবয়ব দেবী-প্রতিমার। পরিবর্তে যশোহরেশ্বরীর আদর্শে মুখপাত্র অর্চনার ব্যবস্থা। অল্প কিছুদিন পূর্বেও গুহ গোষ্ঠীর ভিতর রাজা বসন্ত রায় ও প্রতাপাদিত্য ঘটিত বহু গালগল্প সাগ্রহে আলোচিত হইত। সে যাহা হউক কনৌজাগত বিরাট গুহ হইতে ইহারা ২৩।২৪ পর্যায়ের। কয়েক পুরুষ ধরিয়া গুহবংশীয়েরা বিষ্ণুপুররাজের দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সতত্তরাম ও মুকুন্দরাম যথাক্রমে মহারাজা রঘুনাথ সিংহ ২য় (শকাব্দ ৬২৫।৩৪) এবং চৈতন্য সিংহের (শকাব্দ ১৬৭১-১৭২৪) সমকালে দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান বিদ্যাধর সৌখীন পুরুষ ছিলেন ; মেজাজ ও চালচলন কতকটা আমিরী ধরণের ছিল। লালমোহনের কবিশেখর আখ্যা ছিল। ইনি শ্রীশ্রীগোপাল বিগ্রহের সম্মুখে নিত্য নূতন স্তোত্র (অবশ্য সংস্কৃতে) রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতেন। দুঃখের বিষয়, সেগুলি অযত্নে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এক সময় দেওয়ান বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। রাধাকান্ত মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং তদীয় অনুজ নবকিশোর তথায় ক্রোরীর কার্য করিতেন। বেণীমাধব সিপাহী যুদ্ধের সময় পুরুলিয়ার ডেপুটিকমিশনারের সেরেস্তাদার ছিলেন। ইঁহার অন্নদাতা বলিয়া সুনাম ছিল। বেণীমাধবের মধ্যম সহোদর গোপাল-চরণ অত্যন্ত লোকপ্রিয় ছিলেন। মহাভারতের সদ্বক্তা সুযশ ছিল। নীলকণ্ঠ পরিণতবয়সে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। রামচরণ বাঁকুড়া বেঞ্চে দীর্ঘকাল অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। যুগলবিহারী গ্রাম্য বিবাদ-বিসংবাদ মিটাইতে সুদক্ষ ছিলেন। রায়বাহাদুর বামাচরণ বাঁকুড়া বারের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং চরিত্রগুণে আপামর সাধারণের শ্রদ্ধা-

ভাজন হইয়াছিলেন। যোগেন্দ্রনাথ মেদিনীপুরের উদীয়মান ব্যবহারজীবী ছিলেন। অবিনাশচন্দ্র অ্যালবার্ট কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। বসন্তরঞ্জন এই বংশেরই একজন।'

বঙ্গাব্দ ১২৭২, ইংরেজি ১৮৬৫, মহাষ্টমীর পূর্ববর্তী অষ্টমী তিথিতে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে বসন্তরঞ্জনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম রামনারায়ণ রায়। বেলিয়াতোড়ের এই রায়পরিবার অভিজাত সমৃদ্ধশালী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। এই পরিবারে শিল্পী যামিনী রায়ও জন্মগ্রহণ করেন, তিনি বসন্তরঞ্জনের খুড়তুতো ভাই।

ছেলেবেলা থেকেই বৈষ্ণব পদাবলী ও পদকর্তাদের প্রতি তাঁর টান হয়। বিশেষ করে বিদ্যাপতির প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল একটু মাত্রাছাড়া। তিনি বলেছেন, "স্কুলের বন্ধুরা আমাকে বিদ্যাপতি বলে ঠাট্টা করত। পুঁথি-সাহিত্যের উপর আমার টান দেখে, আর ফেলে-দেওয়া কাগজপত্র ঘাঁটতাম বলে আমাকে পাগল বলত।"

ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার যা প্রচলিত নিয়ম সেই অনুসারেই তাঁর বিদ্যারম্ভ হয়। কিন্তু স্কুলের সে বাঁধা-ধরা বিদ্যা তাঁর বেশি দূর এগোয় নি। ধীরে ধীরে স্কুলের পরীক্ষায় পাস করে তিনি এগিয়ে চললেন। তার পর "পুরুলিয়া জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিলাম। কিন্তু অঙ্কের পরীক্ষায় পাস করতে পারলাম না। এনট্রান্স ফেল করলাম। আমার ছাত্রজীবনও শেষ হয়ে গেল।"

অর্থাৎ ধরা-বাঁধা নিয়মের ছাত্রজীবন তাঁর শেষ হল এখানে। কিন্তু যে ছাত্র-জীবনে বাঁধ নেই, বেড়া নেই, নিয়ম নেই, কানুন নেই— সেই নিজের পাঠশালার ছাত্রজীবন শুরু হল তাঁর এখন। তিনি নিজের উৎসাহে, নিজের উদ্দীপনায় এবং নিজের মনের তাগিদে নিজের রাস্তা নির্মাণ আরম্ভ করলেন নিজের হাতে। যে পুঁথি সকলে পড়ে গেছে সে পুঁথিতে মন তাঁর বসল না, নিজের রচিত রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে তিনি সেই পুঁথির সন্ধান আরম্ভ করে দিলেন, যে পুঁথি আগে কেউ পড়ে নি, যে পুঁথির সন্ধান আগে কেউ জানে নি। এ এক অভিনব ছাত্র-

জীবন। নিজের পাঠের জন্যে পুঁথি-আবিষ্কারে মগ্ন হলেন এই অভিনব বিদ্যার্থী। "গ্রামে গ্রামে ঘুরে পুঁথির সন্ধান কিরূপে ক্লেশকর ও আয়াসসাধ্য, তা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কাউকে বোঝানো কঠিন। সুদূর মফস্বলের সর্বত্র যানবাহন সুলভ নয়। পথ কোথাও দুর্গম, কোথাও কোথাও পথ নাই বললেও হয়। ছোট বড় অসুবিধেও ঢের। আকর্ষণ— স্বভাবের শোভা দর্শনের সুযোগ, তথা সমাজের সকল স্তরের লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিলনের অবসর। এই অনুসন্ধান-কার্যে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। এক ক্ষেত্রে জীবনসংশয় ঘটে। এত সত্ত্বেও পুঁথি খোঁজার একটা মোহ ছিল, কি জানি, কেমন সুখ পেতাম। তারই প্রলোভনে পুনঃপুনঃ পুঁথির অন্বেষণে বাহির হয়ে আট শতের বেশি পুঁথি সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং বিলোপসাধন আশঙ্কায় ক্রমশ সবগুলিই বঙ্গীয়-সহিত্য-পরিষৎকে উপহার দিয়েছি।"

সাহিত্য-পরিষদে এই পুঁথিগুলি সযত্নে রক্ষিত আছে। অবশেষে "১৩১৬ বঙ্গাব্দে কৃষ্ণকীর্তন পুঁথির সন্ধান পাই। ১৩১৮ সনে পরিষদের জন্যে সেটি আহৃত হয়।"

যে ঐশ্বর্য লাভ করার জন্যে তিনি জীবনে আর কিছুই চান নি, জীবনের যাবতীয় সুখ বর্জন করেছিলেন, এবার যেন তাই পেয়ে গেলেন, নবাবিষ্কৃত পুঁথির পাতা উল্টে তিনি দেখলেন তাতে পুরাতন বাংলার হরফে লেখা আছে—

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো
আন না চাহিলো

এবার যেন পেয়ে গেলেন সেই কাহ্নকেই এই নূতন কীর্তনের মধ্যে— এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। ধন্য হয়ে গেল তাঁর জীবন, ধন্য হয়ে গেল বাংলা সাহিত্য।

এনট্রান্স ফেল করে নিয়মে-বাঁধা ছাত্রজীবন শেষ হবার পর তিনি বাড়িতে বসে মৈথিলী-আসামী-ওড়িয়া-বাংলা ইত্যাদি সাহিত্যের আলোচনায় রত থাকেন। অর্থের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না এতটুকু, অনটনের প্রতি ছিল পরম ঔদাসীন্য। নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন থেকে সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় তিনি রত থাকেন। তাঁর এই নিষ্ঠা দেখে এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রতি

এই প্রগাঢ় অনুরাগ দেখে নবদ্বীপের ভুবনমোহন চতুষ্পাঠী তাঁকে বিদ্বদ্বল্লভ উপাধি দান করেন। সেই থেকে বিদ্বদ্বল্লভ-নামেই সুধীসমাজে বসন্তরঞ্জন পরিচিত।

১৮৯৩ সালের জুলাই মাসে কলকাতার গ্রে স্ট্রীটে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব-বাহাদুরের গৃহে বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অব লিটারেচার প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচিত হন দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিরাই। এই বিদ্বৎজন-সভায় প্রবেশের আগ্রহ হয় বিদ্বদ্বল্লভের। কিন্তু তিনি তখন গণ্যও নন এবং তেমন মান্যও নন; সুতরাং তাঁর পক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়ার আশা দুরাশা বলেই মনে হল। কেননা, সাধারণত শিক্ষা বলতে যা বোঝায়, তেমন কোনো শিক্ষার ছাপ তাঁর নেই। বসন্তরঞ্জন এখানে প্রবেশের জন্যে আরজি পেশ করলেন। এই আরজিতে তিনি নিজের যোগ্যতার উল্লেখ করলেন না; কেননা, তাঁর নিজের ধারণা, তিনি এখানে প্রবেশের যোগ্য নন। অনিয়মের পথে চলাই তাঁর অভ্যাস, তাই তিনি যোগ্যতার কোনো উল্লেখ না করে নিজের অযোগ্যতার বিষয়ই উল্লেখ করলেন। কর্তৃপক্ষ এই অযোগ্য ব্যক্তিটির আবেদন মঞ্জুর করলেন, বসন্তরঞ্জন এই অ্যাকাডেমির সদস্যরূপে মনোনীত হলেন। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪ সাল, বসন্তরঞ্জন অ্যাকাডেমির দ্বাবিংশ অধিবেশনে সদস্যরূপে উপস্থিত হলেন।

এর কিছুদিন পরেই, ১৩০১ বঙ্গাব্দে, অ্যাকাডেমির নাম বদল হয়। ইংরেজি নাম রূপান্তরিত হল বাংলা নামে, নাম হল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ। পরিষদের সেই জন্মদিন থেকে বসন্তরঞ্জন এর সদস্য। তখনকার কর্তৃপক্ষের উৎসাহে পরিষদে পুঁথিশালার পত্তন হয়— এই পুঁথিশালায় বসন্তরঞ্জনের দান অনেক। এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ দান শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কৃত ও আহৃত হল, এদিকে বসন্তরঞ্জনের আর্থিক অবস্থা তখন ভয়াবহ। তিনি বিপন্ন হয়ে পড়েন এই সময়। তখন তাঁর অবস্থা বিবেচনা করে পরিষৎ তাঁকে মাসিক কিঞ্চিৎ অর্থদানের সিদ্ধান্ত করেন। অর্থ সামান্যই, কিন্তু তাই তিনি সানন্দে গ্রহণ করলেন।

পরিষদের সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁর অঙ্গাঙ্গী। যা-কিছু তিনি আহরণ করেন

সসম্ভ্রমে তাই এনে দান করেন পরিষদের পুঁথি-ভাণ্ডারে। এতেই তাঁর যেন জীবনের শান্তি এবং এতেই যেন তাঁর সমস্ত পরিশ্রমের পুরস্কার। জীবনকে তিনি উৎসর্গ করে দিয়েছেন পুঁথির মধ্যে এবং পরিষদের মধ্যে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-প্রকাশের পর দেশের ও বিদেশের বহু ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও রসতত্ত্ববিদ্ মনীষী এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পরস্পরবিরোধী আলোচনা করতে আরম্ভ করেন। বসন্তরঞ্জন এ আলোচনায় যোগ না দিলেও তাঁর কোনো ত্রুটি হত না। কিন্তু তিনি তাঁর নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে এতই সুনিশ্চিত ছিলেন যে, তিনি উক্ত মনীষীদের সব মন্তব্যের উত্তর দান করেন।

এর পর এল তাঁর আর-একটি জীবন— অধ্যাপনার জীবন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার ক্লাস খোলা হয়েছে। উপযুক্ত অধ্যাপকের জন্ম অনুসন্ধান করা হচ্ছে। তখন রামেন্দ্রসুন্দর গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষকে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গসরস্বতীর আসন প্রতিষ্ঠা করা হল, যোগ্য পূজারীর সমাদর তাহলে করা আবশ্যক। রামেন্দ্রসুন্দর নাম করলেন বসন্তরঞ্জনের। বসন্তরঞ্জন এ বিষয় বলেছেন, "আমি ইংরেজি জানিনে, এটাই সর্বপ্রথম আলোচিত হয়েছিল। আশুতোষের এক প্রিয়পাত্র এই অভিযোগ করলেন। সেজন্যে আমাকে নানাভাবে যাচাই করা হয়।"

নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে ১৯১৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদ লাভ করেন। ১৯৩২ সাল পর্যন্ত তিনি এই কাজ যোগ্যতার সঙ্গে করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি আবার পরিষৎ নিয়ে মেতে উঠলেন। পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি ও বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হলেন।

এই সময় তিনি হাত দিলেন নূতন আর-একটি কাজে— প্রাচীন বঙ্গীয় শব্দ সংকলনে। তাঁর এই কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৪৪ সালে তাঁকে সোসাইটির সদস্যরূপে গ্রহণ করলেন।

১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী পদক দান করেন।

পুঁথি-সংগ্রহই তাঁর জীবনের প্রধান আকর্ষণ। এই আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে তিনি অগ্রসর হয়ে সাফল্য অর্জন করেছেন। কিন্তু কেন, কিসের জন্ত তাঁর মন এদিকে গেল তার খোঁজ তিনি নিজেই রাখেন না। "যে সময় আমি এসব আরম্ভ করি, তখন কেন, এখনও তা থেকে কোনো অর্থ বা সম্মান পাওয়া যেত না। তোমরা বল যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মত কোনো বই এত ভালো করে সম্পাদিত হয়নি। এর চতুর্থ সংস্করণে পুনর্লিখিত ভূমিকায় দেখতে পাবে যে, আমি এখনো আমার মনের মত করতে পরিনি। এখনও আমার অনেক শেখবার আছে। অনেক জানতে বাকি আছে।"

এ কথা কোনো অধ্যাপকের মুখের কথা যেন নয়, কেননা, অধ্যাপকেরা তো সবই জানেন। এ কথা একজন বিদ্যার্থীর মুখের ভাষা। এইজন্তেই তাঁকে অভিনব বিদ্যার্থী বলেই মনে হয়। জ্ঞানের আর অভিজ্ঞতার কি শেষ আছে? যে প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী, তাঁর কাছে experience হচ্ছে কেবল একটা arc— একটা দিগন্তবিশেষ, যাকে কোনো দিন ধরা যাবে না, ছোঁয়া যাবে না। সেই দিগন্তের উদ্দেশে হাত বাড়িয়ে এগিয়ে চলেছিলেন বসন্তরঞ্জন।

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী
সারঙ্গরঙ্গদা
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন
বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ
কমলাকান্তের সাধকরঞ্জন। অটলবিহারী ঘোষের সহযোগিতায়
হরিলীলা। দীনেশচন্দ্র সেনের সহযোগিতায়

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ভাষা বাংলা ভাষাই। কিন্তু এ ভাষারও পূর্ব-পশ্চিম আছে উত্তর-দক্ষিণ আছে। বাংলা ভাষাতেই এমন শব্দ আছে যা বঙ্গদেশের পূর্ব সীমানায় আবদ্ধ, আবার এমন শব্দও আছে যা পদ্মা নদীর স্রোত ডিঙিয়ে এপার থেকে ওপার যেতে পারে নি। এমনি একটা শব্দ নিয়ে কথা হচ্ছিল কিছু দিন আগে আমার এক কবি-বন্ধুর সঙ্গে। তিনি একটি গ্রাম্যছড়া সংগ্রহ করেছেন, কিন্তু তার 'আজল' কথাটির মানে না বোঝায় তার অর্থটা পরিষ্কার হচ্ছে না—

আজল বলে, কাজল রে ভাই

আমি রাঙা মুখের পান …

তিনি জনকয়েক ভাষাবিদের কাছে এর মানের জন্যে অনুসন্ধান করেছেন, অনেক বইও ঘেঁটেছেন, কিন্তু আসল মানেটা পান নি। তাঁকে কেউ কেউ নাকি পরামর্শ দিয়েছেন এই বলে যে, কথাটি সম্ভবতঃ উজ্জ্বল থেকে এসেছে। কিন্তু এতেও ছড়াটির তেমন কোনো মানে হয় না।

আমি উত্তরবাংলার লোক। আজলের সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব ঘনিষ্ঠ। উত্তরবাংলার মেয়েমহলে এ কথাটা খুব চালু। ছড়াটি যেদিন আমার চোখে পড়ল সেদিন তৎক্ষণাৎ আমি এর মানে তাই ধরতে পারলাম। আমার মুখে ছড়াটির তারিফ শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। তিনি যে এর আগে এইটে নিয়ে এত মুশকিলে পড়েছিলেন জানতাম না। আমি বললাম, 'আজল মানে, ন্যাকা।' আমার কথা শুনে কবি-বন্ধুটি পুলকিত হয়ে উঠলেন, ছড়ার মানে তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি সোৎসাহে একটা মোটা অভিধান খুললেন, ঠিক, তাতে মানে দেওয়া আছে, কেবল শব্দটির অর্থই নয়, প্রাচীন কবিদের রচনা থেকে উদ্ধৃতি পর্যন্ত, লেখা আছে—

আজল—'স্ত্রী' বিং [আদরী>আজলী>°ল (?), বৈষ্ণব-সাহিত্যে] ১ আদরিণী, স্নেহপাত্রী। "রাজার কুমারী তুমি আজল কন্যাখানি। কেমনে সহিবা দুঃখ ত্যজি অন্ন পানি॥"—বিবহরি ও পদ্মাবতীর পাঁচালী ৩২৪। ২ [অস আজলা—মূঢ়; আজলমাটি—আজিনাও মা

জানার ভাব করা] যে আদরে নেকা সাজে, অর্থাৎ জানিয়াও না জানার ভান করে। "যেহ্ন তেহ্ন লএ নিজ কাজে। হেন সে আজল দেবরাজে॥" শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২৪৭।-জলি,-জলী বিং, ১ আদরিণী, পাগলী ; অগেয়ানী। "দৈবকীনন্দনে বলে, শুন লো আজলি। তুমি কি না জানো গোরা নাগর বনমালী॥"—নবদ্বীপ-পরিক্রমা ২৮৯। ২ যে নারী জানিয়াও আদরে অবুঝের ভান করে; নেকী। "দেখি তোহ্মাকে আজলী। পর কাজে তোঁ বিকলী॥" শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ২১; আজলী রাধা। তোঁ আবালী বড়ী। হের পাপ্পী পরমাণে ৩৭।

এই মোটা বইটি শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ। এটা মাত্র তার একটি খণ্ড, এমনি আরও চারটে খণ্ড আছে। এতে প্রত্যেকটি শব্দকে তিনি এমনি নিখুঁতভাবে বিচার করেছেন এবং সেই সঙ্গে তার পরিচয় দিয়েছেন।

শান্তিনিকেতনের থমথমে দুপুর। রাঙাপথের দক্ষিণ পার্শ্বে চীনা-ভবন; এর পরে দক্ষিণে সবুজ প্রান্তরের প্রান্তে গুরুপল্লী। সার-সার করোগেট-চালার অনাড়ম্বর গৃহ। এর একটিতে থাকেন শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২৭৪ বঙ্গাব্দের ১০ই আষাঢ় [খ্রী ১৮৬৭, ২৩ জুন] রবিবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। "বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত যশাইকাটি গ্রামে আমার পৈত্রিক নিবাস, রামনারায়ণপুর গ্রামে আমার মাতুলালয়— এই মাতুলালয়েই আমার জন্ম।"

১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ২১এ আশ্বিন, ১৯৫২ সালের ৭ই অক্টোবর। বেলা বারোটা বাজে। বোলপুর স্টেশন থেকে সাইকেল-রিক্‌শা চেপে সোজা চলে এসেছি। তাঁর বাসা চিনি নে, রিক্‌শাচালক-বালকটিও চেনে না। তাই কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরতে হল। প্রাক্‌কুটীরের কাছে বিশ-বাইশ বছরের তিনটি ছেলে ঘুরছিল, সম্ভবত তারা ওখানকার ছাত্র। তাদের জিজ্ঞাসা করলাম। হরিচরণবাবুকে তারা চেনে না। একজন বলল, 'কী রকম দেখতে? মোটা, কালো?' আর একজন বলল, 'তিনি কি ডাক্তার?'

রিক্‌শা ঘুরিয়ে চীনা-ভবনের রাস্তা ধরে চললাম। হরিচরণবাবুর নাম বাইরে হয়তো তেমন প্রচার নেই, কিন্তু স্থানীয় ছাত্রমহলেও তিনি অপরিচিত —ভাবতে ভালো লাগল না।

একটানা পঞ্চাশ বছর তিনি আছেন শান্তিনিকেতনে। "ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩০৮ সনের ৭ই পৌষ : এর মাস-আষ্টেক পর, অর্থাৎ ১৩০৯ সনের শ্রাবণের শেষে আমি আশ্রমে সংস্কৃতের অধ্যাপনায় যোগদান করি।"

অনাড়ম্বর জীবন। চৌকির উপরে বসে তিনি তাঁর জীবনের সংবাদ বলছিলেন। দীর্ঘ ঋজু দেহ। দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে, সারাটা জীবন চোখের কাজ করে আজ অসাড় হয়ে এসেছে চোখ। লেখা-পড়া এখন আর করতে পারেন না, অস্পষ্ট দেখতে পান, লোক চিনতে পারেন— এই মাত্র। বললেন, "আমার জীবনে অসাধারণ কিছুই নাই। আমার জীবনস্মৃতির তাই কিঞ্চিন্মাত্র মূল্য আছে, তা আমি কখনো মনে করতে পারি নি।"

জীবনে অসাধারণ কিছু হয়তো নেই, কিন্তু জীবনে অসাধারণ কাজ তিনি করেছেন, এই জন্যেই জীবন তাঁর অসাধারণতা অর্জন করেছে। একটা জীবনে কতটা ধৈর্যের নিষ্ঠার ও পরিশ্রমের সমবায় ঘটতে পারে, তাঁর জীবনে তার প্রমাণ স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। সেটি হচ্ছে বঙ্গীয় শব্দকোষ। একাকী তিনি রচনা করেছেন এই বিরাট শব্দকোষ, বাংলা দেশের উত্তর পূর্ব পশ্চিম দক্ষিণ সব জায়গার গ্রাম্য কথাও তিনি সংগ্রহ করেছেন, তার বুৎপত্তিগত অর্থ তিনি দিয়েছেন, কোন্ কালের কোন্ কবি সেই কথাটি কিভাবে ব্যবহার করেছেন, মধুমক্ষিকার মত তিনি আহরণ করে এনে জমা করেছেন সেইসব ছত্র তাঁর এই শব্দকোষের মৌচাকে।

বললেন, "একচল্লিশ বছর লেগেছে শব্দকোষ সংকলন প্রণয়ন ও মুদ্রাঙ্কণ শেষ করতে; ১৩১২ সনে আরম্ভ করি, শেষ হয় ১৩৫২ সনে। শব্দ-সংকলনের সময় অধ্যাপনার ভার আমার উপর ছিল। ১৩৩৯ সনে (১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে) আমি অবসর গ্রহণ করি। অধ্যাপনার সময় ক্লাসে প্রাচীন বাংলা বই নিয়ে বসতাম ও বিশ্রামের সময়ে ক্লাসে বসেই পেন্সিল দিয়ে অভিধানের যোগ্য শব্দ চিহ্নিত ক'রে, পরে কার্যাবসানে তা খাতায় লিখতাম। এইরূপে প্রাচীন বাংলা শব্দ সংগ্রহ করে ১৩৩৮ সন পর্যন্ত অভিধানের কাজে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলাম।"

১৩০৯ সনের শ্রাবণ-শেষে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাস-আষ্টেক

পরে, তিনি যখন সংস্কৃত অধ্যাপকরূপে যোগ দেন, তখন আশ্রমের বালকদের কোনো মুদ্রিত সংস্কৃত পাঠ্যগ্রন্থ ছিল না। গৃহের বালক-বালিকাদের সংস্কৃত শিক্ষার জন্য রবীন্দ্রনাথ একটি সংস্কৃত পাঠ লিখতে আরম্ভ করেন, এতে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে ব্যাকরণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বললেন, "এইরূপ প্রণালীতে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি দিয়ে কবি তদনুসারে একটা সংস্কৃত পাঠ্য লিখতে আমাকে বলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে সংস্কৃত-প্রবেশ রচনা করে তিন খণ্ডে সমাপ্ত করি। এই পাঠ্যপুস্তক রচনার সময়ই একদিন কবি কথাপ্রসঙ্গে বাংলায় একখানি ভালো অভিধান প্রণয়নের কথা বলেন। তাঁর সেই ইচ্ছা অনুসারেই অভিধান-রচনায় নিরত হই। শব্দকোষ প্রণয়নের মূল কারণ এই। তখন ১৩১২ সন।"

একটু থেমে আক্ষেপের সুরে বললেন, "কিন্তু কবি এই গ্রন্থটি শেষ দেখে যেতে পারলেন না। তাঁর মহাপ্রয়াণেরও বছর-চার পরে গ্রন্থটি প্রণয়ন ও মুদ্রাঙ্কণ শেষ হয়।"

সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরে তাঁর জন্ম। সংসারে অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল। পিতা নিবারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারীতে কাজ করতেন। রামনারায়ণপুর গ্রামে তিনি মাতুলালয়েই ছিলেন চার বৎসর পর্যন্ত। এই সময় তিনি তাঁর মাতার সঙ্গে যশাইকাটির বাড়িতে আসেন। বাটীর নিকটে একটি ছোট বাংলা বিদ্যালয় ছিল, এখানেই তাঁর বিদ্যারম্ভ। আট-নয় বৎসর বয়সে পুনরায় মাতুলালয়ে যান। মামাতো ভাইদের সঙ্গে বসিরহাট মাইনর স্কুলে পড়তে আরম্ভ করেন। মাইনর স্কুল হাইস্কুলে পরিণত হয়। এখানে তিনি পড়েন পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত। তার পর তাঁর শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। ইংরেজী শিক্ষা ত্যাগ করে মধ্যবাংলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থে একটি বাংলা স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই সময় পরীক্ষার ফল আশানুরূপ না হওয়ায় প্রধান শিক্ষক মহাশয় তিরস্কার করেন। তিরস্কারের ভাষা কঠোর ও অসহনীয় হয়, তাঁর পিতা এই কারণে তাঁকে তাঁর মাতুলালয়ের নিকটবর্তী একটি বাংলা স্কুলে ভর্তি করে দেন। এই স্কুল থেকে তিনি উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষায় পাস করে এক বছরের জন্যে কিছু বৃত্তি পান। এতে তাঁর পড়ার ব্যয় নির্বাহ হয়। পরের বছর মধ্যবাংলা

পরীক্ষায় পাস করেন। তারপর ফিরে আসেন বশাইকাটির পিতৃগৃহে। এখানে এসে বাদুড়িয়া লণ্ডন মিশনারী স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন। এই সময়ে শ্রীশচন্দ্র দত্ত নামে একজন সহপাঠীর সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এখানে প্রায় দুই বৎসর পড়ার পর বিদ্যালয়-গৃহটি আগুনে বিনষ্ট হলে আড়বেলিয়া ও খাস্তকুড়িয়ায় দুইটি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে আড়বেলিয়ায় ও পরে খাস্তকুড়িয়ার ইস্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত তিনি পড়েন। এই সময়ে গ্রীষ্মাবকাশে কলকাতার পথে গাড়িতে বাদুড়িয়ার শশিভূষণ দাস নামে একটি যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তাঁর বন্ধু শ্রীশের সঙ্গে শশীর পূর্বেই পরিচয় ছিল। শ্রীশের মুখে শশীও তাঁর পরিচয় পেয়েছিল। এই সূত্রে শশীর সঙ্গে তাঁর বেশ পরিচয় হল। শশী কলকাতার জেনারেল অ্যাসেম্বলীর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ত। সে বলল, 'তুমি এই স্কুলে আমার সঙ্গে পড়।' অর্থাভাবের কথা জানালে সে বলল, 'সাহেবরা বড় দয়ালু ও সহৃদয়, বেতনের ব্যবস্থা পরে হবে।' এ কথা শুনে তিনি আর আপত্তি করলেন না, শশীর সঙ্গে ক্লাসে যোগ দিলেন। কালীনাথ মিত্র নামে এই স্কুলে একজন শিক্ষক ছিলেন। স্কুলের কাজে তাঁর বিশেষ প্রভাব ছিল, তিনি শশীকে ভালবাসতেন। তাঁকে শশী এ বিষয়ে জানালে তিনি বললেন, 'আগামী পরীক্ষার ফল দেখে ব্যবস্থা করবো।' দ্বিতীয় শ্রেণীতে অখন ছাত্রসংখ্যা ৮০। এত ছাত্রের মধ্যে তাঁর পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হবে বলে তিনি মনে করতেই পারেন নি; কিন্তু একেবারে নিরাশও হন নি। পরীক্ষার সময় এল, পরীক্ষাও দিলেন, কিন্তু ফল জানার জন্য তাঁর কিছুমাত্র ঔৎসুক্য ছিল না; কারণ, কি জানি শশী কি অপ্রীতিকর কথাই না শোনাবে। এইভাবে কিছুকাল কাটলে, পরীক্ষার ফল অনুসারে প্রমোশনও হল, তিনি শশীর সঙ্গে এক ক্লাসে গিয়ে বসলেন। শিক্ষক রেজিস্টার খুলে রোল-কল আরম্ভ করলেন, তখন দেখলেন রেজিস্টারে তাঁর নাম লেখা হয়েছে। শশীকে প্রমোশনের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে তাঁকে বলল, 'তুমি জানোনা? পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের তালিকায় তুমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছ। বিনা-বেতনে পড়ার আদেশ কর্তৃপক্ষ তোমাকে দিয়েছেন।' এইরূপে তাঁর বেতনের সমস্যা নিরাকৃত হল।

পরের বছর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে কলেজে পড়তে আরম্ভ করেন ; কিন্তু এখানেও পুনরায় বেতনের প্রশ্নে তিনি চিন্তিত হলেন। এই সময় এক বন্ধু তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, পটলডাঙার মল্লিকপরিবারের ফণ্ড থেকে মেট্রোপলিটন কলেজে (বিদ্যাসাগর কলেজে) কয়েকটি ছাত্রকে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, সেখানে যেন তিনি দরখাস্ত করেন। তিনি যখন তাঁর দেশের স্কুলে পড়তেন, তখন রবীন্দ্রনাথ এক বছর তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন, এই কথা তাঁকে জানালে তিনি বাংলায় একটি সার্টিফিকেট লিখে দেন। মল্লিক ফণ্ডের সভাপতি ছিলেন ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকার সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করে সার্টিফিকেট-সহ দরখাস্ত হাতে দিতেই তিনি রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট দেখে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন ও ফণ্ডের সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে দরখাস্ত দিলে তিনি মেট্রোপলিটন কলেজের প্রিন্সিপালের নামে চিঠি দিলেন। কলেজে এসে অধ্যক্ষের হাতে চিঠি দিলে তিনি কলেজের প্রথম শ্রেণীর রেজিস্টারে তাঁর নাম লেখার আদেশ দিলেন। এতে তিনি মেট্রোপলিটনে ভর্তির অনুমতি পেলেন। ফণ্ড থেকে নিয়মিত বেতন পেয়ে তিনি এফ. এ. পাস করে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন। কলেজের মাইনে লাগত না, কিন্তু বই কেনা ইত্যাদি সমস্যা রয়েই গেল। দুই-একজন ছাত্র পড়িয়ে কিছু অর্থাগম হত, তা দিয়ে পাঠ্য বই কিনতেন। তৃতীয় বার্ষিক বি. এ. ক্লাসে পড়বার সময় গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি দেশে যান। ছুটির পরে দেশ থেকে ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় ফণ্ড থেকে তাঁর বেতন দেওয়া বন্ধ হয়ে গেল, অনুপস্থিতির কারণও তিনি জানালেন কিন্তু গ্রাহ্য হল না।

বললেন, "তখন নৈরাশ্যে আমার মনের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল তা অনুমেয়ই, কথায় ব্যক্ত করা কঠিন। আমার কলেজে পড়া বন্ধ হয়ে গেল।"

অনেক বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে যে স্রোত বয়ে চলেছিল, হঠাৎ সেই স্রোত চোরাবালির নীচে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। ছাত্রজীবন শেষ হয়ে গেল শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

কর্মহীন অলস জীবন শুরু হল তাঁর। কিন্তু নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকা তাঁর প্রকৃতি নয়। বললেন, "এই সময় অধ্যাত্ম রামায়ণের বঙ্গভাষায় পদ্যে অনুবাদ আরম্ভ করলাম। প্রায় দুই বছরে অনুবাদ শেষ করি। পাণ্ডুলিপি-অবস্থায় এখনো তা আমার কাছে আছে।"

এই সময় তিনি বাড়ি যান ও দেশের দুটি হাই স্কুলে প্রায় তিন বছর শিক্ষকের কাজ করেন। ১৩০৬ সনে একবার কলকাতায় আসেন। কিছুদিন পরে মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের রাজবাটীতে কুমার দেবেন্দ্রলাল খানের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৩০৮ সনে পূজার ছুটিতে বাড়িতে আসেন। "অতি দূর দেশে স্বল্প বেতনে চাকরী করা আমার পিতার অভিমত হল না। তিনি যেতে নিষেধ করলেন। আমি রাজাকে পদত্যাগ জানালাম।"

এই সময় কলকাতায় টাউন স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি এই স্কুলে প্রথম প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। এই বছর চৈত্র মাসে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। সংসারের ভার পড়ে তাঁর উপর। কনিষ্ঠ ভ্রাতা তারাচরণের উপর সংসারের পরিচালনার ভার দিয়ে তিনি কলকাতায় আসেন ও টাউন স্কুলের কাজ পরিত্যাগ করেন।

তাঁর পিসতুতো দাদা যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সদরে খাজাঞ্চি ছিলেন। তিনি রোজ বিকেলে তাঁর দাদার আপিসে যেতেন। বললেন, "শান্তিনিকেতনে তখন কবির ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমার দাদার কাছে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকদের অধ্যাপনার বিষয় ও আশ্রমে সুখে বসবাসের কথা শুনতাম। আমার বিদ্যা স্বল্পই, এই আশ্রমে অধ্যাপনার কথা আমি চিন্তা করতেই পারি নি।"

তাঁর দাদা রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর বিষয় বলেন। এক সময় রবীন্দ্রনাথ যে তাঁকে বৃত্তি দিয়েছিলেন, তাও উল্লেখ করেন। এবং একটি কাজ দেবার কথা বলেন। "এই প্রার্থনানুসারে কবি রাজসাহীর অন্তর্গত কালীগ্রামের জমিদারী কাছারি পতিশরে আমাকে সুপারিনটেনডেন্টের পদে নিযুক্ত করেন।"

১৩০৯ সনের শ্রাবণের প্রথমে তিনি পতিশরে গিয়ে কাজে যোগ দেন। এই সময় কবির উপরে জমিদারি পর্যবেক্ষণের ভার ছিল। একদিন তাঁরা

শুনলেন কবি সেই দিনই শিলাইদহ থেকে বোটে পতিশরে আসবেন। "এই সময় পতিশরের চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত বিপুল ধানক্ষেত জলে প্লাবিত, ধানের শীর্ষগুলি মাত্র দেখা যাচ্ছে। তারই অনতিদূরে কবির বোটের মাস্তুল দেখা গেল। কাছারির ম্যানেজার কর্মচারী প্রভৃতি কবির সঙ্গে দেখা করার জন্যে সজ্জিত হলেন, বোট কাছারির ঘাটে লাগলে সকলে কবির সঙ্গে দেখা করার জন্যে চললেন, সঙ্গেসঙ্গে আমিও গেলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাসায় ফিরে এলাম।

তিনি বাসায় এসে পৌঁছেছেন, তার কিছুক্ষণ বাদেই কবির কাছ থেকে লোক এসে খবর দিল কবি তাঁকে ডাকছেন। বললেন, "আমি এই আহ্বানের সংবাদে বিস্মিত হলাম। ভাবলাম, আমি নতুন লোক, আমাকে তিনি ডাকলেন কেন।"

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি গিয়ে বোটে দেখা করলেন। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এখানে দিনে কি কাজ কর?

"বললাম, দিনে জমিদারী জরিপের চিঠা নিয়ে আমিনের সঙ্গে কাজ করি। কবি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, রাত্রে কি কর? তার উত্তরে বললাম—সন্ধ্যার পরে সংস্কৃতের আলোচনা করি, আর ইংরেজি থেকে সংস্কৃত অনুবাদের পাণ্ডুলিপির প্রেস-কপি প্রস্তুত করি। অনুবাদ-পুস্তকের কথা শুনে কবি পাণ্ডুলিপি দেখতে চাইলেন। আমি তাঁকে দেখালাম। তিনি দেখলেন, কোনো মন্তব্য করলেন না।"

এর পরই তাঁর ডাক এল শান্তিনিকেতন থেকে। রবীন্দ্রনাথ পতিশরের ম্যানেজার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারকে জানালেন, 'শৈলেশ, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীকে এখানে পাঠিয়ে দাও।'

এ-সংবাদে তিনি আনন্দিত হলেন। কেননা, অধ্যাপনাই তাঁর প্রকৃতির অনুরূপ কাজ। সাংসারিক দায়িত্বভার তাঁর উপর পড়ায় বাধ্য হয়ে তাঁকে পতিশরের কাজ গ্রহণ করতে হয়েছিল।

বললেন, "আমি তখনই প্রস্তুত হলাম। নৌকায় করে আত্রাই স্টেশনে এসে সেই দিন রাত্রে কলকাতায় পৌঁছলাম। পরদিন সকালে সাড়ে সাতটায়

ট্রেনে শান্তিনিকেতনে কবির নিকট উপস্থিত হলাম। ১৩০৯ সনের শ্রাবণের তখন শেষাশেষি সময়।"

আজ ১৩৫৯ সনের আশ্বিনের শেষাশেষি। পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গিয়েছে। বাইরে শান্তিনিকেতনের রাঙামাটির পথ ও আকাশ-ছোঁয়া প্রান্তরের দিকে চেয়ে পঞ্চাশ বছর আগের এই মাঠ আর এই পথের কথা ভাবছিলাম। আকাশে মেঘ করে এসেছে, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। করগেটের চালের উপর বৃষ্টির নূপুর বাজছে। আর, মনে হচ্ছে সেই তালে তালে বাইরের গাছের ডালপালা যেন ঈষৎ আন্দোলিত হচ্ছে। আজ যাঁর বয়স ৮৫, তখন তিনি ছিলেন ৩৫। আজ যিনি বার্ধক্যে শ্লথ, সেদিন তিনি ছিলেন যৌবনের উদ্দীপনায় প্রাণবন্ত। তাঁর যে-চোখের সামনে পঞ্চাশ বছরের শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে, আজ সেই চোখ নির্জীব ও নিষ্প্রভ। একটি সুবৃহৎ অভিধান-প্রণয়নে তিনি কেবল তাঁর জীবনই উৎসর্গ করেন নি, তাঁর চোখ-দুটিও যেন উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

তাঁর গৃহের এক পাশে থাকেন পণ্ডিত সুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, আর-এক পাশে শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। মনোমত প্রতিবেশী নিয়ে রচিত হয়েছে এই গুরুপল্লী। সকলের সঙ্গে সকলের মনের একটা যোগ আছে। এঁদের দুজনের সঙ্গেও দেখা হল। হরিচরণবাবুর জীবনকথা লেখা হচ্ছে জেনে এঁরা উল্লসিত হলেন, আনন্দিত হলেন, এবং উৎসাহ দিলেন।

এঁদের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় মেঘ ছিঁড়ে একটু রোদ দেখা দিতেই বারান্দায় একটা মোড়া এনে বসতে বললাম হরিচরণবাবুকে। তাঁর কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। বললাম, "আমি কাঁচা ক্যামেরাম্যান। ছবি উঠল কি না জানি নে।"

তিনি হাসলেন, বললেন, "পুরনো ছবি আছে, যদি তাতে কাজ হয়, দিতে পারি।"

কিন্তু ছবি আমার আসল কাজ নয়, আসল কাজ কথা। তাই ঘরের ভিতর গিয়ে আরম্ভ হল সেই কথাই।

বললেন, "অভিধানের পাণ্ডুলিপি কিছুটা অগ্রসর হলে ১৩১৮ সনের আষাঢ় মাসে আমাকে কোনো কারণে কলকাতায় থাকতে হয়। এই সময়ে সেন্‌ট্রাল কলেজে কিছুদিন সংস্কৃত অধ্যাপকের কার্য করি। তখন অভিধানের কাজ কিছুদিন একেবারেই বন্ধ থাকে। অভীষ্ট বিষয়ের ব্যাঘাত জন্য বেদনা সুতীব্র ও মর্মস্পর্শী হলেও আমার এই দুঃখ নিবেদনের স্থান আর কোথাও ছিল না, কেবল অবসর মত মধ্যে মধ্যে জোড়াসাঁকোর বাটীতে কবিবরের নিকটে গিয়ে মনের বেদনার গুরুভার কিঞ্চিত লাঘব করে আসতাম। সহৃদয় মহাত্মার কাছে কোনো সদ্বিষয়ের নিবেদন কখনোই ব্যর্থ হয় না, আমার দুঃখের নিবেদন সার্থক হল। কবিবর বিদ্যোৎসাহী দানশীল মহারাজ শ্রীযুত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সহিত দেখা করে অভিধানের বিষয় জানালেন ও বৃত্তির কথা উত্থাপন করলেন। তদনুসারে মহারাজও মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি দিবেন স্বীকার করেন। এইরূপে আমার অর্থ-সমস্যার কিঞ্চিৎ সমাধান হল, কবিবর দেখা করার নিমিত্ত আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি দেখা করতে গিয়ে তাঁর মুখে বৃত্তির সংবাদ শুনলাম। আমি সর্বপ্রকারেই নগণ্য, আমারই নিমিত্ত কবিবরের যাচকবৃত্তি, এ কথা চিন্তা করতে করতে আমি তাঁর চরিত্রের মহত্ত্বে ও কর্তব্যকর্মে ঐকান্তিক নিষ্ঠায় অভিভূত হয়ে পড়লাম—আমার আকার-প্রকার ও মৌনভাব আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আমার হৃদয়গত ভাব বুঝে কবিবর ধীর কণ্ঠে বললেন— স্থির হও, আমি কর্তব্যই করেছি। —এই বৃত্তি তের বৎসর ধরে পাই।"

অভিধানের পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ হয় ১৩৩০ সনে। তারপর প্রায় ছয় বছর যায় কিয়দংশ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে। বিশ্বভারতী থেকেই অভিধানটি প্রকাশ করার ইচ্ছা রবীন্দ্রনাথের ছিল, কিন্তু এত বড় বই মুদ্রণের ভার গ্রহণ করা তখন বিশ্বভারতীর সামর্থ ছিল না। এই কারণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশের চেষ্টা হয়। কথাও প্রায় পাকাপাকি হয়ে এসেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয় সাহসী হলেন না। এর পর তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশের চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁদেরও আর্থিক অবস্থা ভালো নয়।

বললেন, "প্রকাশের বিষয় এই ভাবে বিফল হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে এলাম।"

এর পর প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে ১৩৩৯ সনের আষাঢ়ে অভিধান মুদ্রণ আরম্ভ হয়, প্রায় অর্ধেক মুদ্রিত হওয়ার পর অকস্মাৎ বসু মহাশয়ের মৃত্যু ঘটে, মুদ্রাঙ্কণও বন্ধ হয়ে যায়।

"বিশ্বকোষের প্রধান কম্পোজিটর মন্মথনাথ মতিলাল এই বিপদে আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছিলেন। মন্মথবাবু অপর একটি প্রেসের সঙ্গে কথা বলে নিজেই একা কম্পোজ করে অভিধান মুদ্রণ শেষ করেন। এইভাবে ১৩৫২ সনে ভগবৎ-অনুগ্রহে ১০৫ খণ্ডে অভিধান-মুদ্রণ সমাপ্ত হয়।"

মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যখন তাঁকে বৃত্তি দেন, তখন রবীন্দ্রনাথের একটি কথার উল্লেখ ক'রে তিনি বললেন, "আমার জীবন সম্বন্ধে কবির ভবিষ্যৎবাণীর কথা আজ মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন— মহারাজের বৃত্তিদান ভগবানের অভিপ্রেত, অভিধানের সমাপ্তির পূর্বে তোমার জীবননাশের শঙ্কা নাই।—তাই হয়তো এখনো আমি জীবিত আছি। তাঁর কথা সত্য হল বটে, কিন্তু বিশেষ দুঃখের বিষয় যে, অভিধানের উদ্ভাবক কবি আজ স্বর্গগত, তাঁর হাতে এর শেষ খণ্ড অর্পণ করতে পারি নি। সাংবাদিক-শিরোমণি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিধানের বিষয় আমার বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। তিনি যখনই আশ্রমে এসেছেন আমার কাছে গিয়ে অভিধানের কার্য নির্বিঘ্নে অগ্রসর হওয়ার বিষয় জিজ্ঞাসা করেছেন। কোষের সর্বাঙ্গসৌষ্ঠব বিষয়েও সৎপরামর্শ দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেছিলেন, অভিধানের সমাপ্তিতে এবিষয়ে কিছু লিখব। প্রবাসী-সম্পাদক এখন পরলোকে প্রবাসী। কোষ-সমাপ্তিও তাঁকে দেখাতে পারলাম না, তাঁর লেখাও হল না। মণীন্দ্রচন্দ্র তো মুদ্রাঙ্কণের পূর্বেই অস্তমিত। অভিধানের বিষয়ে এই তিনটি আমার বিষম বিষাদের বিষয় হয়ে রইল।"

অভিধান-রচনার ন্যায় দুরূহ কাজ তিনি করেছেন। তাঁর জীবনের ৪১টি বছর তিনি ব্যয় করেছেন এই কাজে। অনেকে এ-কাজকে নীরস কাজ বলেন। নীরস যদি এ-কাজ হয়েও থাকে, তবু তার মধ্যে থেকেও তাঁর সরস

চিত্তের পরিচয় দেখা দিয়েছে মাঝে মাঝে।—ম্যাথু আর্নল্ডের 'শোরাব রুস্তম' তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে অনুবাদ করেছেন, ১৩১৬ সনে অর্চনা পত্রিকায় তা মুদ্রিত হয়েছে; আর-একটি হচ্ছে অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত খণ্ডকাব্য 'বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র', ১৩১৭-১৮ সনে ব্রাহ্মণ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; এ ছাড়া আছে প্রথমজীবনে রচিত অধ্যাত্ম রামায়ণের পদ্যানুবাদ; 'কবিকথা-মঞ্জুষিকা' নাম দিয়ে রবীন্দ্রনাথের উপর লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ—দেশ, যুগান্তর ও মাতৃভূমিতে প্রকাশিত; রামরাজত্বের বিশদ ব্যাখ্যামূলক প্রবন্ধ 'রাজ্য ও রামরাজত্ব'—গান্ধীজির মৃত্যুদিবস উপলক্ষ্যে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত; 'সত্যনারায়ণ লীলা'—বিশ্বভারতীর বাংলা গবেষণা বিভাগের উপাধ্যায় শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল প্রকাশিত প্রথম খণ্ড পুঁথিপরিচয়ে এর পরিচয় আছে; 'রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম'—আশ্রমের প্রথম দিকের কথা; এ ছাড়া প্রকীর্ণ প্রবন্ধ—অবতার-বাদ, জন্মান্তরবাদ, দ্যূতক্রীড়া প্রভৃতি। এগুলি তিনি গ্রন্থাকারে প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বললেন, "কোনো উৎসাহী প্রকাশক যদি এগুলি ছাপার ভার গ্রহণ করেন তাহলে জীবনের শেষ কটা দিন পরম পরিতোষ লাভ করি।"

১৩০৯ থেকে ১৩৩৯ সন পর্যন্ত পণ্ডিত হরিচরণ বিশ্বভারতী-শিক্ষাভবনের প্রধান সংস্কৃত অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের ছাত্রগণ ১৩৫১ সনের নববর্ষের প্রথম দিনে এঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন, পর বৎসর ১৩৫২ সনের ফাল্গুন মাসে বিচারপতি ব্রজকান্ত গুহ মহাশয়ের গৃহে দ্বিতীয় সম্বর্ধনা সভার অধিবেশন হয়। তারপর ১৩৫৩ সনে কবির জন্মোৎসব-দিবসে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ এঁর কঠোর পরিশ্রমের মূল্যস্বরূপ এক হাজার টাকার তোড়া দিয়ে আম্রকুঞ্জে এঁর সম্বর্ধনা করেন।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য রূপে শ্রীজওহরলাল নেহরু এঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট.) উপাধি দান করে সম্মানিত করেন।

বললেন, "আমার একটা শেষ কথা আছে। একদিন সকালে উত্তরায়ণে কবির সঙ্গে দেখা করতে যাই। অভিধানের কথা জিজ্ঞাসা করে কবি বলেন যে, আমাদের বঙ্গীয় প্রাদেশিক শব্দকোষ নাই, এটাও করা দরকার। আমি তাঁকে বলি যে, অভিধান শেষ করে যদি শক্তি থাকে তা হলে আপনার ইচ্ছা পূরণ করব। আজ অভিধান শেষ হয়েছে, দেহ এখন জরাজীর্ণ, গ্রন্থি শিথিল, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। যদি এই কাজ আরম্ভ করে যেতে পারতাম তা হলে তাঁর ইচ্ছা আংশিক পূরণ হত, আমিও শান্তিলাভ করতে পারতাম। কিন্তু এখন তার সম্ভাবনা দেখি না।"

বাইরে সাইকেল-রিক্‌শার হর্ন বেজে উঠল। ট্রেনের সময় বুঝি হয়ে এসেছে। তারই তাগিদের সংকেত ওটা। বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম। বয়সে আর বিনয়ে নম্র হয়ে দাঁড়ালেন শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। পদধূলি নিয়ে রওনা হলাম।

ঘাসের জমিটুকু পার হয়ে রাস্তায় উঠে পড়ল রিক্‌শা। পিছনে গুরুপল্লী রেখে রাস্তার রাঙা ধুলো উড়িয়ে ছুটে চলল ত্রিচক্রযান। চারদিকে নিঃসঙ্গ গাছপালা, মাঝখানে নির্জন রাস্তা। সোজা চলে গিয়েছে সদর সড়ক পর্যন্ত। শান্তিনিকেতনের মাঠে মেঘ চুইয়ে ধীরে ধীরে বিকেল নামছে।

রচিত গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয় শব্দকোষ। ৫ খণ্ড

রবীন্দ্রনাথের কথা

সংস্কৃত-প্রবেশ। ৩ ভাগ

ব্যাকরণ-কৌমুদী। ৪ ভাগ

Hints on Sanskrit Composition & Translation

পালিপ্রবেশ। শব্দানুশাসন

কবির কথা

শ্রীযদুনাথ সরকার

কয়েক বছর আগের এক দ্বিপ্রহরের কথা মনে পড়ে আজ। বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে ইলেকট্রিক ট্রেন-যোগে চলেছি পুনায়। মসৃণ দ্রুততায় ছুটে চলেছে পরিচ্ছন্ন ট্রেন। বাঁ-পাশে পশ্চিমঘাটের পর্বতমালা। এই পবতমালার একটি প্রান্তে সংকীর্ণ পথ আছে। ভারতে প্রবেশের একটি খিড়কির দরজা হিসাবে নাকি ব্যবহৃত হত এই পথ, যার থেকে এর নাম হয়েছে খড়কি, ইংরাজীতে যাকে লেখা হয় কার্কি Kirkee। বিদেশীর হাতের ছোঁয়ায় এমনই বিকৃতি ঘটেছে জায়গাটির নামের। কেবল সামান্য এই জায়গাটির কেন, বিদেশীর স্পর্শে ভারতের অনেক-কিছুরই বিকৃতি ঘটেছে, বিশেষ ক'রে সম্ভবত ভারতের ইতিহাসের। বড়-বড় টানেল পার হয়ে চলেছে ট্রেন। এতে রোমাঞ্চ হতে লাগল। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেও পুলকিত হচ্ছিলাম। কিন্তু প্রকৃত পুলকবোধ করছিলাম এই কথা ভেবে যে, আমি চলেছি শিবাজীর জন্মস্থানের দিকে; যে শিবাজীকে বিদেশী ইতিবৃত্তকার 'দস্যু বলি উপহাস' করেছেন, কিন্তু যিনি, আচার্য যদুনাথ সরকারের ন্যায় ঐতিহাসিকের ভাষায়, মধ্যযুগের ভারতবর্ষের the greatest constructive genius among the Hindus। মিথ্যার আবরণ দিয়ে যাকে আবৃত করে রাখা হয়েছিল সেই আবরণ আজ উন্মোচিত হয়েছে, আজ প্রকৃত শিবাজীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এতদিনকার মিথ্যা ডিঙিয়েও আজ যে প্রকৃত মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছে তার কারণ রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে।

এই বিস্মৃতির তল থেকে যদুনাথ উদ্ধার করে এনেছেন শিবাজীকে। তিনি বলেছেন—

There cannot be a higher destiny for a man than to be the maker of a nation and that was exactly the achievement of Shivaji.

যদুনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবন এই সত্যের অনুসন্ধানে কাটিয়েছেন, তাই আজ তিনি তাঁর নিঃস্বার্থ নীরব সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে পেরেছেন।

১৯৫২ সালের ২৬এ অক্টোবরের বিকাল। তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলাম। আগামী ডিসেম্বরে যাঁর বয়স ৮২ বৎসর পূর্ণ হবে, এখনো তাঁর যৌবনোচিত উদ্যম ও তৎপরতা দেখে চমকে গেলাম। কেবল উদ্যম নয়, তাঁর চলা-বলা দেখে মনে হল এখনো উৎসাহ আর কাজের প্রেরণা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তাঁর মধ্যে। বললেন, "কি কি কথা জানার আছে?"

বললাম। তিনি চটপট করে লিখে নিলেন এক টুকরো কাগজে। এতটুকু হাত কাঁপল না, ঝরঝরে অক্ষরে লিখলেন তিনি।

বললেন, "যাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুবলক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা— স্বর্গীয় রাজকুমার সরকার।"

১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর (১২৭৭ বঙ্গাব্দের ২৬এ অগ্রহায়ণ) রাজসাহী জেলার নাটোর সাবডিভিশনের আত্রেয়ী রেলস্টেশন থেকে দশ মাইল পুবে করচমাড়িয়া গ্রামে আচার্য যদুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। এর তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পতিশর গ্রাম— রবীন্দ্রনাথের কাছারি। "সেখানে একবার গ্রীষ্মের ছুটিতে রবীন্দ্রনাথ এলে আমি গিয়ে দেখা করি। স্থানীয় এম. ই. স্কুলকে হাই ইংলিশ স্কুল করার জন্যে লোকে তাঁকে অনুরোধ করলে আমি তাঁর আমন্ত্রণে স্কুলটা পরিদর্শন করি।"

যদুনাথের ইতিহাস-সাধনাকে ঐতিহাসিক সাধনা আখ্যা দেওয়া যায়। কেননা তিনি কোনো সহজ সাফল্য লাভের আকাঙ্ক্ষা মনে পোষণ না ক'রে সারা জীবন সত্যের সন্ধান করেছেন। বললেন, "এ পথে যে পথিক হবে, তার শুধু মনের বল নয়, অসীম ধৈর্যও চাই। তাকে অল্পে সন্তুষ্ট হলে চলবে না, সহজে কাজ সারব— এই ফন্দী করলে তার চেষ্টা শেষে পণ্ড হবে। যে-কাজ খাঁটি, যার ফল স্থায়ী হবে, তাকে সম্পূর্ণ করতে বেশি সময় লাগে; তার জন্য অনেক দিন ধরে অনেক রকম উপকরণ জোগাড় করতে হয়।"

এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁর জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা বললেন। কোনো একজন দিল্লীর বাদশা অথবা মারাঠা রাজার ইতিহাস লিখতে গিয়ে

তাঁকে কিভাবে উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। একটানা দশ বছর নীরবে তিনি এই তথ্য সংগ্রহের কাজে লিপ্ত থাকেন। চল্লিশ বার যেতে হয় মারাঠা দেশে, তা ছাড়া আগ্রা দিল্লী মালয় রাজপুতনা প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রদেশে যেতে হয়েছে বারো-তেরো বার। এইভাবে ভ্রমণ ক'রে যে উপকরণাদি সংগৃহীত হয়েছিল, সেগুলি রীতিমত বুঝবার জন্য ফার্সী মারাঠী ও পর্তুগীজ ইত্যাদি ভাষা শিখতে হয়েছে। একটানা দশ বছর তাঁর এই নীরবতা দেখে তখন অনেকে বিস্মিত হয়েছে। কিন্তু তখন চলেছে প্রকৃত একটা উদ্যোগপর্ব। এর পর সংগৃহীত উপকরণগুলি সাজানো, সংশোধন করা, আলোচনা করে মনের মধ্যে হজম করে দশ বছর পরে পুস্তকরচনা আরম্ভ হল। বললেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের চরিত্রের চিহ্ন হচ্ছে ধৈর্য, সুদূর পরিকল্পনা, এবং সস্তা মেকি জিনিসের প্রতি বিমুখতা।"

তাঁর পিতার প্রতি তাঁর কেবল শ্রদ্ধা এবং ভক্তিই নয়, পিতার প্রতি তাঁর আছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পিতাকেই তিনি আদর্শরূপে গ্রহণ করেছেন তাঁর জীবনে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পর তাঁর পিতা প্রথম বৎসরে এনট্রান্স পরীক্ষা পাস করেন; রাজসাহীতে তখন কলেজ না থাকায় তিনি বহরমপুরের কলেজে ভর্তি হন ও বৃত্তি ভোগ করেন। কিন্তু এক বছর পরে যদুনাথের পিতামহ অল্পবয়সে মারা যাওয়াতে চারদিকের জমিদারেরা তাঁদের জমিদারীর অংশ বেদখল করতে উদ্যত হওয়ায় এবং মিথ্যা মোকদ্দমা রুজু করায় তাঁর পিতাকে বাধ্য হয়ে জমিদারী রক্ষার জন্য ১৮৫৮-৯ সালে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়। অসময়ে কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন বটে, কিন্তু তিনি ঘরে পড়ে জ্ঞানবৃদ্ধি করেন। বললেন, "ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালকচিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে প্লুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ খুলে গেল। আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হল— কি করলে কোন্ জাতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্যসত্যই সার্থক করা যায়। স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করা যে আমাদের নৈতিক কর্তব্য, তা তিনি পুরাতন পার্টিশান-

আন্দোলনের যুগে নিজ বৃদ্ধবয়সে পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে বলেছেন। এইরূপে আমি পেয়েছি আমার জীবনের মূল মন্ত্রটি।"

কী সেই মন্ত্র?—সত্যের জন্যে নির্ভীক হওয়া, সত্যকে প্রকাশ করার জন্য নির্ভয় হওয়া। বললেন, "সত্য প্রিয়ই হোক আর অপ্রিয়ই হোক, তার জন্য ভাবব না—

মোরা সত্যের 'পরে মন
আজি করিব সমর্পণ।
মোরা বুঝিব সত্য, পুজিব সত্য,
খুঁজিব সত্যধন।

আমার ইতিহাস-সাধনার মূলসূত্র এই এবং এই আমার জীবনসাধনা।"

পিতার কাছ থেকে তিনি ম্যাপ আঁকা ও ম্যাপের ঐতিহাসিক প্রাধান্য সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেন এবং লাভ করেন সংযত ভাষা ও সুন্দর হস্তাক্ষর। আর শেখেন স্ট্যাটিসটিক্‌স ও ইকনমিক ফ্যাক্টরের আবশ্যকতা।

জীবনের এই একটি দিকের শিক্ষার কথা ব'লে আর-এক দিকের শিক্ষার বিষয় উল্লেখ করে বললেন, "আমার পিতার একমাত্র (কনিষ্ঠ) ভ্রাতা হরকুমার সরকার অল্পবয়সে ইংরেজি পড়ায় বাধা পাওয়াতে বাংলা সাহিত্যে অগাধ উৎসাহী হলেন। তাঁর কাছে সব ভালো বাংলা বই ও মাসিক (এবং আর্যদর্শন) প্রকাশ হওয়া মাত্র আসত। বঙ্কিম, রমেশ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ এইভাবে তাঁর কাছে আসে। এঁর কাছে আমি বাংলা কাব্য ও উপন্যাসের আস্বাদ পাই। তাঁর সংগৃহীত বই বারেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতিকে দান করা হয়েছে।"

আর-এক দিকের শিক্ষার কথাও উল্লেখ করলেন এই প্রসঙ্গে।—তাঁর ইংরেজি রচনাপ্রণালী শিক্ষা। এ শিক্ষা তিনি লাভ করেন বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ও ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষের কাছ থেকে। বললেন, "এঁর লেখার প্রতি আমার অসীম ভক্তি ছিল। আমি বার বার আমার লেখা কেটে কেটে যাতে তাঁর স্টাইল আয়ত্ত করতে পারি, তারই চেষ্টা করতাম। আপ্রাণ চেষ্টায় এই অনুকরণের ফলে অল্প কথায়

বক্তব্য প্রকাশ করার ও ঠিক উপযুক্ত শব্দ ব্যবহারের শক্তি আমার যে একটু আছে, তা আয়ত্ত করি।"

১৮৯২ সালে ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পরীক্ষায় যদুনাথ প্রথমশ্রেণীতে প্রথমস্থান অধিকার করেন। কেবল প্রথমস্থান অধিকার করেন বললেই সবটা অবশ্য বলা হয় না। ইংরেজ অধ্যাপক এইচ. আর. জেমস্ তাঁকে ইংরেজির প্রবন্ধপত্রে শতকরা পঁচানব্বই নম্বর এবং alpha plus দেন, অধ্যাপক পার্সিভ্যাল অন্যান্য পত্রে দেন শতকরা নব্বই ও সাতাশি।

আজ তিনি সুস্থ সবল ও কর্মঠ, কিন্তু বাল্যকালে অসুখে ভুগেছেন খুব বেশি। রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ। ক্লাসে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতেন, যিনি প্রথম হতেন— সুদর্শন চক্রবর্তী— ১৮৮৭র এনট্রান্স পরীক্ষায় সমস্ত ইউনিভার্সিটির মধ্যে প্রথম হন, যদুনাথ হন ষষ্ঠ।

বললেন, "রাজসাহীতে প্রতি বছর দুই মাস কাল আমি ম্যালেরিয়ায় কাতর থাকতাম। এফ. এ. পরীক্ষার প্রথম দিন রোগশয্যা থেকে তুলে পালকী করে আমাকে পরীক্ষাগৃহে পাঠানো হয়। বেঞ্চে বসে থাকতে পিঠ বেঁকে আসত। কোনোক্রমে পরীক্ষা দিই।"

এই পরীক্ষায় তিনি দশম স্থান লাভ করেন। তার পর ১৮৮৯ সালের জুন মাসে চলে আসেন কলকাতায়। ইডেন হিন্দু হস্টেলে থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া শুরু করেন। কলকাতায় এসে তিনি প্রথম ফুটবল দেখলেন। কেবল দেখা নয়, তিনি নিয়মিত ফুটবল খেলতে আরম্ভ করলেন। তাঁর সহপাঠী ও রুমমেট সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী (পরে ইনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও রায়বাহাদুর হন) ফুটবল খেলায় যদুনাথের শিক্ষক ছিলেন। এইভাবে প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়ামে তাঁর শরীর সবল ও শক্ত হয়ে ওঠে। বললেন, "আমার মানসিক প্রতিভা এবং দীর্ঘায়ু ও কর্মঠ দেহ সব পেয়েছি আমার পিতামাতার কাছ থেকে।"

১৮৯৭ সালে যদুনাথ প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তৎকালীন নিয়মানুসারে প্রথমে আটখানা লেখা পেপারে পরীক্ষা দিতে হত, তাতে যে ছাত্র সর্বপ্রথম হত কেবল সেই ঐ বৃত্তি (সাত হাজার টাকা) পাওয়ার

অধিকারী হত ; কিন্তু সে তার পর মৌলিক গবেষণা দ্বারা একটি গ্রন্থ রচনা করতে বাধ্য ; তা না হলে এই বৃত্তির পাঁচ ভাগের তিন ভাগ কাটা যেত। এই কারণে ফার্সী হাতের লেখা বই পড়ে তিনি রচনা করেন এক গ্রন্থ। ১৯০১ সালে এই বই *India of Aurangzib* নামে প্রকাশিত হয়। এই বই প্রকাশমাত্র দেশের সীমান্ত ছাড়িয়ে তাঁর নাম বিদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বিলেতে নাম পড়ে গেল যদুনাথের।

তাঁর সাধনার সিদ্ধির সম্ভবত এইটেই সূচনা। ঔরঙজেবই হল তাঁর গবেষণার বিষয়। ১৯০৪ সাল থেকে ১৯২৪— এই বিশ বছর ধরে তিনি ঔরঙজেবের আমলের ভারতবর্ষ সন্ধান করে চললেন। পাঁচ ভলিউমে তিনি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন। এজন্যে তাঁকে অসংখ্য ফার্সী গ্রন্থ ও হস্তলিপি সংগ্রহ করতে হয়। এবং আয়ত্ত করতে হয় মারাঠী ও ফরাসী ভাষা এবং চলনসই পর্তুগীজ ও ডিঙ্গল ভাষা। ঔরঙজেবের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে উপকরণাদি ও তথ্য সংগ্রহের সঙ্গেসঙ্গে তিনি শিবাজীর সম্বন্ধেও তথ্য ও উপকরণাদি পেয়ে যান, সেই উপকরণ কাজে লাগিয়ে ১৯১৯ সালে রচনা করেন *Shivaji and His Times*।

বললেন, "সত্যের দৃঢ় প্রস্তরময় ভিত্তির উপর ইতিহাস দাঁড়িয়ে আছে। যদি সেই সত্যই নির্ধারিত না হল, যদি অতীতের একটা মনগড়া ছবি খাড়া করি অথবা আংশিক ছবি এঁকেই ক্ষান্ত হই, তবে তো কল্পনার জগতেই রয়ে গেলাম। কিন্তু এই সত্য নির্ধারণ করলেই ঐতিহাসিকের কাজ শেষ হল না। শুধু রাজা রাজ্যপরিবর্তন ও যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই ইতিহাস নয়। অতীত যুগের বাহ্য আবরণ ও তার গায়ের চামড়াটি চোখের সামনে সহজেই আনা যায়। কিন্তু তার হৃদয়টি দেখাতে না পারলে প্রকৃত ইতিহাস হয় না।"

ঐতিহাসিক বলে তিনি বিশ্ববিখ্যাত হয়েছেন। দার্শনিক হতে না পারলে প্রথমশ্রেণীর ঐতিহাসিক হওয়া যায় না, সেদিক থেকে তিনি দার্শনিকও। সাহিত্যরসও আছে তাঁর মধ্যে, তাঁর খুল্লতাতের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছেন এই সাহিত্যিক দীক্ষা। তাঁর রচনার মধ্যে এই কারণেই সরসতা আছে এবং বিভিন্ন কাব্য থেকে স্বচ্ছন্দ উদ্ধৃতিও দেখা যায়। সাহিত্যের

উপরেও তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা, বললেন, "সাহিত্যসেবীকে অশরীরী দেবীর পূজারী হতে হবে। তাকে প্রথমে মানুষ হতে হবে, বীর হতে হবে, স্বাধীনচেতা হতে হবে। কেবল ভোগ ও আরামের লালসা ত্যাগ করলেই হবে না, শুধু শ্রমশীল হলেই চলবে না, প্রকৃত সাহিত্যসেবককে উন্নতমস্তক হতে হবে, চাটুকারের বৃত্তিকে পদাঘাত করতে হবে, অর্থলোভকে বিষবৎ পরিত্যাগ করতে হবে। সাহিত্যিককেও হতে হবে নির্ভীক সত্যসন্ধানী।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে কার ব্যক্তিত্ব আপনার কাছে সবচেয়ে বড় বলে মনে হয়।"

বললেন, "দুনিয়ার ইতিহাস পড়া গেছে। হঠাৎ কার নাম বলি।"

নিজেকে শুধরে নিয়ে বললাম, "আমি বলছি ভারতের ইতিহাসের কথা।"

প্রথমেই তিনি নাম করলেন আকবরের। তার পর করলেন শিবাজীর নাম। বললেন, "আকবর হচ্ছেন the greatest political genius born এবং শিবাজী হচ্ছেন মধ্যযুগের ভারতবর্ষের হিন্দুর মধ্যে the greatest constructive genius।

এম. এ. পাস করার পর আরম্ভ হয় তাঁর অধ্যাপনা-জীবন। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৯ সাল কলকাতায় রিপন বিদ্যাসাগর ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। পাটনায় তাঁর কর্মজীবন কুড়ি বছর কাটে। এখানে ছাত্রদের প্রীতি অর্জন করেন। অনেক বছর ইংরেজিই অধ্যাপনা করেছেন; তার পর পড়াতেন অর্থনীতি ও ইতিহাস; অবশেষে কেবল ইতিহাস। এ ছাড়া কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই বৎসর, কটকে চার বছর তিন মাস তিনি অধ্যাপনা করেন এবং ১৯২৬ সালের অগস্ট মাসে পাটনা কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ভারতের ঐতিহাসিক প্রদেশ ও শহরগুলির প্রতি টান তাঁর অসীম। চাকরির জীবনে প্রতি বছর পুজোর ছুটিতে তিনি এইসব শহর ও প্রদেশ দেখতে বেরিয়ে পড়তেন। এ পর্যন্ত এক মহারাষ্ট্রেই গিয়েছেন চল্লিশ বারের উপর। এইভাবে ঘুরে ঘুরে ভারতকে তিনি চিনেছেন; কেবল ভারতের মাটির সঙ্গে নয়, ভারতের হৃদয়ের সঙ্গে তাঁর নিবিড় আত্মীয়তা ঘটেছে।

সমন্বয়ের ভূমি এই ভারতভূমি, স্মরণাতীত যুগ থেকে সময়ের স্রোতে ভেসে এসে বিভিন্ন জাতি ভারতভূমিতে বসবাস আরম্ভ করেছে ; সেইসব জাতির আদিম পার্থক্য বা বিশেষত্ব এখন আর নেই। ভারতের জলবায়ু, রোদ-বৃষ্টি ভাত-রুটির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তা লোপ পেয়ে সকলেই এক ভারতীয় ছাপ নিয়েছে, এই কথা উল্লেখ করে বললেন, "আমাদের ভারতবর্ষ একতার ভূমি। প্রাচীনতম আর্যযুগ থেকে এই সমন্বয় ধারাবাহিকভাবে নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে ; এবং তার শেষ ফল এখনকার আমরা।"

ঐতিহাসিক তথ্য এবং ঐতিহাসিক সত্য আহরণ করাই তাঁর জীবনের কাজ। তাঁর এই কাজকে তিনি মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন—

১ সব মশলা সংগ্রহ— সব রকমের ভাষায় ;

২ অন্যের কথার উপর নির্ভর না করে আদি ভাষায় উপাদান-সংগ্রহ ;

৩ ঐতিহাসিক উপাদানকে তিনি বলেন সাক্ষী। এই সাক্ষীকে জেরা করে আসল কথা বার করা ;

৪ ম্যাপ সামনে রাখা ;

৫ কম কথায় বক্তব্য প্রকাশ করা ;

৬ ক্রমাগত সংশোধন, নূতন তথ্য সংযোজন ;

৭ লিখনপদ্ধতি, অর্থাৎ স্টাইল।

এই সাতটি নক্ষত্রের সমবায়ে রচিত হয় যে সপ্তর্ষিমণ্ডল, তারই সংকেতে অগ্রসর হয়ে তিনি পৌঁছন সত্যের ধ্রুবতারায়।

ছেলেবেলা থেকেই দুষ্প্রাপ্য বই জোগাড় করা তাঁর বাতিক ছিল। ছাত্র-জীবনে স্কলারশিপের সব টাকা যেত এইসব বই কিনতে, কর্মজীবনে বেতনের অনেক টাকা যেত এই খাতে। কেবল বই নয়, ম্যাপও। বললেন, "শিখযুদ্ধ নেপালযুদ্ধ সিপাইবিদ্রোহ সম্বন্ধে যত বই পাওয়া যায়, সব কিনেছি। আমার নীট আয়ের অর্ধেক গিয়েছে পারসী হস্তলিপি নকল করাতে, বিলেত থেকে তার ফটো আনতে, এবং দুষ্প্রাপ্য নানা ভাষার গ্রন্থ কিনতে।"

গ্রন্থাকারে তাঁর ইংরেজি ও বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলিই,

কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকার পাতায় বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে তাঁর অনেক রচনা। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, অলকা, শনিবারের চিঠি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ইত্যাদি সাময়িক পত্রে ১৩০২ সন থেকে এ পর্যন্ত যতগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন, তার সংখ্যা এক শতের উপর। এ ছাড়া বাংলা ও ইংরেজি বিভিন্ন লেখকের গ্রন্থের ভূমিকার সংখ্যাও সামান্য নয়। এগুলি সংগ্রহ করে একত্র করলে সুবৃহৎ একটি গ্রন্থের আকার ধারণ করবে।

১৯২৯ সালে ইনি নাইট উপাধিতে ভূষিত হন। ঢাকা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় যথাক্রমে ১৯৩৬ ও ১৯৪৪ সালে এঁকে ডি. লিট. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯২৬-২৮ সালে ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার ছিলেন।

১৯২৩ সালে বিলাতের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি এঁকে অনারারি মেম্বার নির্বাচিত করেন। ঐ সমিতির চাঁদা দিয়ে মেম্বার শত শত আছে, কিন্তু 'সম্মানিত সদস্য' কখনও ত্রিশ জনের বেশি হতে পারে না, প্রায়ই তার কম সংখ্যক থাকে। এই সম্মানিত দলে অনেক বৎসর যদুনাথ একমাত্র এশিয়াটিক। ১৯৩৪এ ইংলণ্ডের রয়াল হিস্টরিকাল সোসাইটি তাঁকে 'করেসপণ্ডিং মেম্বর' (অর্থাৎ ঐ অনারারি মেম্বরের মত) নির্বাচিত করেন, এই গৌরবান্বিত দলের সংখ্যা চল্লিশে আবদ্ধ; যদুনাথ এখানে একমাত্র কালা আদমি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক এঁর অনেক কালের। প্রায় দশ বছর পরিষদের সভাপতি-পদে ইনি বৃত ছিলেন, বর্তমানে ইনি পরিষদের বিশিষ্ট সদস্য। বললেন, "সাহিত্য-পরিষদে প্রায় রোজই যেতাম। দেউলিয়া অবস্থা থেকে পঁচিশ বছরে পরিষৎ স্বচ্ছল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। এ হচ্ছে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কীর্তি। আমি তাঁরই পৃষ্ঠপোষণ করি।"

আজ তাঁর মনে পড়ে অনেকের কথা, কয়েকজনের নাম করে তাঁদের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বিদেশীদের মধ্যে প্রিন্সিপাল ডক্টর সি. আর. উইলসন, আই. সি. এস.; ও ঐতিহাসিক ডবলিউ. আরভিন; গবর্নর সার্ এডওয়ার্ড গেইট। বললেন, "দেশীয় বন্ধু আমার অসংখ্য, তাঁদের মধ্যে

ছুইজনের মাত্র নাম করব, প্রথম, গোবিন্দ সখারাম শরদেশাই, বর্তমানে এঁর বয়স সাতাশি ; দ্বিতীয়, শিভালিয়ার পাণ্ডুরঙ্গ স পিছুললেন্‌কর (গোয়াবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ), বয়স আটান্ন বৎসর।"

হিস্টরি অব ঔরঙজেব পাঁচ ভলিউম থেকে আরম্ভ করে ১৯৫০ সালের যে মাসে *Fall of the Mughal Empire* গ্রন্থের চতুর্থ ও শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে— এসবে ১৬৩৬ থেকে ১৮০৩ সালের ইতিহাস লেখা হয়েছে। এটি একটি ছুরূহ কাজ, এই কাজ শেষ করতে পেরে তিনি আজ তৃপ্ত। বললেন, "দেখি, এখন যদি ভারতবর্ষে যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাস (History of Wars in India) শেষ করতে পারি।"

বয়স হয়েছে, কিন্তু উগ্যম ও প্রেরণা এখনো যে স্তিমিত হয় নি, তাঁর এই কথাতেই তার প্রমাণ পেলাম। কেবল কথায় কেন, তাঁর চলায় ও বলায় পর্যন্ত উৎসাহের ও প্রেরণার ইঙ্গিত দেখলাম স্পষ্ট। নিজের বয়স সম্বন্ধে যেন কোনো হুঁশ নেই। আমার সঙ্গে কথা শেষ হওয়া মাত্র উঠে পড়লেন তিনি, দরজার পরদা সরিয়ে নিমেষের মধ্যে চলে গেলেন ভিতরে।

মনে পড়ে গেল শিবাজীর জন্মস্থানের কথা। পুনার পথে সেই ইলেকট্রিক-ট্রেনে যাত্রার কথাটা— মসৃণ দ্রুততায় ভারতের পশ্চিমঘাটের কিনার ঘেঁষে পরিচ্ছন্ন ট্রেনের সেই শব্দহীন গতিটা।

রচিত গ্রন্থাবলী

India of Aurangzib—Topography, Statistics
and Roads। খ্রী ১৯০১

Economics of British India। খ্রী ১৯০৯

History of Aurangzib Vol. I—V। খ্রী ১৯১২-২৪

Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays। খ্রী ১৯১২

Chaitanya : His Pilgrimages and Teachings। খ্রী ১৯১৩

সিয়ার্-উল-মুতাখ্খরীন—অনুবাদক গৌরসুন্দর মৈত্র (সম্পাদিত)।
কার্তিক ১৩২২। খ্রী ১৯১৫

Shivaji and His Times। খ্রী ১৯১৯

Studies in Mughal India । খ্রী ১৯১৯
Mughal Administration । খ্রী ১৯২০-২৫
Later Mughals, 1707-1739 । খ্রী ১৯২২
India Through the Ages । খ্রী ১৯২৮
শিবাজী । নবেম্বর ১৯২৯
Short History of Aurangzib । খ্রী ১৯৩০
Bihar and Orissa during the fall of the
Mughal Empire । খ্রী ১৯৩২
Fall of the Mughal Empire VOL. I—IV । খ্রী ১৯৩২-৫০
Studies in Aurangzib's Reign । খ্রী ১৯৩৩
মারাঠা জাতীয় বিকাশ । আষাঢ় ১৩৪৩ । খ্রী ১৯৩৬
House of Shivaji । খ্রী ১৯৪০
Maasir-i-Alamgiri । খ্রী ১৯৪৭
Poona Residency Correspondence.
(Edited) VOL. I VIII, XIV । খ্রী ১০৩৬-৫১
Ain-i-Akbari, VOL. III । খ্রী ১৯৪৮
Delhi News for Poona, 1756-1788 । খ্রী ১৯৫২
Bengal Nawabs । খ্রী ১৯৫২
Ain-i-Akbari, VOL. II । খ্রী ১৯৫৩

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

আমাদের চোখের সামনে থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়ে যা একটা স্মৃতি হয়ে দাঁড়ায় তাই আমাদের কাছে মধুময় বলে বোধ হয়। গত শতাব্দীটা সরে গেছে আমাদের কাছ থেকে, তাই তার উপর আমাদের এত মমতা। লোকে বলে, মমতায় নাকি মানুষ অন্ধ হয়। কিন্তু সব-সময় হয়তো নয়। গত শতাব্দীর প্রতি আমাদের মমত্বের মধ্যে কোনো অন্ধতা নেই। সময়ের কষ্টিপাথরে ঘষে দেখা গেছে গত শতাব্দীটা ছিল খাঁটি সোনার শতক। সেই সোনার শতকের সাতনরী-কণ্ঠহারের মধ্যে একটি লহর ছিল জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। এই লহরের সঙ্গে যেন বাঁধা ছিল বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতা, সংগীত ও সাহিত্য, আচার ও আচরণ। সমগ্র দেশের উপর এই ঠাকুরবাড়ির প্রভাব ছিল অসাধারণ। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী এই গৃহেরই নন্দিনী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলার প্রথম সিভিলিয়ান; ইন্দিরা দেবী সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা।

১৮৭৩ সালের ২৯এ ডিসেম্বর (১৫ই পৌষ ১২৮০ বঙ্গাব্দ) দক্ষিণ-ভারতের বিজাপুরে ইন্দিরা দেবীর জন্ম। তাঁর পিতাকে বাংলার বাইরেই বিভিন্ন জায়গায় কাটাতে হয়েছে, সেইসঙ্গে ইন্দিরা দেবীর শৈশবও কেটে যায় বাংলার বাইরেই। বাংলার পূর্বগৌরব আর নেই বলে অনেকে দুঃখ করেন; তাঁরা আক্ষেপ করে বলেন, জোড়াসাঁকোর সাঁকো আজ ভেঙে গেছে। তাঁরা এ কথার দ্বারা যা বোঝাতে চান সে সম্বন্ধে কোনো প্রতিবাদ নেই। তবুও মনে হয়— সে সাঁকো আজও ভেঙে যায়নি, আজও তা অটুট ও অটল আছে। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী হচ্ছেন সেই সাঁকো। দুই হাতে তিনি ধরে আছেন দুইটি তীর— দুইটি শতাব্দী। এই পথেই এক শতাব্দী থেকে অন্য শতাব্দীতে পারাপার করা সম্ভব হচ্ছে। গত শতাব্দী থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে নিয়ে আসা যাচ্ছে আমাদের এই বর্তমান শতকে। জোড়া দিয়ে রেখেছেন তিনি দুইটি তীরকে। তাই মনে হয়, জোড়াসাঁকো আজও ভেঙে যায়নি।

বার্ধক্যের বয়স তাঁর হয়েছে, তবু তিনি শক্ত ও সমর্থ, স্মৃতিশক্তি এখনো প্রখর, কণ্ঠস্বরে এখনো বলিষ্ঠতা, উচ্চারণে অদ্ভুত স্পষ্টতা, দৃষ্টিতেও অস্পষ্টতা নেই— চোখে চশমা দরকার হয় না। অশ্চর্য লাগে হস্তাক্ষর দেখে, কলম একটু কাঁপে না, অক্ষর এতটুকু বেঁকে যায় না।

২৮এ জুন ১৯৫৩, ১৪ই আষাঢ় ১৩৬০, রবিবার সকাল। বালিগঞ্জের পাম প্লেসের দ্বিতলের ঘরে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। পুব দিকের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোয় চিকচিক করে উঠছে তাঁর মাথার উজ্জ্বল কালো চুল। সিঁথির কাছে মাত্র কয়েকটা চুলে পাক ধরেছে।

বললেন, "আমাদের স্বাস্থ্যের কথা অনেকে বলেন। স্বাস্থ্যটা ভালো আছে, এটা একটা আশীর্বাদই বটে। কিন্তু খুব ভালো খাওয়ার জন্যে হয়তো নয়। খাঁটি জিনিস খাবার জন্যে। আমাদের সময় কোনো ভেজাল ছিল না। না খাদ্যে, না কোনো-কিছুতে। কিন্তু আজকাল সব কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে।"

সময়ের সঙ্গেসঙ্গে সবই বদলায়। উন্নতি মানেই পরিবর্তন। কিন্তু পরিবর্তন মানেই উন্নতি কিনা এ বিষয়ের তিনি সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তাঁদের কালে তাঁরা ছিলেন পরানির্ভর, বনিতার এই ছিল তখনকার ধর্ম। কিন্তু আজকাল মেয়েদের আত্মনির্ভর হতে দেখা যাচ্ছে। তারা নিজেদের উদ্যোগে হাট-বাজারে যাচ্ছে, ব্যাঙ্কে গিয়ে চেক জমা দিচ্ছে, টাকা তুলে আনছে, কাজকর্ম করছে। এখন যুগের বদল হয়েছে, সেই বদলের সঙ্গে তাল রেখে জীবনধারণ তো করা চাই।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি অতি নিষ্ঠাশীল পরিবার। কোনো বিদেশী প্রভাব এসে এই পরিবারের আচার-আচরণকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। জ্ঞানে ও গরিমায়, ঐশ্বর্যে ও মহিমায় এই পরিবার ছিল বাংলার আদর্শ। এমনি ঘরের মেয়ে হয়েও মাত্র পাঁচ বছর বয়সে ১৮৭৮ সালে তিনি তাঁর মাতা জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে কালাপানি পার হয়ে বিলেত যান। তাঁরা বিলেত যাবার কয়েক মাস পরে দুই ভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন। এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিলাতগমন। প্রায় আড়াই বছর সেখানে থেকে ১৮৮০ সালে ইন্দিরা দেবী স্বদেশে ফিরে আসেন।

দেশে এসে তাঁর আরম্ভ হয় বিদ্যালয়-জীবন। তিনি ভর্তি হন সিমলার অকল্যাণ্ড হাউসে। বললেন, "সিমলার কথায় একটা কথা মনে পড়ে গেল। কাগজে যা ছাপা হয়ে বের হয় লোকে তাকেই বেদবাক্য বলে মনে করে। সিমলায় যখন গিয়েছিলাম, তখন আমার বয়স মাত্র সাত। এই সময় রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের চাপে পড়ে একটা পাহাড়ের চূড়ায় ব'সে একটা গান গেয়েছিলাম, সে গানটা হচ্ছে 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে'। কাগজে লিখেছে আমি নাকি মস্ত একটা জলসায় গান গাই। তাই কাগজে লেখা শুনলেই ভয় পাই।"

১৮৮১ সালে সিমলা থেকে কলকাতায় এসে তিনি লরেটো হাউসে ভর্তি হন, এবং ছয় বছর এখানে পাঠ করার পর ১৮৮৭ সালে এনট্রান্স পাস করেন। তার পর এফ. এ. ও বি. এ. পাস করেন বাড়িতে পড়ে। ইংরেজিতে তাঁর দখল ছিল অসাধারণ, বি. এ.-তে তিনি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে নেন ফরাসি ভাষা। ফরাসি শেখার জন্যে তিনি লা মার্টিনিয়ার স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কাছে পাঠ নিতে যেতেন। হেসে বললেন, "এই সময়ের একটা কথা কনে পড়ছে। মোলিয়েরের একটা লেখা তখন আমরা পড়ছি, তার একটা চরিত্রের বিষয় লেখক বর্ণনা দিতে দিতে শেষে লিখেছেন, সে-লোকটা চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত যথানিয়মে কথা ব'লে অবশেষে জেনে আশ্চর্য হয়ে গেল যে, এতকাল সে যত কথা বলে এসেছে সে সবই সে নাকি বলেছে গদ্যে।—আমরা লেখাটা প'ড়ে এমন মজা পেয়েছিলাম যে, এ নিয়ে খুব হাসাহাসি করি।"

মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে সকলের মধ্যে ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি ১৮৯১ সালে বি. এ পাস করেন। এবং মেয়েদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়ায় তিনি পদ্মাবতী পদক লাভ করেন।

সে-আমলে পিয়ানো বাজানোয় তাঁর দক্ষতা ছিল। বিদেশী শিক্ষকের কাছে তিনি পিয়ানো ও বেহালা বাজানো শেখেন। তাঁর পিয়ানো-শিক্ষকের নাম স্লেটার ও বেহালা-শিক্ষকের নাম ছিল মনজাটো। ট্রিনিটি কলেজ অব মিউজিকের ইনটারমিডিয়েট থিয়োরী পরীক্ষায় পাস ক'রে তিনি ডিপ্লোমা পান। পাশ্চাত্য সংগীতের উপর তাঁর যে যথেষ্ট দখল জন্মেছিল, তার

প্রমাণ ট্রিনিটি কলেজের পরীক্ষার ফল। কিন্তু এই ফলটিই শেষ কথা নয়। বিদেশী সংগীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকেই তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিলেন এবং সুনামও অর্জন করেছিলেন। যখন তাঁর বয়স তের-চৌদ্দ, সেই সময় বদ্রিদাস সুকুলের কাছে ইন্দিরা দেবী উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী কণ্ঠসংগীত বিশেষভাবে চর্চা আরম্ভ করেন এবং সেতার বাজানোও কিছু-কাল অভ্যাস করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি স্বদেশী ও বিদেশী সংগীতের একনিষ্ঠ সাধিকা হয়ে উঠলেন। পারিবারিক পরিবেশটাই ছিল সাধনার উপযোগী। তার উপর সেই সাধনাকে অন্তরাত্মা দিয়ে গ্রহণ করার উপযুক্ত মনও তাঁর ছিল; তাই সহজেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে উত্তরজীবনে সংগীতপ্রাণ হয়ে ওঠেন। গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এত প্রবল ছিল যে, যখন বয়সে তিনি প্রায় প্রবীণা হয়ে উঠেছেন, যে সময় বাংলা দেশের মেয়েরা জীবনের হাল প্রায় ছেড়ে দেয়, সেই সময়েও, সেই ৪৭ বৎসর বয়সে, হিন্দুস্থানী মার্গসংগীতের চর্চা নূতন ভাবে আরম্ভ করলেন। ১৯২০ সালের কথা। তিনি প্রফেসার ছেদি ব্রতিয়ার কাছে রাঁচিতে নূতন উদ্যমে সংগীতচর্চা আরম্ভ করলেন।

তাঁর জীবনকে তিনি সংগীতে ও সাহিত্যে একই সঙ্গে জারিত করে চলেছেন। জীবনকে সাধনা দিয়ে শোধন করে না দিলে জীবনের খাদ বাদ যায় না— এই সার কথাটাই তিনি জীবনের আদর্শ ক'রে নিয়েছিলেন বলা যায়। তাই আজ তাঁকে পরিশুদ্ধ ব্রতিনী বলেই মনে হয়। মনে হয়, এত দীর্ঘ সাধনার পরেও তাঁর জীবনের ব্রত যেন সাঙ্গ হয়নি।

বললেন, "অনেক কাজ এখনো করা বাকি। শিগগির আরম্ভ করতে না পারলে আর উপায় নাই। বয়স হয়েছে অনেক। অনেকে একটা আত্মজীবনী লেখার তাগিদ দেন। নিজেরও ইচ্ছে, কিছু লিখে রাখি। দেরি করাও ঠিক না, স্মৃতি আর বেশিদিন থাকবে কি না সন্দেহ। কিন্তু করি কী। যাকে এখন সকলে পরিস্থিতি বলে, তা যে অনুকূল নয়।"

সাধনা ও আরাধনার সঙ্গেসঙ্গে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরও কম ছিল না। কিন্তু ঐশ্বর্য তাঁকে আগলে রাখতে পারেনি, তিনিও চাননি ঐশ্বর্যকে আগলে

রাখতে। তাই জীবন যেন অনাসক্ত, নির্লিপ্ত। সকল কালের ও সকল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে আপন করে নেবার মত মনের উদারতা ও পরিচ্ছন্নতা আছে বলেই তাঁর জীবনের রস উপে যায় নি। পরিহাসে তিনি পরম পটু। বললেন, "গানের গলার কথা বলছ? সেকালে গাইয়েরা মাইক দেখেনি। তাদের গলা প্রকাণ্ড হল্ পেরিয়ে যেত। আজকাল মাইক না হলে ছোট একটা ঘরেও গাইয়েদের গলা শোনাই দায়। অনেক টেনে-কষে কোমল নি পর্যন্ত গলা হয়তো ওঠে, কিন্তু সা পর্যন্ত পৌঁছয় না কিছুতে। আগে গাইয়েরা সা-এই গান ধরত, এখন নামতে নামতে পা-এ ধরতে আরম্ভ করেছে। স্বাস্থ্যের কথা বলছিলাম। স্বাস্থ্য না থাকলে গলা আসবে কোথা থেকে?"

কেবল গাইয়ে ব'লে কেন, এখনকার মানুষও হয়তো আগের মতন তেমন অমায়িক নেই। বললেন, "আদরে-আপ্যায়নে গানে-বাজনায় সংগীতে-সাহিত্যে জড়িয়ে যে আবহাওয়া, তাতেই আমরা মানুষ। পিছিয়ে দেখতে গেলে মনে হয়, এখন মানুষের জীবন অনেক কষ্টের। বলছিলাম, জীবন-ধারণের প্রণালীই বদলে গেছে। বদলটাই সব-সময় উন্নতি নাও হতে পারে।"

১৮৯৯ সালের কথা। তাঁর বয়স তখন ছাব্বিশ। এই সময় তাঁর বিবাহ হয় বাংলা সাহিত্যের বীরবল প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে। প্রমথ চৌধুরী তখন ব্যারিস্টারি পাস ক'রে এসে সবে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন। তার উপর তাঁর অগাধ পড়াশুনা এবং প্রবল সাহিত্যানুরাগের কথাও সকলে জানত।

নতুন দেশে নয়, এ এক নতুন জীবনে পদার্পণ ইন্দিরা দেবীর। সকল অবস্থা এবং সকল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার তাঁর কুশল দক্ষতা আছেই। তিনি এই নতুন জীবনের রাশ ধরলেন। নূতন সংসারে এলেন কেবল নববধূ রূপে নয়, বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যস্রষ্টার জীবনসঙ্গিনী রূপে। নূতন সংসারে প্রবেশ করলেন, গৃহস্থালীর সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলেন সুগৃহিণীর মত; কিন্তু এর দ্বারা তাঁর জীবন সংসারের পাকে জড়িয়ে গেল না। সংসার চলল সংসারের ধারায়, তিনি সেই ধারায় গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজের ব্রত ও সাধনার কথা ভুলে গেলেন না, স্বামীর সাধনার ধারায়ও কোনো

প্রমাণ ট্রিনিটি কলেজের পরীক্ষার ফল। কিন্তু এই ফলটিই শেষ কথা নয়। বিদেশী সংগীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকেই তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছিলেন এবং সুনামও অর্জন করেছিলেন। যখন তাঁর বয়স তের-চৌদ্দ, সেই সময় বদ্রিদাস সুকুলের কাছে ইন্দিরা দেবী উচ্চাঙ্গ হিন্দুস্থানী কণ্ঠসংগীত বিশেষভাবে চর্চা আরম্ভ করেন এবং সেতার বাজানোও কিছু-কাল অভ্যাস করেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তিনি স্বদেশী ও বিদেশী সংগীতের একনিষ্ঠ সাধিকা হয়ে উঠলেন। পারিবারিক পরিবেশটাই ছিল সাধনার উপযোগী। তার উপর সেই সাধনাকে অন্তরাত্মা দিয়ে গ্রহণ করার উপযুক্ত মনও তাঁর ছিল; তাই সহজেই তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ ক'রে উত্তরজীবনে সংগীতপ্রাণ হয়ে ওঠেন। গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এত প্রবল ছিল যে, যখন বয়সে তিনি প্রায় প্রবীণা হয়ে উঠেছেন, যে সময় বাংলা দেশের মেয়েরা জীবনের হাল প্রায় ছেড়ে দেয়, সেই সময়েও, সেই ৪৭ বৎসর বয়সে, হিন্দুস্থানী মার্গসংগীতের চর্চা নূতন ভাবে আরম্ভ করলেন। ১৯২০ সালের কথা। তিনি প্রফেসার ছেদি ব্রতিয়ার কাছে রাঁচিতে নূতন উদ্যমে সংগীতচর্চা আরম্ভ করলেন।

তাঁর জীবনকে তিনি সংগীতে ও সাহিত্যে একই সঙ্গে জারিত করে চলেছেন। জীবনকে সাধনা দিয়ে শোধন করে না দিলে জীবনের খাদ বাদ যায় না—এই সার কথাটাই তিনি জীবনের আদর্শ ক'রে নিয়েছিলেন বলা যায়। তাই আজ তাঁকে পরিশুদ্ধ ব্রতিনী বলেই মনে হয়। মনে হয়, এত দীর্ঘ সাধনার পরেও তাঁর জীবনের ব্রত যেন সাঙ্গ হয়নি।

বললেন, "অনেক কাজ এখনো করা বাকি। শিগগির আরম্ভ করতে না পারলে আর উপায় নাই। বয়স হয়েছে অনেক। অনেকে একটা আত্মজীবনী লেখার তাগিদ দেন। নিজেরও ইচ্ছে, কিছু লিখে রাখি। দেরি করাও ঠিক না, স্মৃতি আর বেশিদিন থাকবে কি না সন্দেহ। কিন্তু করি কী। যাকে এখন সকলে পরিস্থিতি বলে, তা যে অনুকূল নয়।"

সাধনা ও আরাধনার সঙ্গেসঙ্গে ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরও কম ছিল না। কিন্তু ঐশ্বর্য তাঁকে আগলে রাখতে পারেনি, তিনিও চাননি ঐশ্বর্যকে আগলে

রাখতে। তাই জীবন যেন অনাসক্ত, নির্লিপ্ত। সকল কালের ও সকল অবস্থার সঙ্গে নিজেকে আপন করে নেবার মত মনের উদারতা ও পরিচ্ছন্নতা আছে বলেই তাঁর জীবনের রস উপে যায় নি। পরিহাসে তিনি পরম পটু। বললেন, "গানের গলার কথা বলছ? সেকালে গাইয়েরা মাইক দেখেনি। তাদের গলা প্রকাণ্ড হল্ পেরিয়ে যেত। আজকাল মাইক না হলে ছোট একটা ঘরেও গাইয়েদের গলা শোনাই দায়। অনেক টেনে-কষে কোমল নি পর্যন্ত গলা হয়তো ওঠে, কিন্তু সা পর্যন্ত পৌঁছয় না কিছুতে। আগে গাইয়েরা সা-এই গান ধরত, এখন নামতে নামতে পা-এ ধরতে আরম্ভ করেছে। স্বাস্থ্যের কথা বলছিলাম। স্বাস্থ্য না থাকলে গলা আসবে কোথা থেকে?"

কেবল গাইয়ে ব'লে কেন, এখনকার মানুষও হয়তো আগের মতন তেমন অমায়িক নেই। বললেন, "আদরে-আপ্যায়নে গানে-বাজনায় সংগীতে-সাহিত্যে জড়িয়ে যে আবহাওয়া, তাতেই আমরা মানুষ। পিছিয়ে দেখতে গেলে মনে হয়, এখন মানুষের জীবন অনেক কষ্টের। বলছিলাম, জীবন-ধারণের প্রণালীই বদলে গেছে। বদলটাই সব-সময় উন্নতি নাও হতে পারে।"

১৮৯৯ সালের কথা। তাঁর বয়স তখন ছাব্বিশ। এই সময় তাঁর বিবাহ হয় বাংলা সাহিত্যের বীরবল প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে। প্রমথ চৌধুরী তখন ব্যারিস্টারি পাস ক'রে এসে সবে প্র্যাকটিস আরম্ভ করেছেন। তার উপর তাঁর অগাধ পড়াশুনা এবং প্রবল সাহিত্যানুরাগের কথাও সকলে জানত।

নতুন দেশে নয়, এ এক নতুন জীবনে পদার্পণ ইন্দিরা দেবীর। সকল অবস্থা এবং সকল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার তাঁর কুশল দক্ষতা আছেই। তিনি এই নতুন জীবনের রাশ ধরলেন। নূতন সংসারে এলেন কেবল নববধূ রূপে নয়, বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যস্রষ্টার জীবনসঙ্গিনী রূপে। নূতন সংসারে প্রবেশ করলেন, গৃহস্থালীর সকল বিষয়ে মনোযোগ দিলেন সুগৃহিণীর মত; কিন্তু এর দ্বারা তাঁর জীবন সংসারের পাকে জড়িয়ে গেল না। সংসার চলল সংসারের ধারায়, তিনি সেই ধারায় গা ভাসিয়ে দিয়ে নিজের ব্রত ও সাধনার কথা ভুলে গেলেন না, স্বামীর সাধনার ধারায়ও কোনো

বিঘ্ন ঘটতে দিলেন না। তাঁদের এই বিবাহকে বলা যায় সংগীতের সঙ্গে সাহিত্যের শুভপরিণয়।

ইন্দিরা দেবী তখন নিতান্ত বালিকা, সেই সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই ভ্রাতুষ্পুত্রীকে আশীর্বাদ করে রচনা করলেন কবিতা—'আছে মা তোমার মুখে স্বর্গের কিরণ'। মুখের সেই কিরণ আজ গুণের কিরণ হয়ে চারি দিক উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে তাঁর নিবিড় আত্মীয়তা। এখনো তিনি রবীন্দ্র-সংগীতের স্বরলিপি-রচনায় যৌবনের উৎসাহ নিয়ে সহযোগিতা করে থাকেন; তাঁর কানে গানের রেশ লেগে আছে, সেই রেশ থেকে তিনি তুলে দিচ্ছেন স্বরলিপি।

রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষণে এখনো তিনি উৎসাহী। এখনো তিনি আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের গান শিখিয়ে থাকেন। তিনি এখনো অবসর-সময় পিয়ানো বাজান।

আর আছে আর-একটি কাজ। রবীন্দ্ররচনার তরজমা। রবীন্দ্রনাথের অনেক বাংলা রচনা তিনি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। এক ভাষা থেকে ভিন্ন ভাষায় রূপান্তর করলে ভাব অনেকটা মার খেয়ে যায়। ইন্দিরা দেবী রবীন্দ্রসান্নিধ্যে মানুষ, রবীন্দ্ররচনার সঙ্গে তাঁর আবাল্যপরিচয়, এবং তার উপর ইংরেজিতে তাঁর অসাধারণ দখল— এই ত্রিগুণ মিলে তরজমাগুলি সার্থক হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক সংগীত রচনা করেছেন অ-বাংলা ভাষার গান ভেঙে। রবীন্দ্রনাথকে এ-কাজে ইন্দিরা দেবী সহায়তা করেছেন। ইন্দিরা দেবীর কাছে রবীন্দ্রসংগীতের অনুরাগীরা এজন্যে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। ইন্দিরা দেবীর পিতৃদেব সত্যেন্দ্রনাথের কর্মস্থল ছিল বোম্বাই প্রদেশে। পিতার সঙ্গে তিনি বোম্বাইয়ের বন্দর কারওয়ারে গিয়েছিলেন, সেখানে একদল নর্তকী তাঁদের গান শোনাতে আসে। তাদের কাছ থেকে কয়েকটি কানাড়ী ভাষার গান তিনি শিখে নেন। তাঁরই কণ্ঠ-শ্রুত সুর থেকে রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলি গান রচনা করেছেন, যেমন— 'বড় আশা ক'রে' 'আজি শুভ-দিনে' 'সকাতরে

ওই কাঁদিছে'। বিভিন্ন ভাষার গান ভেঙে রবীন্দ্রনাথের গান-রচনার বিষয়ে তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন।

১৩৫৮ বঙ্গাব্দের ১০ই আষাঢ় (২৫এ জুন ১৯৫১) বিশ্বভারতী সংগীত-সমিতি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির বিচিত্রা-ভবনে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

১৩৬০ বঙ্গাব্দের ১৩ই আষাঢ় (২৭এ জুন ১৯৫৩) কলিকাতাবাসীর পক্ষ থেকে শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ও মানপত্র দেওয়া হয়। ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে শান্তিনিকেতন-মহিলাসমিতি উত্তরায়ণে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন ক'রে তাঁকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন; এবং ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার রবীন্দ্রসংগীতশিক্ষায়তন গীতবিতানের ছাত্রছাত্রী শান্তিনিকেতনের আম্রকুঞ্জে সমবেত হয়ে তাঁকে তাঁর অশীতিবর্ষপূর্তি উপলক্ষে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

ছেলেবেলা থেকেই বিভিন্ন পত্রিকায় অল্পবিস্তর তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়। এর পর সবুজ পত্রেই লেখেন বেশি। বামাবোধিনী পত্রিকা, বঙ্গলক্ষ্মী ও পরিচয়েও তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫৬ সালে তিনি কিছুদিনের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস চ্যান্সেলার) হন।

তাঁর সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভুবন-মোহিনী পদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

১৯৫৭ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তমা' (ডি. লিট.) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

সংগীত ও সাহিত্য, দেশী ও বিদেশী গান, উনবিংশ ও বিংশ শতক—এই তিনটি ক্ষেত্রেই তিনি যেন গ্রহণ করেছেন যোজকের ভূমিকা। আবার এই তিনটি ধারা এসে যেন মিশেছে তাঁরই মধ্যে, তাঁকে করে তুলেছে যেন এই ত্রিধারার যুক্তবেণী।

নীরব ও নিভৃত সাধনাতেই তিনি মগ্ন। এর মধ্যে নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁকে যুক্ত হতে হয়েছে। বেঙ্গল উইমেন্‌স্‌ এডুকেশন লীগ, অল ইণ্ডিয়া

উইমেন্‌স্‌ কনফারেন্স, হিরন্ময়ী বিধবাশ্রম, সংগীত-সম্মিলনী ইত্যাদির তিনি বিভিন্ন সময় প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে বাস করছেন। সেখানে তিনি সংগীতভবনের প্র-নেত্রী ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের তিরোভাবের পর তিনি তাঁরই সাধনার কেন্দ্রে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেছেন। কবির সান্নিধ্য তিনি যেন লাভ করছেন কবির অবর্তমানেও! ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথম চৌধুরী লোকান্তরিত হওয়ার পর তাঁর জাবন একেবারে শূন্য হয়ে যায়। তাঁর জীবন থেকে সংগীত ও সাহিত্য সরে গেল যেন। তাঁরা চলে গেলেন, কিন্তু সংগীত ও সাহিত্যকে সঙ্গীরূপে ধরে রাখলেন ইন্দিরা দেবী। তাঁর পরিণতজীবনের দোসর হয়ে আছে এখন সেই সংগীত ও সাহিত্যই।

রচিত গ্রন্থাবলী

নারীর উক্তি। খ্রী ১৯২০

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম। বঙ্গাব্দ ১৩৬১

রবীন্দ্রস্মৃতি: যন্ত্রস্থ

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

বাংলার স্ত্রী-আচার। বঙ্গাব্দ ১৩৬৩

পুরাতনী। ১৮৭৯ শকাব্দ: বঙ্গাব্দ ১৩৬৪

শ্রীসুনয়নী দেবী

গান ছবি-আঁকা আর কবিতা-রচনা— এই তিনটি শিল্পের মধ্যে কবিতা-রচনাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে দুরূহ শিল্প বলে স্বীকৃত হয়েছে। এর কারণ আছে। গান-শেখার জন্যে ইস্কুল আছে, ওস্তাদ আছে; ছবি-আঁকা শেখার জন্যেও ইস্কুল-কলেজের ব্যবস্থা আছে; কিন্তু কবিতার জন্যে এমন কোনো আয়োজন নেই। কবিতা যিনি রচনা করবেন, তিনি নিজেই নিজের শিক্ষক। কোথায় ভুল হল, কী করলে কবিতাকে আরো উন্নত করা যায়, এর বিচারক কবি নিজে এবং সেই বিচার অনুযায়ী কবি তাঁর কবিতা নিজেই মার্জিত করে নিয়ে থাকেন। এই জন্যই কবির কদর আলাদা।

সুনয়নী দেবী ছবি-আঁকার মর্যাদা বাড়িয়েছেন বলা যায়। তাঁর হাতে পড়ে চিত্রশিল্প কাব্যশিল্পের কদর লাভ করেছে। বললেন, "কারো কাছে কোনো দিন আঁকা শিখি নি। শিখতে ইচ্ছেও যায় নি। আমি যা এঁকেছি, সবই নিজের চেষ্টায়।"

এই জন্যেই তাঁর চিত্রকে মনে হয় এক-একটি কবিতা। তিনি তুলি আর রং দিয়ে যা রচনা করেছেন, তা হয়ে উঠেছে কাব্যের এক-একটি সর্গ।

বাংলার পটুয়ারা, যারা আজ মৃতপ্রায় বলে আমরা আক্ষেপ করছি, কিন্তু যাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে কোনো চেষ্টা করছি নে, সেই পটুয়ারাও কোনো ইস্কুলের পড়ুয়া নয়। তাদের রঙের পাঠশালা ছিল তাদের পারিবারিক পরিবেশটাই। উত্তরাধিকারসূত্রে তারা তাদের এই শিক্ষা লাভ করেছে। হাত ধরে তুলি টানিয়ে তাদের কখনো পট-আঁকা শেখাতে হয় নি। কেবল তুলি টানতে জানলেই অবশ্য তুলির সেই টান শিল্প হয়ে উঠে না। হিসেব করে অঙ্ক কষে যা টানা হল, তা হয়তো একটা উত্তম ড্রয়িং হল; কিন্তু শিল্প হতে হলে বাড়তি যেটা দরকার, তার নাম মন।

সুনয়নী দেবী জন্মাবধি পেয়েছিলেন এমনি একটা মন, যাকে আমরা বলি শিল্পীমন। তাঁর এই মনের মধ্যেই ছিল একটা চিত্রপট, সেই পট ছবিতে

ভরে যেত। বললেন, "রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম, আমার চোখের সমুখে পরিচ্ছন্ন সুন্দর একটা ছবি। কোথা থেকে সে ছবি এসে হাজির হত জানি নে।"

জানার কথাও নয়। কোন্ কবির মনের কোন্ ভাবটি হঠাৎ কেমন করে ঝলকে উঠেও তা কখনো কবির গোচরে থাকে না। সে ভাব like a child from the womb কিংবা like a ghost from the tomb হঠাৎ এসে উপস্থিত হয় এবং হঠাৎই অভিভূত করে কবিকে। সেই অভিভাব কথা হয়ে ব্যক্ত হয় কবির কলম থেকে। যাদের অক্ষরজ্ঞান নেই, যাদের আমরা অশিক্ষিত বলে উপেক্ষা করি, সেই গ্রাম্য বাউলদের মুখ থেকেও আমরা যে-কথা উচ্চারিত হতে শুনেছি, তার ভাবের গভীরতায় বিস্মিত হয়েছি, তারাও তাদের সেই কাব্যময় ভাবময় কথা পেয়েছে কোনো শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে নয়, তাদের মনের কাছ থেকে। তাদের সেই মন তাদের দিয়ে বলায়—

যদি করছ মানা ওগো বন্ধু
মানি এমন সাধ্য নাই।
আমার নামাজ আমার পূজা
গানে গানে চলছে তাই॥
কোনো ফুলের নামাজ রংবাহারে
কারো গন্ধে নামাজ অন্ধকারে
আবার বীণায় নামাজ তারে তারে
আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।

যারা কোনোদিন ভাষা শিক্ষা করে নি, তারা তাদের মনের কথাটা এইরকম আশ্চর্য ভাষায় প্রকাশ করতে পেরেছে। এ ভাষায় কথা বলার জন্যে তাকে চেষ্টা করতে হয় নি, যত্ন করতে হয় নি। এ কথা এসেছে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে।

সুনয়নী দেবীর ছবিও এসেছে ঠিক এইভাবে। এজন্যে তাঁকে ভাবতে হয় নি, প্ল্যান করতে হয় নি, খসড়া করতে হয় নি, মাপজোখ করতে হয় নি। তাঁর মনের ভাবটি ফুটে উঠেছে এক-একটা ছবি হয়ে— রঙে আর রেখায় অপরূপ মূর্তি নিয়ে।

বললেন, "আমার ছবিতে পেন্সিলের কোনো চিহ্ন নেই। কেবল রং আর তুলি।"

পেন্সিল দিয়ে একটা খসড়া এঁকে নিয়ে তার উপর তুলি বুলিয়ে যদি তিনি আঁকতেন তা হলে মাপজোখ ইত্যাদির দিক থেকে হয়তো তা আরো সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ হত, কিন্তু তা সুচারু শিল্প হত কি না বলা শক্ত। সুনয়নী দেবী কোনো দিন ড্রয়িং আঁকেন নি, যা তিনি এঁকেছেন তা শুধুই ছবি— যার নাম চিত্রশিল্প। বাউলদের মতই তাঁর মনের কথাটা হয়তো—

এত রং দেখবি যদি
মিলা মন হৃদয়-নয়নে।

তাই তিনি তাঁর হৃদয়ের নয়নের সঙ্গেই তাঁর মন মিলিয়ে দিয়েছিলেন। এবং এইজন্যেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের ঘোরে তিনি তাঁর এই হৃদয়ের চোখ দিয়েই দেখতে পেতেন তাঁর চোখের সম্মুখে সার বেঁধে এসে দাঁড়ানো একটা রংবাহার— একটা রূপে-রসে-রঙে রঞ্জিত ছবির মিছিল।

বললেন, "সে স্বপ্ন এখনো দেখি। দেখি, কত ছবি এসে দাঁড়িয়েছে আমার চোখের সামনে। ঘুম ভাঙতেই সব কোথায় মিলিয়ে যায়। আর, আর এখন হাতও কাঁপে। ছবি আর আঁকতে পারি নে।"

দোতলার দক্ষিণের বারান্দা: তিনি একটা সোফায় বসে কথা বলছেন। তাঁর অতীত যেন তিনি মন্থন করে চলেছেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বর্তমানের এই বারান্দা অতিক্রম ক'রে চলে গেছে যেন সুদূর শৈশবের দেশে। প্রায় আশী বছর আগের বাংলা দেশের ছবি তিনি যেন দেখতে পাচ্ছেন নিষ্প্রভ ওই চোখের দৃষ্টি দিয়ে।

বললেন, "আমার জন্ম-তারিখটা মনে আছে— ৫ই আষাঢ়। সাল মনে নেই। তবে বয়স হল আটাত্তর। এর থেকেই হিসেব করে নাও। —তাহলে ১২৮২ বঙ্গাব্দই।" অর্থাৎ ১৮ই জুন ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ।

আজ ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ২৪এ আষাঢ়, ১৯৫৩ সালের ৮ই জুলাই। বাইরে রাত্রি নেমেছে। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে হাজরা রোডের পীচের রাস্তায়। সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে তিনি তাঁর আপন-কথা বলছেন।

অতি বালিকা-অবস্থাতেই তাঁর বিবাহ হয়, তখন বয়স মাত্র বারো। তার পর ধীরে ধীরে পুত্রকন্যা হয়। সংসারে জড়িয়ে পড়েন। ছবির স্বপ্ন চোখে লেগে ছিল, কিন্তু সেই স্বপ্ন ধরে এনে তাকে রঙে ফুটিয়ে তোলার সুযোগ তিনি পান নি। বছরের পর বছর ক্রমশ কেটে যেতে থাকে, কিন্তু চোখের স্বপ্ন কাটে না। সে-স্বপ্ন ক্রমেই যেন তাঁকে আরো নিবিড় আশ্লেষে জড়িয়ে ধরতে চায়। অবশেষে একদিন তিনি সেই স্বপ্নকে ধরে ফেলেন রং দিয়ে, তুলি দিয়ে।

বললেন, "ত্রিশ-বত্রিশ বছর বয়সে আমার ছবি আঁকার শুরু। এর আগে ছেলেবেলায় একেবারেই যে আঁকি নি, তা নয়। কিন্তু তাকে ছবি বলা যায় না। খেলার ছলে যেমন সব ছেলেমেয়েরাই কিছু-না-কিছু আঁকে, তেমনি হয়তো আঁকতুম।"

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে তাঁর জন্ম। পারিবারিক প্রভাব তাঁর উপর অবশ্যই পড়েছে। সেখানে দেশী বিদেশী নানা ছবির সংগ্রহ ছিল। তা ছাড়া পারিবারিক পরিবেশটাও ছিল শিল্পী-মনের উপযোগী। তাঁর ছোট পিসিমার ঘরের দেয়ালে নানা দেবদেবীর ছবি ছিল। শিশুকালে এই ছবি তিনি দেখেছেন। শিশুমনের উপর সেই ছবি অবশ্যই দাগ কেটেছিল এবং সেই দাগই স্বপ্ন হয়ে দেখা দিত নানা রকম ছবির মূর্তি ধরে।

সুনয়নী দেবী শিল্পী-পরিবারের কন্যা। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের তিনি ভগিনী। তাঁর পিতা গুণেন্দ্রনাথও ছবি আঁকায় উৎসাহী ছিলেন, তিনি কিছুদিন আর্ট স্কুলে এ-বিষয়ে শিক্ষাও লাভ করেছিলেন। এমন পিতার কন্যা এবং এইরূপ সুযোগ্য ভ্রাতাদের ভগিনী হয়ে তিনি যে চিত্রাঙ্কনে পারদর্শিনী হবেন, এটা কিছু আশ্চর্যের নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, তিনি ইস্কুল-কলেজে গিয়ে অঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা তো করেনই নি, এমন-কি তাঁর শিল্পী ভ্রাতাদের কাছ থেকেও কোনো নির্দেশ বা পরমর্শ নেন নি। তিনি সম্পূর্ণ নিজের উপর নির্ভর করে নিজের খেয়াল এবং খুশি অনুযায়ী এঁকে গেছেন।

অবনীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ ক'রে বললেন, "একবার ছোড়দা মাপজোখ সম্বন্ধে আমাকে অবশ্য বলে দিয়েছিলেন।"

সুনয়নী দেবী কারো কাছ থেকে অঙ্কনশিক্ষা করেন নি, তাঁর ছবিতে কৃত্রিমতা তাই নেই এতটুকু। হৃদয়ের চোখ দিয়ে তিনি তাঁর ছবি যেমন দেখতে পেতেন, অবিকল তাই তিনি ফুটিয়ে তুলতেন। ঘষে-মেজে পালিশ করে জৌলুশ বাড়ানোয় তাঁর মন ছিল না। এই জন্যেই তাঁর ছবি চিত্র-রসিকদের মন এত সহজে হরণ করেছে।

বললেন, "ছবি আঁকতাম। অনেক সময় নিজেরই তা পছন্দ হত না। অর্ধনারীশ্বর ছবিটা এঁকে ভালো লাগল না, ফেলে দিতে যাচ্ছিলাম, দাদা (গগনেন্দ্রনাথ) সেটা আমার কাছ থেকে নিয়ে নেন। পরে ছবিটার যখন নাম হল তখন বুঝলাম, তা হলে আঁকা ভালোই হয়েছিল।"

একে আত্ম-অবিশ্বাস হয়তো বলা যায় না, এটা আত্ম-অতৃপ্তি। এই অতৃপ্তিটাই প্রকৃত শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। শিল্পী যেদিন নিজের কাজে পরিতৃপ্ত হয়, সেই দিনই শিল্পীর অবনতি ঘটে এবং বলা যায় শিল্পীর মৃত্যু সেই দিনই।

সুনয়নী দেবীর চিত্র খাঁটি দেশী ভাবের চিত্র। আমাদের দেশের দেবদেবীর ছবিই তাঁর চিত্রের প্রধানতম বিষয়। কিন্তু তাঁর ছবির দিকে সর্বপ্রথম যিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি একজন বিদেশিনী— স্টেলা ক্রামরিশ। ১৯২১-২২ সালের কথা, তখন সর্বপ্রথম সুনয়নী দেবীর ছবি প্রকাশিত হয়। স্টেলা ক্রামরিশ তাঁর ছবির উপর প্রবন্ধ লেখেন ছবির পদ্ধতি বিচার করে এবং শিল্পীর প্রশস্তি করে।

বাঙালী পরিবারের অন্তঃপুরের নেপথ্যে বসে তাঁর শিল্পসাধনা। মনের খুশিতে তিনি ছবি আঁকতেন, কাউকে খুশি করার জন্যে নয়, কিংবা কারো প্রশংসা পেয়ে খুশি হবার জন্যেও নয়। তিনি কখনো আশা করেন নি তাঁর আঁকা এইসব ছবি কারো কোনোদিন ভালো লাগবে, অথবা কেউ এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হবে।

নিজেকে খুশি করতে গিয়ে তিনি আর-পাঁচ জনকে খুশি করে দিলেন। এটা তাঁর বাড়তি লাভ। অন্তঃপুরের আড়ালে বসে তিনি নিজেকে নিয়েই নিজে বিভোর ছিলেন, তাঁর বিভোরতার সেই বেড়া ভেঙে দিলেন স্টেলা

ক্রামরিশ। বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হল সুনয়নী দেবীর ছবি এবং সেই সঙ্গে পরিচিত হলেন সুনয়নী দেবীও।

ভিতর-বাহির এবার হয়ে গেল একাকার। বাইরের আলো এসেও পৌঁছল অন্দরের নিভৃতে। তিনি নানা দেশে নানা রকম ছবি দেখতে লাগলেন। কিন্তু বাইরের সেই আলো প্রতিফলিত হয়ে উঠল না, তাঁর উপর কোনো প্রভাবই পড়ল না সেসব ছবির। তাঁর নিজস্ব ধারা বজায় রইল।

মন যখন পরিণত হয়েছে, অঙ্কনের একটা পদ্ধতি যখন তাঁর আয়ত্তে এসে গেছে, তখন আর কোনো প্রভাবেই প্রভাবান্বিত হবার কথা নয়। তা ছাড়া তাঁর দুই ভ্রাতা গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ যখন তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি, তখন আর-কোনো প্রভাবেই তিনি পরাভূত হবেন না— এটা ধরে নেওয়া যায়।

বললেন, "নকল করে আঁকার চেষ্টা করেছি অনেক আগে। মাসিক পত্রিকায় ছাপা ছবি দেখে দেখে আঁকতাম। কিন্তু সেগুলি কিছু হত না। এ ছাড়া ভালো লাগত রবি বর্মার ছবি—কিন্তু তা দেখে আঁকার চেষ্টা করি নি। সে আমলে ঐ ছবি দেখতে খুব ভালো লাগত।"

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর ভগিনীর অঙ্কন দেখে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। তাই তিনি সুনয়নীর কোনো ছবি সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করেন নি। তিনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই ছবি একদিন নিজেই নিজেকে পরিচিত করতে পারবে।

সুনয়নী দেবী বললেন, "একবার আমি একটা ছবি এঁকে ছোড়দাকে দেখিয়ে কেমন হয়েছে জানতে চাই। তিনি কিছু বলেন না। পরে অনেককে বলতেন —সুনয়নীকে আমি সার্টিফিকেট দিই নি, ওর সার্টিফিকেট ও নিজেই নিয়েছে।"

তাঁর ভালো লাগে জাপানী ও চীনা চিত্র। অন্য কোনো বিদেশী চিত্র তাঁর তত ভালো লাগে না।

ছবি তিনি এঁকেছেন অনেক। এক সময় এক-এক দিনে এক-একটা ছবি শেষ করতেন। আট-দশ বছর হল আর আঁকেন না। এখন আঁকা একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন।

তাঁর পাশেই বসে ছিল সাত-আট বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে। তাঁর নাতনি —অনিন্দিতা। সে অস্ফুটে আপত্তি জানিয়ে উঠল।

সুনয়নী দেবী হেসে উঠলেন, "হ্যাঁ। ক'দিন আগে ওর খাতায় একটা ছবি এঁকে দিয়েছিলাম বটে।"

অনিন্দিতা লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল। সুনয়নী দেবী হাসতে লাগলেন। বললেন "আঁকা একেবারে বন্ধ। কিন্তু চোখে এখনো স্বপ্ন লেগে আছে।"

হয়তো এটা তাঁর আক্ষেপের সুর। যে চিত্র স্বপ্ন হয়ে চোখে এসে ধরা দিচ্ছে সেই চিত্রকে তুলি দিয়ে ধরার মত শক্তি নেই তাঁর হাতে, হাতের আঙুলে। তাঁর হাতের আঙুলগুলো কেঁপে উঠল, যেন তারাও কিছু বলতে চায়।

বললেন, "এগজিবিশনে আমার ছবি বার-কয়েক দেখানো হয়েছে। ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির এগজিবিশনে আমার দাদাদের ছবির সঙ্গে আমার ছবি অনেকবার দেখানোর ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া বিলেতেও একবার দেখানো হয় ১৯২৬ সালে। আমার সেজছেলে বিলেত যাবার সময় আমার কয়েকটা ছবি নিয়ে গিয়ে সেখানে প্রদর্শনী করে। শুনেছি, সেখানে সবাই সুখ্যাতি করে। একটা ছবি সেখানে বিক্রীও হয়— সেটা হচ্ছে ভগবতীর ছবি।"

মাদ্রাজের আর্ট গ্যালারি, ত্রিবাঙ্কুর ও লখনউতে তাঁর আঁকা কতকগুলো ছবি আছে। এ ছাড়া আরও অনেক জায়গাতে অবশ্যই আছে, কিন্তু তিনি তার সব খোঁজ জানেন না। তবে মনে পড়ছে তাঁর একটা ছবির কথা, সে ছবিটার নাম দিয়েছিলেন 'দান'। সে ছবিটা রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো লাগে, তিনি সেটা নিয়ে যান, কিছুদিন পরে সে ছবিটা বিচিত্রায় প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ এই ছবি অবলম্বন করে একটি বড় কবিতাও রচনা করেন।

রাধা আর কৃষ্ণ, ভগবতী ও অর্ধনারীশ্বর— সুনয়নী দেবীর ছবির এই সবই হচ্ছে সাবজেক্ট। তিনি ল্যাণ্ডস্কেপ বা অন্য কোনো ছবি আঁকায় হাত দেন নি।

কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে তিনি তার উপর ছবি আঁকতেন। ছবি আঁকতে হলে কাগজ যে ভিজিয়ে নেওয়া দরকার হয়, এটা তিনি জানলেন কী করে?

বললেন, "এটা জেনে নিয়েছিলাম ছোড়দার কাছে।"

একটু থেমে বললেন, "আমি নিজেই বুঝতে পারতাম না, আমার হাত দিয়ে ছবি বের হচ্ছে কী করে। কাগজ ভিজিয়ে নিয়ে আঁকতে বসতাম। দেখতাম, ছবির চোখমুখ সব যেন আপনিই ফুটে বার হচ্ছে।"

এ বিস্ময় সুনয়নী দেবীর একার নয়, এ বিস্ময় প্রায় সকলেরই। যিনি কোনোদিন কারো কাছে শিক্ষা নিলেন না, কারো উপদেশ পরামর্শ বা নির্দেশ নিলেন না, যিনি কেবল নির্ভর করে রইলেন নিজেরই উপর— তাঁর হাত দিয়ে এইসব প্রাণস্পর্শী চিত্র বের হল কী করে? এই রকম ঘটনার জবাবস্বরূপই হয়তো রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—

যে পারে সে আপনিই পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

অনেক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে, অনুশীলনের পর অনুশীলন করেও কতজনকে ব্যর্থ হতে হয়েছে, কিন্তু যার মনের নিভৃতে জমানো আছে পরম ঐশ্বর্য, মুক্তহস্তে দান কেবল তার দ্বারাই সম্ভব; এবং এই দানই হয়ে ওঠে এক-একটি কবিতা ও তা কবিরও কাব্যের প্রেরণা জোগায়।

কেউ এসে তাঁকে বলেছে যে তাঁর ছবি তাঁরা দেখেছেন অন্যত্রও। এলিফ্যাণ্টার অর্ধনারীশ্বর-মূর্তির সঙ্গে তাঁর অর্ধনারীশ্বরের নাকি অদ্ভুত মিল; আবার কেউ বলেছেন, অজন্তার গুহাচিত্রের সঙ্গে তাঁর ছবির সাদৃশ্য বিস্তর। আশ্চর্য হয়েছেন সুনয়নী দেবী। যা তিনি তাঁর মনের স্বপ্ন দিয়ে ধরেছেন, তার সঙ্গে এমন মিল ওদের হল কী করে?

কিন্তু সুন্দর সর্বদা সুন্দরই, যেমন সত্য সর্বদা সত্যই। তার ইতরবিশেষ হবার কথা নয়। শিল্পীরা সুন্দরের আরাধনা করেছেন, সে সুন্দরের বেশ একই রকম। তাই সুন্দরের সঙ্গে সুন্দরের মিল হয়ে গেছে। ভারতীয় সাধনার ধারার সঙ্গে সুনয়নীর অন্তরের যে যোগ আছে, এই ঘটনা তারও প্রমাণ।

কথা শেষ হল। নমস্কার করে উঠে দাঁড়ালাম। নীচে নামবার সিঁড়ির দু পাশে সার সার ছবি— ছবির মিছিল। মনে হল, সুনয়নী দেবীর চোখের স্বপ্নরা এখানে এসে যেন সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে আছে।

শ্রীসরলাবালা সরকার

জীবনে সার্থকতা অর্জনের প্রথম সূত্র হচ্ছে শ্রদ্ধা। প্রকৃতপক্ষে জীবনের সফলতা অর্জনের মূলসূত্রও এই— শ্রদ্ধা। পরদেশকে অশ্রদ্ধা না করে নিজের দেশের ও দশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা যার হৃদয়ে আছে, সেই সার্থক ; এবং এইরূপ জীবনের সাধনাই সবরকম কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হয়ে পরিশুদ্ধ জীবনের রূপে দেখা দেয়।

যে গাছ মাটির রস থেকে বঞ্চিত হয় সে গাছকে কেবল আলো আর হাওয়া দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা যায় না। যদি-বা তা যায়, কখনোই তা বিরাট মহীরুহ হয়ে উঠতে পারে না, তার শাখাপ্রশাখার স্নেহ বিস্তার ক'রে সে কখনোই পথচারীকে ছায়া দিতে পারে না। মাটির রস থেকে বঞ্চিত যে চারা, পৃথিবীতে তার কোনো স্বাক্ষর নেই, তার পরিচয়ও নেই।

শ্রীসরলাবালা সরকার জীবনের প্রথম থেকে স্বদেশের মাটির সঙ্গে নিবিড় সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাঁর জীবনের মূল এই দেশের মাটি থেকে রস সঞ্চয় করেছে এবং বাহির-বিশ্বের আলো ও হাওয়া দিয়ে পাতাপল্লবের সবুজ সম্ভার অর্জন করতে পেরেছে। এইজন্যেই তার জীবন একাধারে সার্থক ও সফল।

যে বাংলাদেশের মেয়েদের লেখাপড়া শেখাটা ছিল একটা অপরাধ, তিনি সেই উনিশ শতকের বাংলাদেশের মেয়ে। মেয়েরা তখন ছিল ঘরের পুতুলমাত্র। কিন্তু সেই পরিবেশের মধ্যে জীবনযাপন করেও তিনি কোনো-প্রকার বিপ্লব বা বিদ্রোহ না করে পরম নিরিবিলিতে কেবল নিজের মনের ঐকান্তিক আগ্রহেই নিজেকে শিক্ষিত ও মার্জিত করে তুলতে পেরেছেন। আরও বিস্ময়কর এই যে, ঘরের কোণের সেই মেয়ের মনের মধ্যে দেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ আপন মনেই সঞ্চিত হয়ে উঠতে থাকে। মনে হয়, তাঁর দেশপ্রীতি ও সাহিত্যানুরাগ তিনি পেয়েছেন তাঁর পিতামহী রাসসুন্দরীর কাছ থেকে।

রাসসুন্দরী আজ থেকে দেড় শ বছর আগে এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন, যাঁর জীবনে লেখাপড়া শেখার কোনো সুযোগ ঘটে নি, যিনি নিজের

চেষ্টায় নিজেকে গঠন করে নিয়েছিলেন, সেই অতি পুরাতন বাংলার একজন পুরস্ত্রী তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন' গ্রন্থে লিখেছেন—

'এই ভারতবর্ষে আসিয়া আমি অনেকদিন পর্য্যন্ত বাস করিলাম।...১২১৬ সালে আমার জন্ম হইয়াছে। এইক্ষণ ১৩০৪ সাল আমার বয়ঃক্রম ৮৮ বৎসর হইয়াছে। এত দীর্ঘকাল আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। ভারতবর্ষে অনেক দিন বাস করা হইল, এখন কি যাইতে হইবে কি থাকিতে হবে তাহার নির্ণয় নাই।'

বাংলার গদ্য যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে নি তখনকার লেখা এই প্রাঞ্জল বাংলা গদ্য দেখলে যেমন আশ্চর্য বোধ হয়, একজন সাধারণ বঙ্গললনার পক্ষে নিজেকে একজন ভারতবর্ষীয় বলে পরিচয় দেওয়াও ঠিক ততটাই বিস্ময়কর।

সরলাবালা সাহিত্যানুরাগ ও দেশপ্রীতি উভয়ই তাঁর পিতামহীর কাছ থেকে পেয়েছেন বলে মনে হয়। তাঁর পিতামহীর জীবনের সঙ্গে তাঁর জীবনের মিল বিস্তর। সরলাবালাও রাসসুন্দরীর মতই নিজেকেই নিজে নির্মাণ করেছেন।

বললেন, "ইস্কুলে পড়ি নি কোনোদিন। ঘরে বসেই আমাদের বিদ্যাচর্চা। মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, এ রেওয়াজ তখন ছিল না।"

তাঁর জীবনের প্রথম পাঠ তিনি পেয়েছেন পিতা কিশোরীলাল সরকারের কাছে। পরবর্তী জীবনের বিদ্যাভ্যাস জ্যেষ্ঠাগ্রজ ডাক্তার সরসীলাল সরকারের কাছে। বললেন, "দাদা মুখে মুখে গল্প করে আমাকে শেখাতেন। ডারউনের থিয়োরি থেকে আরম্ভ করে কত কি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কথা তিনি বলে যেতেন, আমি একমনে বসে বসে তাই শুনতাম।—যেটুকু জেনেছি বা যেটুকু শিখেছি তা দাদার আগ্রহেই।"

১২৮২ বঙ্গাব্দের ২৫এ অগ্রহায়ণ (খ্রীষ্টীয় ১৮৭৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর) তারিখে সরলাবালা জন্মগ্রহণ করেন। "গোয়াড়ি কৃষ্ণনগরে কাঁঠালপোতা নামক পল্লী আমার জন্মস্থান। কাঁঠালপোতার বাড়ি আমার জ্যাঠামহাশয়ের বাড়ি। জ্যাঠামশায় নদীয়ার ডিস্ট্রীক্ট ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন, আর এখানেই বাড়ি করে বাস করেছিলেন। তখন সব একান্নবর্তী পরিবার। ভাইয়েরা কার্যগতিকে নানা

স্থানে বাস করতেন বটে, কিন্তু আলাদা ব'লে কিছু ছিল না। আমার ঠাকুরমা ও পিসিমা অনেক সময় কাঁঠালপোতাতে থাকতেন।"

শৈশবের সেই স্মৃতির কথা তাঁর এখনো মনে পড়ে, এখনো সেই কাঁঠালপোতা তাঁর মনকে অধিকার করে বসে আছে। বললেন, "সেই বাড়ি, সেই পথ, সেই নিকিরিপাড়া, সেই বৈষ্ণবপাড়া, ভাদ্র ও আশ্বিনে সেই পানিফলের ঝুড়ি-মাথায় নিকিরি মেয়ের দল, ময়রাদের সেই সরপুরিয়া সরভাজা ও কাঁচাগোল্লার হাঁড়ি নিয়ে বাড়ি বাড়ি ফিরি করা—এখন সে যেন এক স্বপ্নের স্মৃতি।"

ছোট একটি গ্রামের প্রতি এই টান বৃহত্তর হয়েই উত্তরজীবনে নিজের স্বদেশের প্রতি নিজের মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। তাই সাহিত্যসাধিকা সরলাবালাকে আমরা পেয়েছি দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের নেপথ্য প্রেরণাদাত্রীরূপে।

বললেন, "আজ মানবেন্দ্র রায় অন্তদিকে চলে গেছে। বাঘা যতীনও আজ আর নেই। কিন্তু তারা এসে আশ্রয় নিত আমার কাছে। তারা তখন বাংলার বিপ্লবী। তারা আমাকে মা বলে ডাকত— কেবল ডাকা কেন, মায়েরই মত মনে করত। সে এক লম্বা কাহিনী। ঘাটশীলায় গিয়েছিলাম তখন নরেন (মানবেন্দ্র) আমাকে যে ভাবে শুশ্রূষা করেছে আর সেবা করেছে, তা কখনো ভোলবার নয়। আমার দাদাও ছিলেন মনে-প্রাণে বিপ্লবী ও বিপ্লবীদের পৃষ্ঠপোষক। আর সুরেশ (সুরেশচন্দ্র মজুমদার) এদেরই দলভুক্ত ছিল। এই সর্বত্যাগী বিপ্লবী ছেলেরা এরাই ছিল আমার উপাস্ত বালগোপাল। 'দুখিনীর ধন' কবিতায় এদের কথাই লিখেছিলাম, কবিতাটি 'নারায়ণ' পত্রিকায় ছাপা হয়। কিন্তু পত্রিকাখানি খুঁজেয় পাই নি। স্মৃতি থেকে আমার 'অর্ঘ্য' বইতে দিয়েছি। নলিনীকান্ত সরকার আনন্দবাজার পত্রিকায় এই কবি তাটির উল্লেখ করেছেন।"

সরলাবালা তাঁর জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর পিতামহীকে এবং সেই আদর্শ অনুসরণ করে চলার পথে প্রেরণা ও উৎসাহ পান তাঁর দাদার কাছ থেকে। তাঁর দাদার স্বদেশপ্রাণতার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যানুরাগও ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, সরসীলাল চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একজন বিজ্ঞানী হয়েও সাহিত্যব্রতেও ব্রতী ছিলেন—'রবীন্দ্রকাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা' 'পল্লী-সংস্কার' ও 'স্বপ্নচৈতন্য' নামে কয়েকটি পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন।

আজ ১৯৫৩ সালের ২৩এ জুলাই, ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ৭ই শ্রাবণ। সন্ধ্যা গড়িয়ে গিয়েছে। শ্যামবাজারের বাড়ির দ্বিতলে বসে সরলাবালার জীবনের কাহিনী শুনছি। তাঁর স্মৃতিশক্তির কথা আগে শুনেছি। তাঁর কথা শুনে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। সত্তর বছর আগের ঘটনাও অবিকল তাঁর মনে আছে। তিনি অতি সহজে এবং অনায়াসে একের পর এক বলে চলেছেন তাঁর বাল্যকালের কথা।

বললেন, "ছেলেবেলাটা আজ বড় মধুর লাগছে। বাগবাজারে মাতুলালয়ে কি আনন্দেই আমাদের কেটেছে। একান্নবর্তী পরিবার, এক বাড়িতে কত লোক কত ছেলেপিলে। দুই নম্বর আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, এখন যেখানে যুগান্তর অফিস হয়েছে, সেই বাড়িতে আমার সেজমামীমা মস্ত এক থালায় ভাত মেখে নিয়ে বসতেন, আমরা চারদিকে বসতাম গোল হয়ে, তিনি সকলকে খাইয়ে দিতেন। বাংলাদেশের এই পারিবারিক প্রথাটা আজ ভেঙে গেছে।"

একটু থেমে বললেন, "ঈশ্বরের প্রতি আমার মায়ের অনুরাগ ছিল খুব। একদিন—

যবে নব অনুরাগ
আমার হৃদয়ে দিল দাগ

কীর্তন গানটি করতে করতে ঐ বাড়ির কাঠের সিঁড়িটার উপর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সিঁড়িটা হয়তো এখনও আছে।"

আছে। আছে সেই সিঁড়ি এবং সেই স্মৃতি। কিন্তু যাদের নিয়ে সেই সুমধুর বাল্যকালটা নিবিড় বন্ধনে বাঁধা ছিল, তারা সবাই আজ নেই। এজন্যে যেন কোনো আক্ষেপ নেই সরলাবালার। তিনি এ নিয়মটা অক্লেশেই যেন মেনে নিয়েছেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ম বদলায়, রীতিও বদলায়। এই পরিবর্তনকে প্রসন্ন-মনে গ্রহণ করার মত মনের উদারতা তাঁর আছে, তাঁর কথায় এর প্রমাণ পাওয়া

যায় এবং এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচনাতেও। তিনি পুরাতনকে অস্বীকার না করেও নূতনকে স্বীকার করে নিতে জানেন। পরদেশকে অশ্রদ্ধা না করেও যেমন নিজের দেশের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা তাঁর আছে। নিজের দেশের মাটির রস এবং বাহির-বিশ্বের আলো ও রৌদ্র দিয়ে তিনি যেন নিজের জীবনকে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। টবের গাছ রোদে-জলেও মনের মত বড় হয় না, কেননা তার শিকড় বাঁধা-সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সরলাবালা তাই জীবনের সমস্ত সংকীর্ণতা পরিহার করে জীবনকে চারদিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন। স্বল্পপরিসরের মধ্যে তিনি জীবনকে বেঁধে রাখেন নি। তাই তিনি প্রাচীনা হয়েও আধুনিকা।

অতি অল্প বয়স থেকেই তাঁর কাব্যানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। দশ-এগারো বছর বয়সেই তিনি কবিতা রচনা আরম্ভ করেন। প্রায় এই সময়েই ১২৯৪ সালে বারো বৎসর বয়সে রায়বাহাদুর মহিমচন্দ্র সরকারের পুত্র শরৎচন্দ্র সরকারের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের পরেই তাঁর কবিতা-রচনার উৎসাহ দেখা দেয় বেশি।

হেসে বললেন, "আমার স্বামীর সাহিত্যানুরাগ ছিল। তাঁর সঙ্গে যখন দেখা হবে, তার আগে যেন এক খাতা ভর্তি কবিতা লেখা শেষ করতে পারি এই উৎসাহে পাতার পর পাতা লিখে যেতাম। এইভাবে অনেক খাতাই তখন লিখেছি। সুরেশ সমাজপতির সঙ্গে আমার স্বামীর পরিচয় ছিল, এই সূত্রে সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকায় গল্প ও কবিতা লিখেছি অনেক।"

কিন্তু হঠাৎ তাঁর জীবনে নেমে আসে বিষাদ। ১৩০৫ সালের কার্তিক মাসে তাঁর বৈধব্য ঘটে ; কিন্তু এতে তাঁর সাহিত্যানুরাগ প্রগাঢ়তরই হয়।

সরলাবালার প্রথম মুদ্রিত রচনা সম্ভবত ১২৯৭ সালের ভারতী ও বালক পত্রিকায় 'লজ্জাবতী' নামক কবিতা সাহিত্য পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত হয় এর দু বছর পরে ১২৯৯ সালে। এ ছাড়া প্রদীপ উৎসাহ জাহ্নবী উদ্বোধন অন্তঃপুর সুপ্রভাত প্রবাসী ভারতবর্ষ ইত্যাদি পত্রিকায় নানা সময় তাঁর অনেক কবিতা প্রবন্ধ ও গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এখনো, এই বৃদ্ধ বয়সেও, তাঁর রচনার শক্তি কমে নি, উৎসাহও স্তিমিত হয় নি। তিনি এখনো নিয়মিতভাবে রচনায় ব্যাপৃত

আছেন আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকায় এখনো তাঁর রচনা প্রকাশিত হচ্ছে।

আটাত্তর বৎসর বয়স হয়েছে এখন। কিন্তু জরায় তিনি জীর্ণ নন। এখনো কর্মশক্তি এবং প্রফুল্লতা তাঁর আছে। নিজের কথা নয়, বাল্যকালের নানা ঘটনার কথা বলতে তাঁর বিশেষ উৎসাহ। এই রকম অনেক গল্প বলতে বলতে তিনি বললেন তাঁর মামার কথা। বললেন, "আমার সেজমামা অমৃত-বাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা শিশিরকুমার ঘোষ শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত রচনা করেন। তিনি নিজেব হাতে ঐ বই লেখেন নি। ঘরে পায়চারি করতেন আর মুখে বলে বলে যেতেন, আমরা লিখতাম। বিরাট বই, ছয়টা খণ্ড। বছর তিন লেগেছিল শেষ করতে। আমরা তখন খুব ছোট। তিনি বলতেন, আমরা লিখতাম। একটু ভুল হলেই পিঠের উপর এমন কীল মারতেন—ভীষণ লাগত।"—বলেই তিনি হেসে উঠলেন, মনে হল, সে-লাগাটা যেন ব্যথা লাগা নয়, মজা লাগা।—"তখন কত তালপাতার পুঁথি যে আমরা ঘেঁটেছি তার ঠিক নেই। তার থেকে অনেক নকলও আমাদের করতে হয়েছে।"

এইটেই হয়তো তাঁর সাহিত্যানুশীলনের প্রথম পাঠ। জীবনে এই রকম সুযোগ ঘটেছিল ব'লে তিনি যেন গৌরবান্বিত। অন্তত তাঁর কথা শুনে এমনিই মনে হল।

শ্রীঅমিয়-নিমাই-চরিত নাম দিয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবর্ণনা করে তাঁর মাতুল সরলাবালার মনের মধ্যে যে অনুরাগের দাগ রেখে গেছেন, ঠিক এই দাগের কথাই কীর্তন-গানের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত করতে গিয়ে সরলাবালার মাতৃ-দেবী ঐ গৃহেরই কাঠের সোপানের উপর একদিন মূর্ছিতা হয়েছিলেন। এই ভাবে সরলাবালার জীবনে ভক্তির ও শ্রদ্ধার বীজ উপ্ত হয়। সেই শ্রদ্ধাকেই তিনি তাঁর জীবনের মূলসূত্র বলে গ্রহণ করতে পেরেছেন এবং এইজন্যেই তাঁর জীবন আজ সার্থক।

রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সরলাবালার পিতৃবন্ধু। রাজনারায়ণ মাঝে মাঝে দেওঘরে তাঁদের বাড়িতে আসতেন। সরলাবালার কবিতা তখন

'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। রাজনারায়ণ সেসব কবিতা দেখেছেন, পড়েছেন, এমন-কি তাঁর মুখস্থও, কিন্তু সেসব যে তাঁরই বন্ধুকন্যার রচনা তা জানতেন না। বললেন, "তখন কবিতা-লেখা অপরাধ বলেই মনে হত। একদিন বাবা ডাকলেন, গেলাম। আমার বয়স তখন পনের-ষোল। রাজ-নারায়ণবাবু আমাকে দেখে বিশ্বাসই করতে চাইলেন না যে, সে সব কবিতা আমার লেখা। ভারি আশ্চর্য্য লেগেছিল তাঁর।"

যাঁকে তিনি তাঁর জীবনের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছেন, সেই ঠাকুরমার কথায় এসে গেলেন আবার, বললেন, "আমি কতবার ঠাকুরমাকে দেখেছি এবং তাঁর সঙ্গে দিনরাত একত্রে থেকেছি; সেই দেবীদুর্লভ মূর্তি মনে মনে অঙ্কিত হয়ে আছে। সমস্ত রাত্রি ঠাকুরমা বুকের উপর মালা রেখে বিছানায় শুয়ে মালা জপ করতেন। ১৩০৩ কি ১৩০৪ সালে যখন একবার কাঁঠালপোতার বাড়ি যাই, যখন ঠাকুরমা পা ভেঙে শয্যাগত ছিলেন। এই আমার তাঁকে শেষ দেখা।"

ঠাকুরমাকে এই তাঁর শেষ দেখা হলেও সে দেখার শেষ হয় নি। এখনো তিনি সরলাবালার চোখের সম্মুখে যেন বিরাজ করছেন। তাঁর ঠাকুরমার 'আমার জীবন' গ্রন্থের ভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

'এ গ্রন্থখানি একজন রমণীর লেখা; শুধু তাহা নহে, ৮৮ বৎসরের একজন বর্ষীয়সী প্রাচীনা রমণীর লেখা। তাই বিশেষ কুতুহলী হইয়া আমি এই গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হই। মনে করিয়াছিলাম যেখানে কোন ভাল কথা পাইব, সেইখানে পেন্সিলের দাগ দিব। পড়িতে পড়িতে দেখি, পেন্সিলের দাগে গ্রন্থ-কলেবর ভরিয়া গেল।'

সরলাবালা দেবীর রচনা সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই প্রযোজ্য। তাঁর বয়সও এখন ৭৮, কিন্তু তাঁর রচনা পাঠ করলে বোঝা শক্ত হয় যে, সে রচনা কোনো প্রাচীনার। তাঁর ভাষা এমনি সহজ সরল প্রাঞ্জল এবং এমনি আধুনিক। বাগবাজার বাড়ির কথা, কাঁঠালপোতার বাড়ির কথা এবং ঠাকুরমার কথা তিনি এমনি সাবলীল ভাষায় বিবৃত করে কাহিনী রচনা করেছেন, বস্তুতপক্ষে সেগুলি যেন কাহিনী নয়, এক-একটা কথাচিত্র।

গ্রন্থাকারে তাঁর কয়েকটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া বিস্তর রচনা সাময়িক পত্রিকার পাতায় পাতায় ছড়ানো আছে। বললেন, "তার আর সংখ্যা নেই। বলা যায় স্তুপাকার। প্রবন্ধ গল্প কবিতা রাশি রাশি।"

নিজের এই লেখার কথা বলতে গিয়েই তাঁর মনে পড়ল তাঁর এক সমসাময়িক ও সমবয়সী লেখিকার কথা— সুরূপা দেবী, ইনি অনুরূপা দেবীর দিদি। দেওঘরে সুরূপা দেবীর সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়। বললেন, "নিজের নামে তিনি লেখেন নি। ইন্দিরা দেবী নামে লিখতেন। অল্প বয়সেই মারা যান।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ১৯৫৩ সালের জন্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ লেকচারার নির্বাচন করেন। ইতিপূর্বে কোনো মহিলা এই সম্মানে ভূষিত হন নি। সরলাবালা এই বক্তৃতামালায় বঙ্গের তিনজন কবির সম্বন্ধে আলোচনা করেন—দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অ্যানি বেসান্ত ও ভগিনী নিবেদিতা— এই দুইজন বিদেশিনীর কথা বলে তিনি তাঁর কথা সাঙ্গ করলেন। এঁদের তিনি দেখেছেন খুব কাছে থেকে। তাঁর শ্বশুরমশায় আরায় প্রথম মুন্সেফ হয়ে গিয়েছেন, তিনিও গেছেন আরায়। অ্যানি বেসান্তও আরায় এসেছেন, সেখানে শ্রীমতী বেসান্তও এক বিরাট সভায় হিন্দুধর্মের মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বেসান্তের অনুরক্ত ভক্তরা বেসান্তের নাম দিয়েছিলেন—আন্না-বাসন্তী দেবী।

বললেন, "আর দেখেছি নিবেদিতাকে। খুব ভালো করে দেখেছি। দেখে মোহিত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি। মনে পড়ে বাগবাজারের পূজামণ্ডপে তিনি এলেন— খালি পা। এই দৃঢ়ব্রতা সন্ন্যাসিনীর নিষ্ঠা ঐকান্তিকতা সদাচার দেখে জীবনে বিমল আনন্দ লাভ করেছি। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়েছে। এক বিদেশিনী আমাদের যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন, তা যদি আমরা প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে পারতাম, তা হলে আমাদের দেশের চেহারাই বদলে যেত। জীবনে যদি কাউকে শ্রদ্ধা করতে না পারি, তা হলে লোকের শ্রদ্ধা পাব কি করে? নিবেদিতার জীবনটাই ছিল শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ, তাই তিনি সকলের শ্রদ্ধেয়া।"

রাত্রি অনেক হয়েছে। দূরের রাস্তা থেকে একটি বিক্ষুব্ধ জনতার কোলাহল ভেসে আসছে। নীচে নেমে এলাম। কোলাহলের পথ এড়িয়ে ভিন্ন রাস্তা ধরে হাঁটা দিলাম।

রচিত গ্রন্থাবলী

প্রবাহ। শোককাব্য। খ্রী ১৯০৪
নিবেদিতা। জীবনী। খ্রী ১৯১২
চিত্রপট। গল্প। খ্রী ১৯১৭
কুমুদনাথ। জীবনী। খ্রী ১৯৩৮
অর্ঘ্য। কাব্য। খ্রী ১৯৫১
মনুষ্যত্বের সাধনা। প্রবন্ধ। খ্রী ১৯৫৩
হারানো অতীত। খ্রী ১৯৫৪
সাহিত্য-জিজ্ঞাসা। খ্রী ১৯৫৭
স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ। খ্রী ১৯৫৭
গল্পসংগ্রহ। খ্রী ১৯৫৭

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

এককথায় বলতে গেলে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া হচ্ছে ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নৈমিষারণ্য। সারা ভারতের মধ্যে এত ব্রাহ্মণের সমাবেশ আর কোথাও নেই। কেবল ব্রাহ্মণবংশে জন্মলাভ করার অধিকারেই ব্রাহ্মণ নন, তপস্যা শাস্ত্রজ্ঞান এবং ব্রাহ্মণবংশে উদ্ভব—এই ত্রিগুণ যাঁর আছে তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। কোটালিপাড়া এইরূপ ব্রাহ্মণেরই সাধনার তপোবন-বিশেষ। পশ্চিমবঙ্গে যেমন ভাটপাড়া ও নবদ্বীপ, পূর্ববঙ্গে তেমনি বিক্রমপুর ও কোটালিপাড়া—এর মধ্যে কোটালিপাডাই সমধিক বিখ্যাত। রামনাথ সিদ্ধান্তপঞ্চানন, জয়নারায়ণ তর্করত্ন, শশিকুমার শিরোমণি, আশুতোষ তর্করত্ন, দ্বারিকানাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি নৈয়ায়িক; নীলকণ্ঠ তর্কবাগীশ, সীতানাথ বিদ্যারত্ন, সীতানাথ বিদ্যাভূষণ, বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি স্মার্ত; কাশীচন্দ্র বাচস্পতি, বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চানন, দুর্গাধন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি বৈয়াকরণ ও পৌরাণিক; কালিদাস বিদ্যাবিনোদ, রেবতীমোহন কাব্যরত্ন প্রভৃতি আলংকারিক; গঙ্গাধর বিদ্যালংকার, হলধর গৌতম প্রভৃতি জ্যোতিষী এক সময় কোটালিপাড়ায় বিদ্যমান ছিলেন।

এই কোটালিপাড়ার মধ্যবর্তী উনশিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীহরিহাস ভট্টাচার্য সিদ্ধান্তবাগীশ।—১২৮৩ বঙ্গাব্দের ৭ই কার্তিক, খ্রীষ্টীয় ১৮৭৬ সালের ২২এ অক্টোবর তারিখে।

হরিদাস একাকীই একটি ইন্‌স্টিটিউশন। যে কাজ করার জন্যে ইতিপূর্বে বহু অর্থব্যয়ে বহু পণ্ডিত নিয়োগ ক'রে বহু বৎসর ধ'রে চেষ্টা করা হয়েছে, হরিদাস কারও আর্থিক বা অন্য কোনো প্রকার সহায়তা লাভ না ক'রে আপন নিষ্ঠা ধৈর্য ও শ্রমের দ্বারা তা সম্পূর্ণসাধন করেছেন। তিনি একক মহাভারতের মূল, নূতন টীকা, নূতন বঙ্গানুবাদ, পাঠান্তর-সংগ্রহ, নীলকণ্ঠকৃত প্রাচীন টীকা সংশোধন ইত্যাদি সমাধান ক'রে একুশ বছরে মহাভারত-রচনা শেষ করেছেন।

ইতিপূর্বে বর্ধমান-মহারাজার আনুকূল্যে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে তেরো জন পণ্ডিত নিয়োগ করে মহাভারতের কেবল মূল ও অনুবাদ করতে ছাব্বিশ বছর (বঙ্গাব্দ ১২৬৫ থেকে ১২৯১) সময় লাগে; কালীপ্রসন্ন সিংহ দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করে ছয় জন পণ্ডিতের সহায়তায় সতেরো বৎসরে এর কেবল বঙ্গানুবাদ করান; পুনার ভাণ্ডারকর-সমিতি মহাভারতের কাজ আরম্ভ করেছেন খ্রীষ্টীয় ১৯১২ সালে; দশ লক্ষ টাকার উপর সাহায্য পেয়েছে এই সমিতি, এই সমিতি-প্রকাশিত মহাভারতে আছে কেবল মূল ও পাঠান্তর, সতেরো জন পণ্ডিতের সহযোগিতায় এই কাজ চলেছে—এ পর্যন্ত তাঁরা কেবল আদি, সভা ও ও বিরাট পর্ব প্রকাশ করেছেন, এখন শান্তিপর্বের কাজ চলেছে।

এর সঙ্গে হরিদাসের কাজের তুলনা করলে বিস্মিত হতে হয়। যে কাজ দেশের অসাধ্য, সে কাজ একের সাধ্য হল কী করে? তাঁর রক্তের ধারায় অবশ্যই নিষ্ঠার অকৃত্রিম স্রোত আছে।

নব্যভারতের নৈমিষারণ্য কোটালিপাড়ার মধ্যবর্তী উনশিয়া গ্রামে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্র যজুর্বেদীয় অগ্নিহোত্রী পুরন্দর আচার্য বাস করতেন। তাঁরা চার পুত্র— শ্রীনাথ, যাদবানন্দ, মধুসূদন ও বাগীশচন্দ্র। এই মধুসূদনই পরবর্তীকালে অদ্বৈতসিদ্ধি প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রণেতা মধুসূদন সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। মধ্যম যাদবানন্দ ন্যায়াচার্য থেকে পঞ্চম রামদাস বিদ্যালংকার— এই রামদাস বিদ্যালংকার থেকেই সপ্তম হচ্ছেন শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ। তাঁর পিতার নাম গঙ্গাধর বিদ্যালংকর, মাতা বিধুমুখী দেবী।

হরিদাস তাঁর জীবনে যে নিষ্ঠার মন্ত্র পেয়েছিলেন তা অবশ্যই উত্তরাধিকার-সূত্রে। তাই মহাভারতের ন্যায় এক বিরাট গ্রন্থের যে অরণ্য, তারই তপোবনে বসে তিনি একনিষ্ঠ মনে আরম্ভ করতে পেরেছেন তপস্যা; এবং সে তপস্যায় লাভ করতে পেরেছেন এই সিদ্ধি। তাঁর এই কাজে তিনি চমৎকৃত ও বিস্মিত করেছেন সকলকে।

এখন তিনি বাস করেন কলকাতার এণ্টালি অঞ্চলের দেব লেনে। এর আগে ছিলেন সুরী লেনে। তাঁর মহাভারত-রচনা দেখার জন্যে আচার্য

প্রফুল্লচন্দ্র রায় সুরী লেনের বাসায় এসেছিলেন ; দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রায় প্রত্যহ হরিদাসের রচনা দেখতে যেতেন ; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রত্যেক মাসে এসে দেখে যেতেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য আরও অগণিত পণ্ডিত এই মহাভারত দেখে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকে এরূপ মতও প্রকাশ করেছেন যে, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর মহাভারত-রচনার ন্যায় এরূপ বিরাট কাজ মাত্র একজনের চেষ্টায় এ পর্যন্ত পৃথিবীতে হয় নি ॥

কেবল মহাভারত-রচনাই নয়, এ ছাড়াও হরিদাস আরও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কলকাতা সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের এক সভায় এইরূপ বলেছিলেন যে, ভগবান শংকরাচার্যের পরে শ্রীযুত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের ন্যায় বহুগ্রন্থকার ভারতবর্ষে আর জন্মগ্রহণ করেন নি।

১৮ই এপ্রিল ১৯৫৩, ৫ই বৈশাখ ১৩৬০, শনিবার। বেলা দুপুর তাঁর দেব লেনের গৃহে বসে তাঁর জীবনকথা শুনছি। ছিয়াত্তর বছর বয়স হয়েছে, কিন্তু দেখে মনে হয় ষাট বা তারও কিছু কম। এখনো বলিষ্ঠ চেহারা এবং দরাজ গলা। সারাটা জীবন কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম করে তিনি তাঁর দেহ ও মন সমান মজবুত রাখতে সক্ষম হয়েছেন।

বললেন, "পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতির নিকট বিদ্যারম্ভ করি। এগারো বছর বয়সে পিতামহ কাশীচন্দ্রের নিকট কলাপ-ব্যাকরণ পাঠ আরম্ভ করি। পিতামহের অনুপস্থিতির সময় স্বগ্রামস্থিত গোবিন্দচন্দ্র বাচস্পতির (গোবিন্দ মহাশয়) টোলে সন্ধিবৃত্তি পড়ি। সন্ধিবৃত্তি পড়ার পরে কোটালিপাড়ার অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে ব্রজকুমার বিদ্যাভূষণের নিকট চতুষ্টয় বৃত্তি থেকে কৃৎবৃত্তির দ্বিতীয় প্রকরণ পর্যন্ত পাঠ করেছিলাম। তার পর কারক সমাস তদ্ধিত কৃৎবৃত্তির অবশিষ্ট অংশ ও পরিশিষ্টও পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি ও পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালংকার মহাশয়ের নিকট অধ্যয়ন করি।"

পিতামহ ও পিতা তাঁর জীবনে অধ্যয়নের ও আরাধনের যে বীজমন্ত্র উপ্ত করেছিলেন, সেই বীজ থেকে অঙ্কুর-উদ্গম হয়েছে এবং সেই অঙ্কুর থেকে এই মহীরুহ চতুর্দিকে শাখাপ্রশাখা বিস্তার ক'রে আজ সমুন্নত শিরে দাঁড়িয়েছে।

এই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখা হচ্ছে তাঁর রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ এবং তার মূল কাণ্ডটি হচ্ছে মহাভারত।

পনেরো বৎসর কয়েক মাস বয়সের সময় হরিদাস স্বগ্রামস্থিত আর্যশিক্ষা-সমিতিতে কলাপ-ব্যাকরণের উপাধি-পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে শব্দাচার্য উপাধি ও পুরস্কার লাভ করেন। এই সময়েই সংস্কৃত ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি হয়েছিল এবং অনর্গলভাবে সংস্কৃত ভাষায় গদ্য ও পদ্য বলতে পারতেন। সংস্কৃতে তিনি এই সময় কংসবধ নামে এক নাটক রচনা করেন। এই নাটকটি সে সময়ে কোটালিপাড়ায় মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল। এই কংসবধকে নাটকানুরূপ চম্পূকাব্য বলা চলে, কারণ এতে নাটকীয় লক্ষণ তেমন দেখা যায় না— অভিনয়ের সভার এই প্রকার আলোচনা হয়, সভায় অনেক আলংকারিক এইরূপ আলোচনা করেছিলেন। এইসব শুনে হরিদাস অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং পশ্চিমপাড়াস্থিত মহামহোপাধ্যায় রামনাথ সিদ্ধান্ত-পঞ্চানন মহাশয়ের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন এবং জানকীবিক্রম নামে একখানি সর্বলক্ষণ-লক্ষিত সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। এই নাটকও কোটালিপাড়ায় বিশেষ সমারোহের সঙ্গে অভিনীত হয়। এর পর ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কালেই ক্রমে তিনি শংকর-সম্ভব ও বিয়োগ-বৈভব নামে দুইখানি খণ্ডকাব্য এবং বৈদিকবাদ-মীমাংসা নামে একখানি সংস্কৃত ইতিহাস রচনা করেন।

হরিদাসের বয়স তখন বাইশ। এই সময় পিতামহ কাশীচন্দ্র বাচস্পতি পরলোকগমন করেন। সংসারে অর্থাভাব উপস্থিত হয়। পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালংকার হরিদাসকে কলকাতার ২নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটে জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের নিকট কাব্য পড়ার জন্য প্রেরণ করেন। পিতামহ কাশীচন্দ্র ইংরেজী বা কাব্য পাঠের বিরোধী ছিলেন ব'লে তাঁর জীবদ্দশায় হরিদাসের কাব্য-পাঠের সুবিধে হয় নি। ক্রমে কাব্যের উপাধি পাস করে ১৩০৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে হরিদাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কবিরাজপুরে যান, সেখানে আনন্দচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কাছে স্মৃতি পড়তে আরম্ভ করেন; আনন্দচন্দ্রের টোল যখন বন্ধ থাকত তখন বাড়িতে এসে পিতা গঙ্গাধর বিদ্যালংকারের কাছে

জ্যোতিষ ও পুরাণ পাঠ করতেন এবং নিজে নিজে সাংখ্য বেদান্ত মীমাংসা ও পাতঞ্জল দর্শন অভ্যাস করতেন। এইভাবে ঢাকা সারস্বত সমাজে সাংখ্য পুরাণ ও কাব্যের উপাধি-পরীক্ষা দিয়ে সব কয়টি উপাধি-পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি সাংখ্যরত্ন, পুরাণশাস্ত্রী ও সিদ্ধান্তবাগীশ উপাধি লাভ করেন। তদবধি তিনি হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ রূপেই খ্যাত হয়ে উঠেছেন।

তিনি স্মৃতির আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে বৃত্তি পান এবং তার পর কলাপ-ব্যাকরণের গবর্নমেণ্টের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৩১১ সনে স্মৃতির উপাধি-পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন এবং পাঠ সমাপ্ত করেন।

তাঁর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর বাগ্মিতার বিকাশ ঘটে। যখন তিনি স্মৃতিপাঠরত সেই সময়ে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সেনদিয়া গ্রামে অম্বিকাচরণ মজুমদারের মাতৃশ্রাদ্ধের বিরাট সভায় সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের তন্ত্রশাস্ত্রখণ্ডন-বক্তৃতার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করে তিনি বিশেষ যশস্বী হন। এর পর ঢাকা জেলার অন্তর্গত চন্দ্রপ্রতাপ পরগনার রমণীমোহন রায়ের মাতৃশ্রাদ্ধের বিরাট সভায় দিনাজপুরের রাজপণ্ডিত প্রসিদ্ধ কবি মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি এবং বিক্রমপুরের জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ মহাশয়ে সঙ্গে সমস্যাপূরণ বিষয়ে বক্তৃতা ক'রে জয়লাভ করেন। এই সমস্যাপূরণ বিষয়ে প্রশ্নকর্তা ছিলেন ঢাকা কলেজের অধ্যাপক বিধুভূষণ গোস্বামী এবং মধ্যস্থ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালংকার প্রভৃতি। এই জয়লাভে হরিদাসের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এর পর ঢাকা বাল্যাশ্রম নামক বিরাট সভায় সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃত বক্তা কাশীচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিরুদ্ধে সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘকাল যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করে সুনাম অর্জন করেন। ১৩১২ সনের বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে কবিরাজ-পুরের পার্বতীচরণ রায় মহাশয়ের পত্নী কাত্যায়ণী দেবী ধর্মঘট-ব্রত-প্রতিষ্ঠা তুলাপুরুষদান মহাভারত-উদ্‌যাপন এবং চতুরগ্নিযোগ করেন, এই অনুষ্ঠানে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতই নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। এখানে হরিদাস উক্ত মহাভারতের পাঠক ছিলেন এবং ঐ তারিখে সেই পাঠ সমাপ্ত করেন। পরে ঐ সভায় সংস্কৃত ভাষায় সুললিত বক্তৃতা দিয়ে সুখ্যাতি অর্জন

করেন। সেই দিন রাত্রিতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় রচিত বিরাজসরোজিনী নাটিকা অভিনীত হয়।

বললেন, "এর পর কোটালিপাড়ার নিজ বাটিতে আসি এবং কিভাবে জীবন আরম্ভ করা যায়, তা চিন্তা করতে থাকি। এমন সময়ে স্বাধীন ত্রিপুরার রাজপণ্ডিত এবং আর্যশিক্ষা-সমিতি ও আর্যবিদ্যালয়ের সম্পাদক রেবতীমোহন কাব্যরত্ন একটি সাধারণ সভা আহ্বান ক'রে কোটালিপাড়ার লুপ্তপ্রায় আর্য-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন।"

এই অনুরোধ রক্ষা ক'রে হরিদাস ১৩১২ সনের ১৩ই আষাঢ় আর্যবিদ্যালয়ের অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। সে সময়ে ঐ বিদ্যালয়ে একষট্টি জন নানাদেশীয় ছাত্র অধ্যয়ন করত। সকালে দর্শন ও স্মৃতি, বিকালে ব্যাকরণ ও কাব্য পড়ানো হত। সে সময়ে প্রথম বছরে বারো জন ছাত্র আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং উপাধি-পরীক্ষায় চার জন ছাত্র উত্তীর্ণ হয়। এতে সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় গভর্নমেণ্ট থেকে এক বৎসর ভোগ্য মাসিক ১২৲ টাকা বৃত্তি এবং এককালীন ২০০৲ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বছর আদ্য ও মধ্য পরীক্ষায় দশ জন ছাত্র পাস করে, সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় ৮৲ টাকা হারে বৃত্তি পান।

এই সময়ে শিল্পকার্যেও তাঁর বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজ বাটীর দুর্গামণ্ডপ নিজে তৈরি ক'রে নিজ হাতে টালী বানিয়ে সেই মণ্ডপ ছেয়েছিলেন। বললেন, "এ সময় আমার কয়েকটা শখ ছিল। পাখোয়াজ ঢোল তবলা ও হারমোনিয়ম বাজাতে পারতাম। সে অভ্যাস এখন অবশ্য আর নেই।"

অতঃপর তাঁর জীবন গড়িয়ে গেল অন্য খাতে। ভাগ্য-অন্বেষণে বেরিয়ে পড়তে হল। আর্যবিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ক'রে বিরাট সংসার পরিচালনা দায় হয়ে উঠেছিল তখন। বললেন, "১৩১৩ সনের শেষের দিকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আর্যবিদ্যালয় পরিত্যাগ ক'রে অর্থ উপার্জনের জন্যে কলকাতায় আসি। তখন নিজের ঘরে পাঁচজন ছাত্র রেখে তাদের অধ্যাপনা করছি ও সংসারেও নয় জন পরিজন। এই কারণে উপার্জনের কথা ভাবতে হল। কলকাতায়

এলাম। কালীঘাটে শ্বশুরালয়ে থেকে নষ্টকোষ্ঠী-উদ্ধার ও হস্তরেখা-বিচার আরম্ভ করলাম।"

এখানে তিনি পেয়ে গেলেন দু জন সুহৃদ ও সহায়। তাঁরা হচ্ছেন সাউথ সুবার্বন স্কুলের শিক্ষক অতুল ঘোষ ও খগেন বসু নামক একজন ব্যবসায়ী। এঁরা নষ্টকোষ্ঠী-উদ্ধারে প্রীত হয়ে হরিদাসের অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং কালীঘাট বা ভবনীপুরে টোল করে তাতে হরিদাসকে রাখার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন। উক্ত অতুল ঘোষ ও খগেন বসু তখন নকীপুরের জমিদার রায় হরিচরণ চৌধুরী বাহাদুরের কাছে যান ও সাহায্য প্রার্থনা করেন। হরিচরণবাবু সিদ্ধান্তবাগীশকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয় দেখা করলে তাঁর সমস্ত পরিচয় পেয়ে হরিচরণবাবু তাঁকে নিজ বাড়িতে গিয়ে নিজের পৌরোহিত্য ও দ্বারপণ্ডিতের পদে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং চল্লিশ বিঘা জমির উপস্বত্ব দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তখন হরিদাস মালদহ জেলার অন্তর্গত চাঁচর-রাজবাড়ির দ্বারপণ্ডিতের পদ ও দুবলহাটির রাজবাড়ির দ্বারপণ্ডিতের পদ ও পূর্বপ্রস্তাবিত টোলের অধ্যাপকের পদের নিয়োগপত্র পান। ১৩১৪ সনের ৩১এ শ্রাবণ নকীপুরে গিয়ে তিনি উক্ত পদ গ্রহণ করেন। ক্রমে ঐ টোলের নাম হয় হরিচরণ চতুষ্পাঠী। ছাত্রসংখ্যাও ক্রমে বাড়তে লাগল। সব দিক দিয়েই হরিদাসের সুবিধে হল।

বললেন, "এ স্থানের স্বাস্থ্য ভালো। লাভও প্রচুর। এবং পূর্বপ্রস্তাবিত চল্লিশ বিঘা জমি স্বল্প খাজনায় কায়েমী করার প্রস্তাব করায় হরিচরণবাবু তাতেই সম্মত হয়ে মাত্র ২০৲ টাকা খাজনায় সেই জমি বন্দোবস্ত করে দিলেন। এইসব কারণে সর্বপ্রকারে মনের প্রফুল্লতা উপস্থিত হওয়ায় আমি গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হলাম।"

প্রথমে তিনি পূর্বরচিত বিরাজসরোজিনী নাটিকা মুদ্রণ করে প্রকাশ করলেন, তার পর ব্যবস্থাগ্রন্থ স্মৃতিচিন্তামণি রচনা করে প্রকাশ করলেন। ক্রমে রুক্মিণীহরণ নামে কাব্য এবং বঙ্গীয়প্রতাপ নামে নাটক রচনা করেন। তার পর উত্তররামচরিত প্রভৃতি ষোলো খানি প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করে প্রকাশ করেন। এইসব গ্রন্থই কলকাতার বিভিন্ন

প্রেস থেকে ছাপা হত। ভারতবর্ষের সর্বত্র এইসব গ্রন্থ অবাধে চলতে লাগল।

তাঁর টোল থেকে নানা শাস্ত্রের বহু ছাত্র আদ্য মধ্য ও উপাধি পরীক্ষায় প্রত্যেক বছর পাস করতে থাকে। ইতিমধ্যে কাশী ভারত-ধর্ম-মহামণ্ডল হরিদাসকে মহোপদেশক উপাধি ও একটি প্রশংসাপত্র দেন। ক্রমে মালতী-মাধব-প্রকরণের টীকা দেখে জনৈক পণ্ডিত তা ছাপালেন।

নকীপুরে থেকে কলকাতায় বই-ছাপানো নানা রকম অসুবিধে, খরচও বেশী, ইত্যাদি কারণে হরিদাস টোল-বাড়িরই এক প্রান্তে ১৩২৬ সালে একটি ছাপাখানা স্থাপন করেন। এই ছাপাখানার কাঠের জিনিসগুলি হরিদাস নিজেই দেখিয়ে দিয়ে একটা সাধারণ মিস্ত্রিকে দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। এতে খরচ পড়েছিল চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই ছাপাখানা যখন যথানিয়মে চলছে, সে সময় একদিন স্বাধীন ত্রিপুরা-মহারাজার প্রধানমন্ত্রী সংসারচন্দ্র সেন মহাপীঠ ঈশ্বরীপুর যাওয়ার পথে ঐ প্রেসে ছাপা হচ্ছে দেখে পালকি থেকে নেমে প্রেসটি দেখেন, মুদ্রিত গ্রন্থগুলি পর্যবেক্ষণ করেন এবং হরিদাসের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর শিল্পকার্যের নৈপুণ্য দেখে অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করেন।

এদিকে ১৩২১ সনে রায়বাহাদুর হরিচরণ চৌধুরীর মৃত্যুর পর থেকেই নকীপুরের আবহাওয়া খারাপ হয়ে ওঠে। তবু তিনি মনের জোরে সেখানে আরও অনেকদিন ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেখানে থাকা নিরাপদ মনে করলেন না। সুতরাং ১৩৩৬ সালের বৈশাখ মাসে কলকাতায় সুরী লেনে দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর সঙ্গে দেখা করলেন এবং সুরী লেনেই একটি ভাড়া-বাড়িতে বাস আরম্ভ করলেন। এই সময় নানা স্থান থেকে চার-পাঁচটি ছাত্র আসত, তিনি তাদের পড়াতেন।

এইখানেই তিনি আরম্ভ করলেন তাঁর বিরাট ব্রত। সুরী লেনের ভাড়া-বাড়িতে বসে তিনি রত হলেন মহাভারতের কাজে।

বললেন, "নিজের ইচ্ছা ও উদ্যম ছিল; কিন্তু তার উপর পেয়ে গেলাম দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়ের উৎসাহ। এরই ফলে মহাভারতের একটি বিরাট সংস্করণ প্রকাশে রত হলাম। অনেক আদর্শগ্রন্থ দেখে ঋষিপরিগণিত

অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যার মিল রেখে, ঋষি-উল্লিখিত বৃত্তান্তের পৌর্বাপর্য ঠিক রেখে মূলের সমীচীন পাঠ উপরে সন্নিবেশিত ক'রে, তার নিম্নে ক্রমশঃ প্রত্যেক শ্লোকের নিজকৃত ভারতকৌমুদী টীকা ও বঙ্গানুবাদ, নীলকণ্ঠকৃত টীকা ও পাঠান্তর সন্নিবেশিত ক'রে এই মহাভারতের নূতন সংস্করণ প্রকাশ করেছি।"

এই গ্রন্থ রয়াল আট-পেজি ফর্মার ষোলো ফর্মায় এক-এক খণ্ড হয়েছে. এ যাবৎ এইরূপ ১৩০ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এতে শান্তিপর্বের পঞ্চবিংশ খণ্ড পর্যন্ত বের হয়েছে, আরও সম্ভবত ২৮ খণ্ড বের হবে। ১৩৩৬ সালের আষাঢ় মাসে তিনি মহাভারতের কার্যে হাত দেন, ১৩৫৭ সালের ২৯এ জ্যৈষ্ঠ লেখা শেষ হয়। লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গেসঙ্গেই ছাপাও শেষ হয়ে যেত। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দরুন কাগজ দুর্মূল্য হয় এবং তার পর দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলে দু বছর ছাপা বন্ধ থাকে। কেবল গ্রাহকদের উপর নির্ভর করেই তিনি ১০১ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করেন। কিন্তু অনেক গ্রাহক মারা যান, অনেকে স্থানান্তারিত হন এবং কেউ কেউ ইচ্ছে করে ছেড়ে দেন। তাতে আয় কমে যায়; কিন্তু মুদ্রণ-ব্যয় এর মধ্যে বেড়ে যায় অনেক। ফজলুল হক অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী থাকা-কালে চার হাজার টাকা সাহায্য দেন এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার দশ হাজার টাকা সাহায্য দেন— এতে ১৩০ খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

বললেন, "আরও ২৮ খণ্ড প্রকাশ বাকি। এর জন্যে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা আবশ্যক। যদি বঙ্গীয় সরকার এ বিষয় বিবেচনা করেন, তাহলে এ গ্রন্থ ছাপা শেষ হতে পারে। আমিও শান্তি পাই।"

ইতিমধ্যে ভারতসরকারের কাছ থেকে তিনি সাড়ে সাত হাজার টাকা পেয়েছেন, আরও ২০টি খণ্ডও প্রকাশিত হয়েছে।

১৩৩৯ সাল থেকে মহামহোপাধ্যায় মহাকবি-ভারতাচার্য শ্রীযুক্ত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য প্রণীত রুক্মিণীহরণ মহাকাব্য কাব্যের মধ্যপরীক্ষার পাঠ্য-রূপে নির্ধারিত হয়ে আছে!

১৩৫৩ সালে হরিদাস-প্রণীত বঙ্গীয়প্রতাপ নাটক মিনার্ভা ও স্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তার পর তিনি মিবারপ্রতাপ নাটক রচনা করেন, এ নাটকও স্টার রঙ্গমঞ্চে ও ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটে অভিনীত হয়।

তাঁর কাছে অধ্যয়ন করে পাস করেছেন এরূপ ছাত্রের সংখ্যা, হরিদাস বললেন, "৭৫৩। এর মধ্যে অনেকে বড় বড় টোলের অধ্যাপক।"

হরিদাস এগারোটি উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। আর্যশিক্ষা-সমিতি থেকে শব্দাচার্য, ঢাকার সারস্বত-সমাজ থেকে সাংখ্যরত্ন পুরাণশাস্ত্রী ও সিদ্ধান্তবাগীশ, গবর্নমেণ্ট থেকে ব্যাকরণতীর্থ কাব্যতর্থ ও স্মৃতিতীর্থ— এই সাতটি পরীক্ষালব্ধ উপাধি। তদ্ভিন্ন কাশী ভারতধর্ম-মহামণ্ডল থেকে মহোপদেশক, বৃটিশ সরকার থেকে মহামহোপাধ্যায়, পণ্ডিত-মহামণ্ডল থেকে মহাকবি এবং পুরাণ-পরিষদ থেকে ভারতাচার্য।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা উল্লেখযোগ্য। যে কাজ দশের অসাধ্য, মহাভারতের এই বিরাট সংস্করণ প্রকাশ করে তিনি তা একের সাধ্য ব'লে প্রমাণ করেছেন। এতেও সম্ভবতঃ তাঁর বাসনার পূরণ হয় নি। তাই তিনি মহাভারত কত বর্ষ আগে রচিত তা জ্যোতিষ-বিচারের দ্বারা নিরূপণ করেছেন। তিনি যুধিষ্ঠিরের সময় নির্ধারণ, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ-বৎসর, পঞ্চপাণ্ডব ও দুর্যোধনের জন্ম ও মৃত্যুর সময় বিচার করেছেন; বিরোধ সমাধান করেছেন। তা ছাড়া যুধিষ্ঠির ভীম অর্জুন ও দুর্যোধনের জন্মপত্রিকা (কোষ্ঠী) রচনা করেছেন। প্রথমজীবনে নষ্টকোষ্ঠী-উদ্ধার তিনি করেছেন, সেই প্রণালী প্রয়োগের দ্বারা মহাভারতের নায়কদের কোষ্ঠী উদ্ধারে ব্রতী হয়েছেন হরিদাস। তাঁর এ প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর এই উদ্যোগের জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাতে হয়।

দেব লেনে নিজ বাটীতে তিনি ১৩৪৭ সাল থেকে পুত্র-পৌত্রাদির সঙ্গে বাস করছেন।

কখন সন্ধে গড়িয়ে রাত্রি এসে গেছে, বুঝতে পারি নি। মহাভারতের অরণ্যে যেন হারিয়ে গিয়াছিলাম আমিও। সেই অরণ্য থেকে বেরিয়ে এলাম। এসে দাঁড়ালাম দেব লেনের অল্পালোকিত কংক্রিটের রাস্তায়।

রচিত গ্রন্থাবলী

মুদ্রিত মূল গ্রন্থ

স্মৃতিচিন্তামণি। ব্যবস্থাগ্রন্থ

রুক্মিণীহরণ। মহাকাব্য

বিরাজসরোজিনী। নাটিকা।

বঙ্গীয়প্রতাপ। নাটক। প্রতাপাদিত্য-চরিত্র

মিবারপ্রতাপ। নাটক। প্রতাপসিংহ-চরিত্র

বিয়োগবৈভব। খণ্ডকাব্য

যুধিষ্ঠিরের সময়

বিধবার অনুকল্প

অমুদ্রিত মূল গ্রন্থ

শঙ্করসম্ভব। খণ্ডকাব্য

সরলা। গদ্যকাব্য

কংসবধ। নাটক

জানকীবিক্রম। নাটক

শিবাজীচরিত। মহানাটক

বিদ্যাবিত্তবিবাদ। খণ্ডকাব্য

বৈদিকবাদমীমাংসা। ইতিহাস

কাব্যকৌমুদী। অলংকার গ্রন্থ

মুদ্রিত টীকা-গ্রন্থ

উত্তররামচরিত। সটীকানুবাদ

মালবিকাগ্নিমিত্র। সটীকানুবাদ

মালতীমাধব। সটীকানুবাদ

দশকুমারচরিত। সটীকানুবাদ

কাদম্বরীপূর্বার্ধ। সটীকানুবাদ

সাহিত্যদর্পণ। বিস্তৃত টীকা-সহ

মেঘদূত। সান্বয়-টীকাদ্বয়-হিন্দী-বঙ্গানুবাদ

কুমারসম্ভব। সান্বয়-টীকা-হিন্দী-বঙ্গানুবাদ

মৃচ্ছকটিক। সটীকানুবাদ

অভিজ্ঞানশকুন্তল। সটীকানুবাদ

রঘুবংশ। সান্বয়-সটীকা-হিন্দী-বঙ্গানুবাদ

শিশুপালবধ। সান্বয়-টীকা-টিপ্পনি। বঙ্গানুবাদ

নৈষধচরিত। সান্বয়-সটীকানুবাদ

মুদ্রারাক্ষস। সটীকানুবাদ

অমুদ্রিত টীকা-গ্রন্থ

ভবভূতি-কৃত মহাবীর-চরিত নাটকের টীকা ও বঙ্গানুবাদ

কালিদাস-কৃত বিক্রমোর্বশী নাটকের টীকা ও বঙ্গানুবাদ

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

কলকাতার রাজভবন। ভারতের আরও পাঁচটি রাজভবনের মত এ-প্রাসাদও ছিল বৃটিশ দাপটের লীলানিকেতন। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে, উচ্চতায় ও বিশালতায় এ-প্রাসাদ আগেরই মত অটল ও অচল।

এর বাহিরের রূপ বদলায় নি, কিন্তু ভিতরটা গেছে পালটে। দীন ও দরিদ্র যারা তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না এখানে; কিন্তু আজ এখানে যিনি অধীশ্বর তিনি স্বয়ংই একজন দরিদ্র ব্যক্তি— একজন প্রাক্তন ইস্কুলমাস্টার। পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়।

যে বৃটিশশক্তি অজস্র অর্থ ব্যয় করে এই প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, সে-শক্তি আজ অপসারিত, তাতে আজ ফাটল ধরেছে; কিন্তু দেড় শ বৎসর আগে নির্মিত এই প্রাসাদের কোথাও চিড় পড়ে নি। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে এই প্রাসাদ-নির্মাণ আরম্ভ হয়, ক্যাপ্টেন ওয়াইয়াট Wyatt নামে এক ইংরেজ স্থপতির তত্ত্বাবধানে দেড় লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় বাইশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পাঁচ বছর বাদে ১৮০৪ সালে এর নির্মাণ-কাজ সমাপ্ত হয়।

৩রা আগস্ট ১৯৫৩, ১৮ই শ্রাবণ ১৩৬০— বিকাল সাড়ে পাঁচটায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় স্থির হয়েছে। বিরাট গেট পেরিয়ে পাথরকুচির চওড়া রাস্তা ধরে সরসর করে এগিয়ে চলেছে আমার গাড়ি। গেটের পাশের ছোট একটা আফিসঘর থেকে একজন এগিয়ে এলেন, গাড়ি থামল, তিনি আমার কাছ থেকে চিঠিটা দেখলেন। অনুমতি পেয়ে গাড়ি এগিয়ে গিয়ে প্রকাণ্ড সিঁড়ির গায়ে গিয়ে দাঁড়াল। নেমে আমি হাঁটা দিয়েছি। এগিয়ে এল আরদালি আর বেয়ারা। আমাকে তারা নিয়ে চলল। কার্পেটের উপর দিয়ে দিয়ে বারান্দা পেরিয়ে, মার্বেল-হল্ ডিঙিয়ে লিফ্টে করে উপরে উঠলাম। আর একদল বেয়ারা এগিয়ে এল। আমাকে দেখিয়ে দিল ঘর। ভিতরে ঢুকলাম—গভর্নরের এডিকং বসে। নাম বললাম। তিনি তাঁর টেবিলের উপর একটা টাইপ করা কাগজের দিকে

চেয়ে সম্ভবত নামটাই পড়লেন। মিলিটারি স্মার্টনেসের সঙ্গে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে বসতে বলে পর্দা সরিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। মিনিট-দুই বাদে ফিরেই সোজা ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে সঙ্গে যেতে বললেন। তাঁর সঙ্গে গেলাম। একটু গিয়েই একটা ঘরের দরজা খুলে তিনি ঢুকলেন, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও। সম্মুখে টেবিলের ওপারে গবর্নর দাঁড়িয়ে। এডিকং রাজভবনের দস্তর-অনুসারে গবর্নরের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করে দিয়েই চলে গেলেন।

স্মিত হেসে বললেন গবর্নর, "আসুন। কি খবর বলুন।"

এতক্ষণ ফরম্যালিটির সুকঠিন বর্ম আমাকে যেন শক্ত করে জড়িয়ে ধরে ছিল, গবর্নরের এই সম্ভাষণে হঠাৎ সে বর্ম যেন খসে পড়ে গেল গা থেকে। হালকা বোধ হল নিজেকে। মনে হল, অচিন রাজ্যের এলাকা ডিঙিয়ে যেন অবশেষে চেনা লোকের বৈঠকখানায় এসে পৌঁছে গেলাম সহসা।

বসলাম। আর গবর্নর নয়, এবার হরেন্দ্রকুমার। তিনি বসে বললেন, "কি আছে আমার জীবনে, কি আপনাকে বলব।"

ঠিক জীবনকথা নয়, আমি জানতে চাই তাঁর ভ্রমণকাহিনী। প্রথমজীবনের সেই স্কুলপ্রাঙ্গণ থেকে উত্তরজীবনের এই রাজভবনের অঙ্গন পর্যন্ত পর্যটনের কাহিনীটা।

১৮৭৭ সালের ৩রা অক্টোবর (১২৮৪ বঙ্গাব্দের ১৮ই আশ্বিন) কলকাতার এক খৃষ্টান-পরিবারে তাঁর জন্ম। ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে কোনো অসাধারণতা তাঁর মধ্যে দেখা যায় না। তিনি ১৮৯৩ সালে কলকাতার রিপন কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাস করেন, ১৮৯৫ সালে রিপন কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন দ্বিতীয় বিভাগে।

বললেন, "ইস্কুলের পাঠ্য বই পড়তে তেমন ভালো লাগত না। কিন্তু সব বই পড়তে উৎসাহ ছিল। পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এস. সি. আঢ্যির বইয়ের দোকান থেকে স্কট ডিকেন্স ইত্যাদি কিনতাম। রাত জেগে-জেগে সেইসব বই পড়তাম। বাপ-মা ভাবতেন খুব পড়ছি। কিন্তু পরীক্ষার ফল দেখে তাঁরা হতাশ হতেন। পড়ার বহর দেখে যতটা তাঁরা মনে মনে আশা করতেন ততটা কিছুই হত না।"

এইভাবে স্কুল এবং কলেজের অর্ধেক পেরিয়ে গেলেন হরেন্দ্রকুমার। তিনি যে জীবনে সফল বিদ্যার্থী হয়ে উঠতে পারবেন, তাঁর জীবনের মোড় যে ঘুরে যাবে— এ কথা হয়তো তাঁর মনেও তখন উদিত হয় নি।]

তিনি বি.এ.তে গিয়ে ইংরেজিতে অনার্স নিলেন। এস.সি.আঢ্যির দোকানের কল্যাণে তিনি ইংরেজি সাহিত্য প্রাণ ভরে পাঠ করেছেন, এবং তার রসাস্বাদন করেছেন, এইজন্যেই তিনি ইংরেজির প্রতি আকর্ষণ বোধ করে থাকবেন। কিন্তু মানুষ বা প্ল্যান করে ভগবান তা নাকি ভেঙেই দিয়ে থাকেন, এমনি প্রবাদ আছে। হরেন্দ্রকুমারের জীবনে সে-প্রবাদ প্রমাণ রূপে দেখা দিল। তিনি যখন বি.এ.র চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়ছেন তখন তাঁর মা মারা গেলেন! মার মৃত্যুর জন্যে পড়াশুনায় বিঘ্ন উপস্থিত হল, মনও তখন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বললেন, "আমি অনার্স ছেড়ে দিলাম।"

অনার্স ছেড়ে দিলেন বটে, কিন্তু ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমল না। মনের মধ্যে স্কট আর ডিকেন্স তখনো গুঞ্জন করে চলেছে। এম.এ. পড়তে গেলেন ইংরেজিতেই এবং এখানেই তিনি কৃতিত্ব অর্জন করে সকলকে বিস্মিত করে দিলেন।

বললেন, "এম.এ.তে আমার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন ভূতনাথ কর—ইনি সম্প্রতি মারা গেছেন, সুরেশচন্দ্র ঘটক, ব্যারিস্টার অমিয় চৌধুরী, এন. কে. বসু, দৈবকীলাল সেনগুপ্ত, খগেন্দ্রলাল দত্ত, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও অখিল চ্যাটার্জি। এঁদের সকলেরই বি.এ.তে অনার্স ছিল। এঁদের মধ্যে থেকেই কেউ এম.এ.তে ফার্স্ট হবেন— এই দৃঢ় ধারণাই সকলের ছিল। এ-দলে আমিই একমাত্র, যার বি.এ.তে অনার্স ছিল না। আমি ক্লাসে এক কোণে একা চুপচাপ বসে থাকতাম, কিন্তু এম.এ.র ফল যখন বেরল, তখন আমি ফার্স্ট হয়ে গেলাম। এতেই সবাই আশ্চর্য হল— আমিও। আমাকে সকলে বলতে আরম্ভ করল— বর্ণচোরা আম। কেননা তারা কেউই আমার সম্বন্ধে সামান্য সন্দেহও কোনোদিন করে নি যে, আমি তাদের এভাবে আশ্চর্য করে দিতে পারব।"

১৮৯৮ সালের এ ঘটনা, আজ থেকে পঞ্চান্ন বছর আগে। সেই সুদূর অতীতের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করে হরেন্দ্রকুমার তাঁর যৌবনকালটা

একবার যেন দেখে নিলেন। আজ তিনি বৃদ্ধ— প্রায় সাতাত্তর বছর বয়স হয়েছে। বয়স হয়েছে, বৃদ্ধও হয়েছেন ; কিন্তু বার্ধক্যে তিনি পঙ্গু নন। এখনো যৌবনের উৎসাহ নিয়ে ডুবে আছেন কাজের মধ্যে।

টেবিলের উপর অনেকগুলি সরকারি ফাইল। সেইসব কাগজপত্রের মধ্যে দেশবন্ধু-স্মৃতিরক্ষা-ফণ্ডের কাগজপত্রও আছে।

বললেন, "দেশবন্ধু-ফণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকাই হয়তো উঠবে না, এ রকম ধারণা ছিল অনেকের। কিন্তু এ পর্যন্ত সাড়ে তিন লাখের উপর টাকা পাওয়া গিয়েছে। আজ ছয় জন ইহুদি ভদ্রলোক এসেছিলেন, তাঁরা এই ফণ্ডে টাকা দিয়ে গেলেন, গতকালও অনেক দিয়ে গেছেন।"

দুটো ফাইল বার করে আমাকে দেখালেন। নামের পাশে টাকার অঙ্ক লেখা। বললেন, "কলকাতার ইহুদিরা একটা ছোট কমিউনিটি, কিন্তু তাঁরা খুব জেনারাস।"

তাঁর কথায় বোঝা গেল, দেশবন্ধুর স্মৃতিরক্ষার কাজে তাঁর খুব উৎসাহ এবং তাঁর এই কাজে তাঁর সঙ্গে যাঁরা সহযোগিতা করছেন তাঁদের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞ। দেশবন্ধু দেশের জন্যে যা করেছেন, তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপই হরেন্দ্রকুমার তাঁর স্মৃতিরক্ষার্থে এই উদ্যোগ করছেন।

নিজের কথা ভুলে গিয়ে দেশবন্ধুর বিষয়ই তিনি কিছুক্ষণ বললেন।

রাজভবনের এই আড়ম্বরের কেন্দ্রস্থলে যিনি বসে আছেন তিনি স্বয়ং আড়ম্বরহীন, সহজ ও সরল। গায়ে একটা সাধারণ শার্ট, মুখে শিশুর সরলতা।

ফিরিয়ে আনলাম তাঁর নিজের কথায়। ১৮৯৮ সালের ঘটনায়। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. পাস করেছেন। এবার একটা কাজের দরকার। কিন্তু কাজ কোথাও পাওয়া যায় না।

বললেন, "কলকাতার সিটি কলেজিয়েট স্কুলে মাস্টারির কাজ অবশেষে জোগাড় হল। কয়েক মাস এখানে কাজ করলাম, কিন্তু এক পয়সাও পেলাম না। এইজন্যে এ-কাজটাকে অনারারি বলাই ঠিক।"

সিটি কলেজিয়েট স্কুলে কাজ করতে করতেই তিনি অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেলেন। বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক রূপে তিনি নিযুক্ত

হলেন। কলকাতা ত্যাগ করে তিনি তাঁর কর্মস্থলে চলে গেলেন। রাজচন্দ্র কলেজে অধ্যাপক রূপে কিছুদিন কাজ করার পর সেখানকার প্রিন্সিপাল অন্যত্র চলে যাওয়ায় তরুণ হরেন্দ্রকুমার কলেজের প্রিন্সিপাল হলেন। বললেন, "খুব বেশি দিন না। বছর-খানেক আমি সেখানে ছিলাম। তার পর ফিরে এলাম কলকাতায়।"

১৯০০ সাল। হরেন্দ্রকুমার সিটি কলেজের অধ্যাপক হয়ে এলেন। হেরম্বচন্দ্র মৈত্র তখন সিটি কলেজের প্রিন্সিপাল। এখানে হরেন্দ্রকুমার পনেরো বছর ছিলেন। ১৯১৫ পর্যন্ত। বললেন, "হেরম্বচন্দ্র আমাকে খুব স্নেহ করতেন, আমাকে খাটিয়েও নিতেন খুব।"

হয়তো সেই খাটুনিটা ব্যর্থ যায় নি। পরিশ্রম কখনো বিফলে যায় না। পরিশ্রমের মধ্যে ছিলেন বলেই আজও তাঁর কর্মশক্তি অটুট আছে। তাই ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত এখনো তিনি নানা কাজের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত রাখতে পারেন। সরকারি কাজ আছে, নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করা আছে, অতিথি-অভ্যাগতদের সমাদর করা আছে। এবং আছে দেশবন্ধু-ফণ্ডের জন্য অর্থ-সংগ্রহের উদ্যোগ।

বললেন, "ছেলেবেলায় আমরা খুব খেলাধুলা করেছি। রাগবি খেলতাম। আমাদের সময় গেঞ্জি ছিল না। কাপড় আর কুর্তা পরে খেলতাম। মালকোঁচা বেঁধে খেলায় নামতাম। কিন্তু রাগবির মত হুড়োহুড়ির খেলায় কাপড় যেত ছিঁড়ে। ছেঁড়া কাপড়ে বাড়ি ফিরে এজন্যে খুব কানমলা খেতাম।"

এই রকম পরিশ্রমের খেলা খেলেছেন এবং কর্মজীবনে শ্রম করে গেছেন বলেই আজও তিনি ভালোবাসেন কাজ। জীবনে নানা মানুষের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে এসেছেন বলেই তিনি কাজের সঙ্গেসঙ্গে ভালবাসেন মানুষ।

১৯১৪ সাল। তখন তিনি সিটি কলেজের অধ্যাপক। বললেন, "মার্চ মাসের গোড়ার ঘটনা। সার্ আশুতোষ আমাকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, তুমি আমার কাছে আস না কেন, এনট্রান্সের এগজামিনারশিপ ছেড়ে দিলে কেন। বললাম, আমার জুনিয়াররা এফ. এ.র পরীক্ষক হয়ে গেল কিন্তু আমার কোনো বদল হল না। সার্ আশুতোষ বললেন যে, হেড-এগজামিনার

তোমাকে নাকি ছাড়তে চান না। যাই হোক, সার্ আশুতোষ আমার মনের ভাব বুঝতে পারলেন, বললেন, ঠিক আছে, তোমার কাছে বি. এ. অনার্সের কাগজ যাবে।"

এই সময় হরেন্দ্রকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্টগ্রাজুয়েট বিভাগে যোগ দেন পার্ট টাইম লেকচারার হিসাবে। বছর খানেক পরে ১৯১৫ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়েই পুরোপুরিভাবে যোগদান করেন।

১৯১৮ সালে হরেন্দ্রকুমার ইংরেজিতে পি. এইচ-ডি. হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই ইংরেজিতে প্রথম পি. এইচ-ডি.। "সার্ আশুতোষ বললেন, তুমি পি. এইচ.-ডি. না হলে তোমার উন্নতি করতে পারব না। এই শুনে আমি ডক্টরেটের জন্যে তৈরি হলাম। স্কট ডিকেন্স ইত্যাদির উপর বাল্যকাল থেকেই ঝোঁক। সার্ ব্রজেন্দ্রলাল শীল আমার থিসিসের সাবজেক্ট বলে দিলেন— ইংলিশ নভেলস। আমি পি. এইচ-ডি. হলাম।"

এবার আর উন্নতির পথে বিঘ্ন রইল না। হরেন্দ্রকুমার ইন্সপেক্টর অব কলেজেস হলেন। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি যোগ্যতার সঙ্গে এই কাজ করে গেছেন। এ কাজ থেকে অবসর নিয়ে তিনি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব ইংলিশ। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁর রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মডার্ন রিভিউ, ক্যালকাটা রিভিউ, পাটনার হিন্দুস্থান রিভিউ, ফরোয়ার্ড ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধ বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। এইসব রচনার মধ্যে অনেকগুলিই গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়ে সংরক্ষিত হবার উপযুক্ত, কিন্তু এখনো তা সংকলিত হয় নি।

বললেন, "আমার এসব রচনার বিষয় ছিল রাজনীতি ও ভারতীয় অর্থ-নীতি বিষয়ক।"

তিনি যে ভারতের বিষয় বরাবর চিন্তা করে গিয়েছেন, রচনাগুলি থেকেই তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

তাঁর শিক্ষকদের কথা তাঁর মনে পড়ছে আজ। প্রথমেই তাঁর মনে পড়েছে রিপন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বসুর কথা, এঁর কাছে

তিনি পড়েছেন বহুদিন আগে, কিন্তু আজও তাঁর কথাই তাঁর মনে হয় সর্বপ্রথম। উপেন্দ্রনাথ হরেন্দ্রকুমারের জীবনে তাহলে নিশ্চয়ই প্রভাব বিস্তার করে গেছেন।

বললেন, "অতি সজ্জন ব্যক্তি ইনি। যশোহর জেলার জঙ্গলবাদাল গ্রামে তাঁর বাড়ি। ইস্কুলে পড়েছি এঁর কাছে। তার পর অনেকদিন কেটে গেছে। আমি তখন বাংলার কলেজসমূহের ইন্সপেক্টর। কলেজ দেখে দেখে বেড়াতে হয়। সেবার রিপন কলেজ পরিদর্শনে গিয়েছি। কলেজের পিছনেই রিপন ইস্কুলটা। আমার মাস্টারমশাই উপেন্দ্রনাথের কথা আমার মনে পড়ল। আমি স্কুলে গেলাম। গিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলাম। আমি তখন মস্ত লোক, একজন ইন্সপেক্টর, পরনে কোট-প্যান্ট। উপেনবাবু আমাকে চিনতে পারলেন না, তিনি আশ্চর্য হয়ে তাকালেন আমার দিকে। বললাম, সার্, আমি আপনার ছাত্র— এই স্কুলেই একদিন পড়েছি আপনার কাছে। তিনি তখন চিনতে পারলেন। আমাকে আশীর্বাদ করলেন, বললেন, এতদিন বাদে গুরুদক্ষিণা দিতে এসেছ।"

একটু থেমে বললেন, "এর পরেও উপেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। তিনি রিপন ইস্কুলের কাজ থেকে রিটায়ার করে তাঁর গ্রাম জঙ্গলবাদালে একটা হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করছিলেন। সেই ব্যাপারে আসতেন। ইউনিভার্সিটি তাঁর ইস্কুল রেকগনাইজ করে। এর জন্য আমিও একটু চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু দেশবিভাগ হল, সব ভেস্তে গেল।"

আজ ৩রা অগস্ট। তিন-দিন বাদে ৬ই অগস্ট তারিখে সার সুরেন্দ্রনাথের মৃত্যুবার্ষিকী। রিপন কলেজে সুরেন্দ্রনাথের কাছে তিনি পড়েছেন। এ কথাও মনে পড়েছে তাঁর। বললেন, "সুরেন্দ্রনাথ আমাদের পড়াতেন বার্ক। তাঁর কাছ থেকে ইংরেজির পাঠই কেবল নয়, জীবনের পাঠও পেয়েছি অনেক। দেশের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ সুরেন্দ্রনাথের ছিল, তিনি সেই অনুরাগ সঞ্চার করে দিয়েছেন তাঁর ছাত্রদের মধ্যে। আমরা যখন এনট্রান্স পড়ি, তখন থেকেই তাঁর সংস্পর্শে আসি। সুরেন্দ্রনাথ তখন স্কুলেরও দু-একটা ক্লাস নিতেন। দেশপ্রীতিকে যদি পলিটিক্স বলা যায়, তা হলে সুরেন্দ্রনাথের কাছ থেকেই আমার পলিটিক্স-শিক্ষা।"

যে শ্রদ্ধা করতে জানে, শ্রদ্ধা পাবার অধিকারী একমাত্র সেই। হরেন্দ্রকুমারের জীবন শ্রদ্ধায় পূর্ণ। যাঁর কাছ থেকে তিনি জীবনে সামান্যতম শিক্ষাও লাভ করেছেন, তাঁর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা আছে এবং সেই কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধার রূপে দেখা দিয়েছে। তাই তিনি তাঁর মাস্টারমশাই উপেন্দ্রনাথকে বিস্মৃত হন নি, প্রথম সুযোগেই তাই তাঁর মস্তক সেই শিক্ষকের পাদমূলে প্রণত হয়েছে। এইজন্যেই আজ তিনি শ্রদ্ধেয় এবং পশ্চিমবাংলার রাজ্যপাল রূপে তাঁর এই নিয়োগও তাঁর প্রতি জাতীয় শ্রদ্ধার একটি নিদর্শন।

হরেন্দ্রকুমার কোনো রাজনৈতিক দলের নন। তিনি একজন শিক্ষাবিদ। তাঁর এই নিয়োগের মধ্যে তাই কোনো রাজনীতি নেই। একজন শ্রদ্ধাশীল সজ্জনের প্রতি এ হচ্ছে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন। রাজ্যপাল রূপে তাঁর নিয়োগের এই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। মানুষের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, তাঁর চরিত্রের দৃঢ়তা, তাঁর স্বভাবের সরলতা এবং জীবনের একাগ্র নিষ্ঠাই আজ তাঁকে এই সুউচ্চ আসনের অধিকারী করেছে। তিনি এখানে অধিষ্ঠিত হয়ে তাঁর জীবনের সরল ধারা থেকে তাই বিচ্যুত হন নি। তাই তিনি অতি সহজ ও সাধারণ হয়েও অনন্যসাধারণ।

বললেন, "১৯৫১ সালের ১লা নবেম্বর গবর্নর রূপে আমি শপথ গ্রহণ করি। শপথ-গ্রহণ-অনুষ্ঠান শেষ হবার পরেই আমি চললাম সার্ যদুনাথের কাছে। তাঁর কাছে আমি পড়েছি, তিনি আমার শিক্ষক। আমাদের তিনি পড়াতেন টেনিসনের এনক আরডেন। যদুনাথের বাড়ি চিনি নে, খুঁজে খুঁজে বার করলাম। বললাম, সার্, আমি গবর্নর হয়েছি।"

শিশুর সরল হাসি ফুটে উঠল তাঁর মুখে। তিনি এই কথা বলে একটু থামলেন। জিজ্ঞেস করলাম, "সার্ যদুনাথ কি বললেন।"

"কিছু না। আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। শেষে বললেন, আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, আমার ছাত্র আজ গবর্নর হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম, সার্, এতদিন আপনাদের নিজের বাড়িতে ডাকতে পারি নি। এবার চলুন, এবার আমার মস্ত বাড়ি—কবে যাবেন বলুন, কা'কে কা'কে সেদিন আসতে বলব?"

যদুনাথের নির্দেশ-অনুসারে রাজভবনে একদিন সুধীজনের সমাবেশ হল। হরেন্দ্রকুমার এজন্যে যেন বিশেষ গৌরবান্বিত।

সেই সমাবেশ এখনো চলেছে। যে রাজভবন ছিল দেশের জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, সেই রাজভবন এখন হয়ে গেল সর্বসাধারণের। এখানে বাংলার কেবল সংগতিসম্পন্ন নয়, সংস্কৃতিসম্পন্নদের অবাধ গতিবিধি আরম্ভ হল। বাংলার কীর্তনের এবং পাঁচালি গানের আসর বসতে আরম্ভ করল এখানে। যেখানে হত বল-নাচ, এখন সেখানে কীর্তিত হয় চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলী এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালি। বাংলার হৃদয়ের সঙ্গে সহৃদয় সম্পর্ক স্থাপিত হল রাজভবনের।

স্কুল-কলেজে শিক্ষা-বিতরণ ছিল যাঁর জীবনের কাজ, তিনি আজ নূতন ভবনের নবশিক্ষক হয়েছেন। এখানে বসে তিনি দেশবাসীর মনে নূতন শিক্ষার ধারা প্রবর্তন করায় রত। তিনি দেশবাসীর মনে নূতন প্রেরণার বীজ উপ্ত করার ব্রত নিয়েছেন বলা চলে। সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা ক'রে প্রত্যেকের মধ্যে শ্রদ্ধার স্রোত প্রবাহিত করে দেওয়াই যেন তাঁর কাজ। বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতি, আচার ও আচরণের প্রতি সকলকে শ্রদ্ধাশীল করে তোলাই যেন তাঁর একাগ্র অভিপ্রায়। রাজভবনের কঠিন ফরম্যালিটির মধ্যে বসেও তাই তিনি সম্পূর্ণ ইনফরম্যাল ; তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হলে তাই বাহ্যিক আড়ম্বরের কৃত্রিমতা মুহূর্তে উধাও হয়ে যায়।

বলেছি, তিনি ভালোবাসেন কাজ এবং ভালোবাসেন মানুষ। যাঁরা ছিন্নমূল হয়ে এসেছেন পূর্ববঙ্গ থেকে তাঁদের প্রতি হরেন্দ্রকুমারের সহানুভূতি প্রবল। তাঁদের দুঃখ ও অভাব দূর করার জন্যে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি নেই। ১৯৫১ সালের ১লা নবেম্বর তিনি রাজ্যপাল হয়েছেন, সেই দিন থেকেই তিনি উদ্বাস্তুকল্যাণে মনোনিবেশ করেছেন। আমেরিকার ক্রিশ্চিয়ান চার্চ এক শ বেল্ গরম কাপড় পাঠিয়েছে। আমেরিকার মিশনারীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রে হরেন্দ্রকুমার এই ব্যবস্থা করেছেন ; ভারত-সরকার এই আমদানির উপর কোনো শুল্ক ধার্য করেন না। বললেন, বেশ ভালো কাপড়। আপনি-আমি পরতে পারি। এইগুলো বিলি করি উদ্বাস্তুদের মধ্যে। তা

ছাড়া, বাংলার ভূতপূর্ব গবর্নর আর. জি. কেসির মারফত অস্ট্রেলিয়া থেকে আনাই উল। উদ্বাস্তু রমণীরা এই উল দিয়ে জামা বোনেন, সেগুলি বিতরণ করা হয়, উদ্বৃত্ত হলে তা বিক্রি করা হয়।"

এ ছাড়া বিভিন্ন উদ্বাস্তুপল্লীতে নলকূপ বসাবার ব্যবস্থা করেছেন। পুরুষ নারী শিশু সকলের মধ্যে ধুতি শাড়ি শার্ট হাফপ্যাণ্ট পাজামা ফ্রক বিতরণ করেন। বিস্কুট লজেঞ্চ দেন কলকাতার একটা প্রতিষ্ঠান বিনামূল্যে— তাও বিলি করা হয়। গুঁড়োদুধ ডিম ও ওষুধ বিতরণ করেন তাঁরা। বললেন, "এজন্যে কমিটি গঠিত হয়েছে। দৈনিক খরচ দেড় হাজার টাকা। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এই টাকা ওঠে। প্রয়োজনের তুলনায় এ সামান্যই। জনসাধারণের আরো সহযোগিতা পেলে কাজ আরো সহজ হয়।"

প্রকৃত হৃদয়বান্ জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর একদিন-না-একদিন হয়ই। যতই নিভৃতে আর যতই নেপথ্যে বাস করুন-না কেন। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করার পর তার নূতন গঠনতন্ত্র-রচনার সময় তাই দিল্লি থেকে আহ্বান এল বাংলার এই শিক্ষাবিদের কাছে। তিনি কন্‌স্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লির ভাইস প্রেসিডেণ্ট হলেন। সে সময় ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের অসুস্থতার সময় শিক্ষাবিদ্ হরেন্দ্রকুমার ভারতের গঠনতন্ত্র-প্রণয়নের কাজে যোগ্যতার পরিচয় দিতে পেরেছেন। মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ করার সময় পুরো আড়াই মাস তিনি ছিলেন কন্‌স্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লির কর্ণধার এবং তিনি তর্কবিতর্কের দুস্তর তরঙ্গ অতিক্রম করে নিরাপদ কিনারে এনে পৌঁছে দিলেন যেন নৌকো। একজন সাহিত্যের অধ্যাপকের পক্ষে এরূপ একজন সুদক্ষ আইনজ্ঞের ভূমিকা গ্রহণ এবং সে কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারা, সাধারণ কাজ নয়। এ কাজে হরেন্দ্রকুমারের শক্তি ও প্রতিভায় সকলেই বিস্মিত হয়।

হরেন্দ্রকুমার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন বহুদিন থেকে। তিনি ১৯৩৭ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত বাংলার আইনসভার সদস্য ছিলেন। তিনি দুইবার অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চিয়ান্সের সভাপতি হন। এই কাউন্সিলের অরগ্যানাইজিং সেক্রেটারী হয়ে সংগঠকের ভূমিকা গ্রহণ করে

তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করেন। রেলের তৃতীয়শ্রেণীর কামরায় একজন সাধারণ যাত্রিরূপে তিনি বেরিয়েছিলেন অভিযানে। সারা ভারতের খৃষ্টানদের মধ্যে চেতনা ও জাগরণ আনয়নের উদ্দেশে। উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু ব্যতীত ভারতের সর্বত্র তিনি গমন করেন এবং সেই সঙ্গে তদানীন্তন ভারতের রাজকীয় ৩০টি স্টেটও তিনি পরিভ্রমণ করেন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৪ এই সাত-আট বছর তিনি একটানা এই কাজে লিপ্ত থাকেন। তাঁর এই সফর দেখে এবং এই সফরের সাফল্য দেখে সর্দার প্যাটেলের দৃষ্টি পড়ে তাঁর উপর এবং এইজন্মেই হয়তো তিনি গঠনতন্ত্র-প্রণয়নের জন্মে আহূত হন দিল্লিতে।

১৯৪৭-৪৮ সালে মাইনরিটি সাবকমিটির চেয়ারম্যান হন হরেন্দ্রকুমার। বললেন, "আমি অভিমত জানালাম যে, ভারতীয় খৃষ্টান সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা চায় না। ভারতের মোট জনসংখ্যার কাছে ভারতীয় খৃষ্টান শতকরা মাত্র একজন; সংখ্যায় এত কম হওয়া সত্ত্বেও যদি ভারতীয় খৃষ্টান সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী হতে পারে, তাহলে মুসলমান শিখ ইত্যাদি যাদের সংখ্যা অনেক বেশি তারা এ বাঁটোয়ারা চাইবে কেন।"

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতবাসীকে সর্বপ্রথম মনে করতে হবে যে, সে একজন ভারতীয়। আগে ভারত, তার পর রাজ্য, তার পর সম্প্রদায়। নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করতে পারায় যে পুলক, হরেন্দ্রকুমারের চোখে-মুখে তার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখা গেল।

ফোন এল। দারজিলিঙে দেশবন্ধু-স্মৃতিমন্দির সম্বন্ধে তিনি টেলিফোনে কথা বললেন। সেপ্টেম্বরের শেষে তিনি যাচ্ছেন দারজিলিঙে নিজে তদারক ও তদ্বির করতে।

কিন্তু, কে জানত তাঁর সব কাজ সম্পাদনের পূর্বেই তাঁর স্মৃতিমন্দির সম্বন্ধেও ভাবতে হবে আমাদের।

তাঁর জীবনের অনেক স্বপ্ন ও অনেক সাধ অপূর্ণ রেখে সহসা তিনি লোকান্তরিত হলেন—১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ২২এ শ্রাবণ, ৭ই অগস্ট ১৯৫৬।

রবীন্দ্র-ভারতীর উদ্যোগে ঐ দিন রবীন্দ্র-স্মারকের ভিত্তিস্থাপন তিনি করবেন, এইরূপ স্থির ছিল। পনেরো বৎসর পূর্বে এই দিনে রবীন্দ্র-

নাথ লোকান্তরিত হন। রবীন্দ্র-ভারতী এই আমন্ত্রণপত্র প্রেরণ করেন সকলকে—

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২২ শ্রাবণ, ৭ অগস্ট, সকাল আটটায় নিমতলা শ্মশানে রবীন্দ্র-স্মারকের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হইবে। মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় শিলান্যাস করিবেন।

আপনার উপস্থিতি প্রার্থনা করি। ইতি

১৭ শ্রাবণ ১৩৬৩
৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন
কলিকাতা-৭

বিনীত
শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
সাধারণ সম্পাদক

প্রাতে আমরা নিমতলা-শ্মশানে সমবেত হই। তখন সংবাদ আসে যে, অসুস্থতার জন্যে তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর পরিবর্তে কর্তব্য সম্পাদন করেন।

অসুস্থতার জন্যে হরেন্দ্রকুমার উপস্থিত হতে পারবেন না বুঝতে পেরে অসুস্থ শরীরেই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে লিখে পাঠান—

'কবির মরদেহ যেখানে বিলীন হয়ে গিয়েছে আজ সেখানে রবীন্দ্র-ভারতী একটি স্মারকচিহ্ন স্থাপন করতে উদ্যত হয়েছেন। জাতির ও যুগের মহা-সৌভাগ্যে রবীন্দ্রনাথের মত কবি জন্মগ্রহণ করেন, তাঁদের স্মারক লেখা হয় কালের খাতায় অক্ষয় অক্ষরে, তাঁদের বস্তুতঃ বাহ্য স্মৃতিচিহ্নের কোনো প্রয়োজন নেই। হিন্দুশাস্ত্রে আছে প্রাণবায়ু যখন মহাবায়ুতে মিশে যায় দেহের আকাশ যখন অমৃতময় মহাকাশে বিলীন হয়ে যায় তখন ভস্মেই দেহের অন্ত হয়। সে অন্ত একেবারেই অন্ত। তখন যা স্মরণীয় থাকে তা হল সেই ব্যক্তির আচরিত কর্ম, সেই ব্যক্তি সারাজীবন পরমনিষ্ঠার সঙ্গে যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গিয়েছেন সেই যজ্ঞ। এ কথা রবীন্দ্রনাথ নিজেও বার বার বলে গিয়েছেন; বলেছেন, তাঁর স্মৃতি তাঁর গীতির মধ্যেই গাঁথা থাকবে, তাঁর

স্মৃতি ছড়িয়ে থাকবে চৈত্রের শালবনে। বস্তুতঃ মহাকবিদের সম্বন্ধে এই কথাই শেষ কথা। তাঁর ভাষাতেই বলা যায়—

মরণসাগরপারে তোমরা অমর,
তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর,
তোমাদের স্মরি।
সংসারে জ্বেলে গেলে যে নব আলোক
জয় হোক, জয় হোক, তারি জয় হোক—
তোমাদের স্মরি॥

এই যে মৃত্যুত্তীর্ণ কালজয়ী কবি, বিশ্বের মহাকবিদের অমরসভায় যাঁর গৌরবের আসন, যিনি নতুন করে বাঙালীর মুখে ভাষা দিয়েছেন, সুখে দুঃখে মিলনবিরহে আনন্দ-উৎসবে বিচ্ছেদবেদনায় যাঁর গান আমাদের অবলম্বন, আমাদের জীবনের প্রত্যেক দিক যিনি গভীরভাবে অনুরঞ্জিত করে নতুনভাবে সৃষ্টি করলেন, তাঁর কি কোনো স্মৃতিচিহ্নের প্রয়োজন আছে? কিন্তু তবু মানুষের মন সীমিত, সে প্রতীককে আঁকড়ে ধরতে চায়, তাই স্ট্রাটফোর্ড অন আভনেও সেক্সপীয়রের মূর্তি স্থাপনা না করে মানুষ পারে নি। আজ রবীন্দ্রনাথের দেহবিলয়ের এই পুণ্যস্থানে যে প্রতীক প্রতিষ্ঠার উদ্যম হয়েছে তা বাহ্য-আড়ম্বরে কবির খ্যাতি-প্রচারের কোনো বৃথা চেষ্টা করবে না, সেখানে কোনো সমারোহের প্রয়োজন নেই; সে কেবল আমাদের মনের আশ্রয়, আমাদের অন্তরের অনির্বাণ শ্রদ্ধার বাহ্য প্রতীক মাত্র। আমাদের অন্তরের সেই শ্রদ্ধা পবিত্র হোমাগ্নির মত প্রজ্বলিত থাক, যে মহাসৌভাগ্যে আমাদের দেশে আমাদের কালে রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সৌভাগ্যের মহা উত্তরাধিকার আমরা যেন বিস্মৃত না হই, তাঁর বাণী চিত্তে বহন করি, তাঁর কর্মধারার অনুসরণ করি— এই কামনা সফল হোক।'

রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তাঁর এই শ্রদ্ধা-নিবেদনই তাঁর জীবনের শেষ শ্রদ্ধা-নিবেদন, এবং তাঁর জীবনের শেষরচনা।

ফোন রেখে হেসে বললেন, "আর একটা ইচ্ছে আছে। টি.বি. বা টাইফয়েড থেকে সেরে ওঠার পর মধ্যবিত্ত রোগীদের থাকার জায়গা হয় না। তাদের জন্যে করতে চাই একটা ডরমিটরি। মেদিনীপুরের দিঘায় দশ প্লট জমি একজন ইংরেজ দান করতে চান। এ বিষয়ে কথাবার্তা চলেছে— এখনো পাকাপাকি কিছু হয় নি।"

সাধারণ মানুষের জন্যে তিনি চিন্তা করে চলেছেন একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে, গবর্নর হিসাবে নয়। মানুষের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ ব'লে তিনি বোধ করে থাকেন— এতেই যেন তাঁর তৃপ্তি।

বললেন, "এই আমার জীবন। অসাধারণ কিছু নেই।"

নিজের চোখে নিজেকে অতি সাধারণ তাঁর মনে হতে পারে, তাঁর কথাবার্তা চাল-চলন অতি সাধারণ হতে পারে, কিন্তু তিনি অসাধারণ। তাঁর জীবনের যত সঞ্চয় তার কিছুই তিনি নিজের ব'লে রাখেন নি। দেশের কল্যাণের জন্যে দান করেছেন। গবর্নর হবার আগে তিনি নয় লক্ষ টাকা দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। ১৯৫২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়কেই দিয়েছেন আরো এক লক্ষ টাকা— এর শর্ত হচ্ছে এই যে, এর সুদ থেকে বাংলার ছেলেদের প্রতি বৎসর সামরিক শিক্ষার জন্যে দেরাদুনের প্রিন্স অব ওয়েলস মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে পাঠাতে হবে। ১৯৫৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছেন আরো দুই লক্ষ দশ হাজার সাত শত টাকা— ভারতে ও ভারতের বাইরে গিয়ে বাংলার মেয়েদের উচ্চ ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্যে এই টাকা যেন ব্যয়িত হয়, এই হচ্ছে এই দানের শর্ত।

একজন শিক্ষাবিদ্ তাঁর জীবনের পুঁজি এইভাবে নিঃশেষে ব্যয় করেছেন। তাই তিনি অসাধারণ হয়েও সাধারণ।

বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম। বললেন, "আবার আসবেন।"

দরজা পার হতেই আবার সেই পুরাতন পরিস্থিতি ও পুরাতন পরিবেশ। রাজভবনের পোশাকী সৌজন্য। আরদালি চাপরাশি বেয়ারা এডিকং সবাই চলেছে এগিয়ে দিতে। মনে হল, আমার আগে আগে যেন চলেছে ফরম্যালিটির মস্ত মিছিল।

রচিত গ্রন্থাবলী

Indians in British Industries
Congress and the Masses
He follows Christ
Why Prohibition ?
Hemp-drug in India
Opium and its Prohibition

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ মনে পড়ে অনেক দিন আগের কথা— যখন আমরা পড়তাম ইস্কুলে, যখন আমরা দুলে দুলে মুখস্থ করতাম পাঠ্যকেতাবের কবিতা। তখন লম্বা লাইনের দীর্ঘ কবিতা দেখলেই আতঙ্কে প্রায় হিম হয়ে যেতাম। সে-কবিতা টানা মুখস্থ করা যাবে কি করে— এই ছিল ভয়। কবিতার রস কিংবা তার মানের দিকে নজর ছিল না আদপে, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে সেটা কি করে কণ্ঠস্থ করা যায়, এইটেই ছিল একমাত্র চেষ্টা।

আজ সেই সুদূর অতীতের কথা মনে পড়ছে, মনে পড়ছে তখনকার মুখস্থ-করা কবিতার ছত্র—

হিমগিরি-কোণে দেবদারু-বনে
পাগ্‌লা-ঝোরার ধারার ন্যায়
অশ্রুদরিয়া ঝরিয়া ঝরিয়া
মিলিত ভারতে ভাসায়ে যায়।

বাস্ চলেছে ঝাঁকি দিতে দিতে, সেই ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে ছত্রগুলি ঝংকৃত হয়ে উঠছে আমার মনের মধ্যে।

কবি করুণানিধানের কাছে চলেছি— করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। হাওড়ার বাস্ থেকে নেমে বালিখালের বাস্ ধরলাম, বালিখাল থেকে নিলাম শ্রীরামপুরের বাস্। ভদ্রকালীর শিমুলতলা লেনে তিনি এখন বাস করছেন।

ছিয়াত্তর বছর বয়স হয়েছে। কিন্তু কথা এখনো খুব চোখা, এখনো কথায় সরসতা আছে। বললেন, "আমাদের আমলটা ছিল অন্য রকম। তখন কবিতার মধ্যে কৃত্রিমতা ছিল না। এখন দেখছি নানা রকম আর্ট হয়েছে।"

কবিতাকে যদি বলা যায় জীবনের একটা জলছবি, কিংবা মনের একটা প্রতিবিম্ব— তাহলে করুণানিধানের এই উক্তিকে মেনে নিতে হয়। আমাদের জীবন এখন হয়েছে জটিল, বাহিরের পালিশ বজায় রাখার দিকে এখন আমরা যতটা উৎসাহী, ভিতরের রং ঠিক রাখার দিকে ততটা উদ্‌যোগ

নেই। মনের রং চটে গেছে, সেই লোকসান আমরা পূরণ করছি বাইরের চোখ-ধাঁধানো জলুস দিয়ে। পারছি কি না জানি নে, অন্ততঃ চেষ্টা আমরা করছি। এখনকার অনেকের কবিতায় এই নতুন জীবনের প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে, তাতে চাকচিক্য হয়তো পাচ্ছি, কিন্তু চমক পাচ্ছিনে। যে-কবিতা আর যাই হোক, আসলে তা বিরস। এই ধরনের কবিতা সম্বন্ধেই হয়তো করুণানিধানের এই মন্তব্য।

তাঁদের আমল অন্য রকম ছিল, ছিল সরল ও স্বাভাবিক। যে কথা বিদ্যুতের মত চমক দিয়ে উঠত মনের আকাশে, সেই কথা তাঁরা বিজলীর রেখায় এঁকে যেতেন খাতার পাতায়, শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করে তাকে ক্ষণিকের ফুলঝুরি করে তুলতেন না।

বিদ্যুৎও চিরস্থায়ী নয়, ফুলঝুরিও নয়। কিন্তু তবু বিদ্যুতে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের যে জ্বলন্ত প্রমাণ আছে, কাব্যে আমরা তাই প্রত্যাশা করি। এবং সেইজন্যেই করুণানিধানের কাব্যের প্রতি আমাদের এত টান। বললেন, "আমাদের আমলে এইসব কবিতার খুব কদর ছিল, এখন দেখছি তেমন আর নেই। আরো কিছুদিন বাদে হয়তো এটুকুও থাকবে না। আসলে এসব তো চিরন্তনী কবিতা নয়, এর আয়ুর একটা সীমা আছে। তা পার হলেই মরে যাবে।"

এর জন্যে কোনো খেদ নেই, কোনো আক্ষেপ নেই করুণানিধানের। এ যেন তিনি জেনে ও মেনে নিয়েছেন; কিন্তু তাঁর আক্ষেপ কেবল কবিতার কৃত্রিমতা নিয়ে। কেবল কাব্যে কেন, কৃত্রিমতা মাত্রেই নিন্দনীয়। তা কাব্যেই হোক আর বাক্যেই হোক।

সহজ কথা সহজ করে বলার মধ্যে যে সততা আছে, করুণানিধান সেই সততার অধিকারী।

কথার কারিকুরি দিয়ে চমক সৃষ্টি ক'রে এক রকমের কবিতা রচনা করা যায়। কিন্তু চমক যেমন চমকেই শেষ হয়ে যায়, ঐ কারিকুরির বাহাদুরিও তেমনি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। ক্ষণস্থায়ী এই সৌভাগ্য লাভ করায় যাঁদের অভিরুচি তাঁদের প্রকৃত কবি ব'লে স্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু নগদ-

বিদায়ের উপরেই যাঁদের ঝোঁক বেশি তাঁরা আমাদের স্বীকার করা বা না-করা গ্রাহ্য করবেন— এমন আশা করা ঠিক না। আমরাও না হয় তাঁদের গ্রাহ্য না করলাম।

কোনো রকমের কৃত্রিমতা বা আড়ম্বর করুণানিধানের কবিতাকে স্পর্শ করতে পারে নি। বাইরের প্রকৃতি এবং এই কবির নিজের প্রকৃতির মধ্যে যেন বিশেষ পার্থক্য নেই। বাইরের প্রকৃতি যেমন নিজে নিজেই নিজের খুশিতে পুলকিত ও পুষ্পিত হয়ে ওঠে, করুণানিধানের কবিপ্রকৃতিও ঠিক তেমনি। পোশাকী সাজের চেয়ে আটপৌরে সজ্জাই করুণানিধানের কাব্যের বিশেষত্ব। কোনো দক্ষ মালীর হাতের যত্নে একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্দির মধ্যে শৌখিন বাগান রচিত হয় নি তাঁর কাব্যে, করুণানিধানের কবিতা হচ্ছে বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে নিসর্গলালিত একটি কানন, হিসেব করে সাজিয়ে-গুছিয়ে বসানো নেই কোনো লতা কিংবা কোনো গুল্ম, অথচ সব মিলে-মিশে প্রকৃতির এক অপরূপ রূপের সৃষ্টি হয়েছে।

করুণানিধান প্রকৃতির কবি। কিন্তু এই কথাই সব কথা নয়, করুণানিধান প্রকৃত কবি।

প্রকৃত কবির লক্ষণ আছে অনেক। তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে— প্রকৃত কবিতা রচনা করা। আর-একটা লক্ষণও আছে, নিজের খ্যাতি সম্বন্ধে উদাসীনতা হচ্ছে সেই লক্ষণ। জনপ্রিয়তা-অর্জনের জন্যে কাঙালপনা করা প্রকৃত কবির স্বভাব নয়, প্রকৃতিও নয়। করুণানিধান প্রকৃত কবির এই দ্বিবিধ লক্ষণে লক্ষ্মীমন্ত।

জনপ্রিয়তা-অর্জনের জন্যে জনতার চাহিদার যোগানদার হতে হয়। কিন্তু করুণানিধান যোগানদার ছিলেন নিজের মনেরই চাহিদার। বাইরের প্রকৃতিতে যখন শুরু হত উৎসব, বর্ষায় যখন 'আকাশের কোলে কোমল কাজল' ফুটে উঠত, ঝাউয়ের বনে ঝালর উঠত দুলে, তখন কবিও নিজেকে সেই উৎসবে দিতেন মত্ত ক'রে। এতেই ছিল তাঁর আনন্দ। কবির সেই আনন্দ-উল্লাস আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে অকৃত্রিম কবিতার রূপে। অভ্রের চূর্ণ আকাশে নিক্ষেপ ক'রে মেকি তারকার ঝিকিমিকি তিনি দেখান নি, নগদ-বিদায়ের

কাঙাল ছিলেন না ব'লে তিনি সুদূর নীলাম্বরের দেশ থেকে খাঁটি তারার ঝিলিমিলি নিয়ে এসেছেন আমাদের জন্যে।

জনতার হাততালি দিয়ে কাব্যের বিচার হয় না, কাব্যের বিচার রসবোদ্ধার করজোড় নমস্কারে। করুণানিধান সেই নমস্কার লাভ করেছেন। তিনি সার্থক কবি।

এই সার্থকতার হেতু আছে। বিশ্বপ্রকৃতিকে পরমাত্মীয়-রূপে গ্রহণ ক'রে ধন্য হয়েছেন করুণানিধান। তাঁর কবিতার ছত্রে-ছত্রে প্রকৃতির সেই পরিচিত পদধ্বনি ছন্দে ছন্দে বেজে চলেছে। প্রকৃতির কোনো রূপ কিংবা কোনো শোভা আবিষ্কারের উচ্চকণ্ঠ উল্লাস নেই তাঁর কাব্যে ; বর্ণনা-কালে সকলের জানা এবং সকলের দেখা শোভারই কথা যেন স্বগতোক্তিতে তিনি বলেছেন, এই রকম অনাড়ম্বর ভঙ্গির জন্যেই তাঁর কবিতায় এই আন্তরিক সুর ধ্বনিত হয়েছে।—

চলিলাম গৃহে, গ্রামপথে ধুলা, সাপ গেছে পার হয়ে,
কোথাও পাখির নখের ভঙ্গি—চোখে পড়ে রয়ে রয়ে।

গ্রামপথের ধুলার উপর এই অস্পষ্ট চিহ্নগুলিও কবির দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্যের অতলে তিনি ছিলেন একজন ডুবারি। সেই নিবিড় নেপথ্য-লোকে নিজেকে লুক্কায়িত রেখে সর্বাঙ্গে যেন মেখে এসেছেন প্রকৃতির বর্ণ গন্ধ ও সুষমা।

বহিঃপ্রকৃতির স্বপ্নে স্বপ্নাবিষ্ট কবি অন্তঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন মনে করলে ভুল হবে। মানবমনের দুঃখসুখ আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রেমপ্রীতি কামনা-বেদনা প্রভৃতি বিবিধ ভাবের সঙ্গে কবির যোগ ছিল অন্তরঙ্গ।

যে-কবি যেখানেই .বাস করুন, তাঁর আবাসস্থল থেকে কাব্যতীর্থের দূরত্ব সমান। এই দূরত্ব লাঘব করার জন্যে যদি কোনো কবি সময় ও শক্তির ক্ষয় করেন তা হলে তাঁকে প্রকৃত কবি যেমন বলা যায় না, তাঁকে বুদ্ধিমান কবি বলাও তেমনি দুরূহ। করুণানিধানের কবিতা পাঠ ক'রে যখন মুগ্ধ হতে হয় তখন তাঁর বুদ্ধির তারিফও করতে হয়। তিনি আজ কাব্যতীর্থের যশোমন্দিরে উপনীত। জীবনের কোনো দুর্বল মুহূর্তেও তিনি কাব্যতীর্থের

দীর্ঘপথটি সংক্ষিপ্ত করে নেবার জন্যে চেষ্টা করেন নি। একনিষ্ঠ পরিব্রাজকের মত তিনি ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে পথপরিক্রমা ক'রে চলেছিলেন। আত্ম-প্রত্যয় না থাকলে এইভাবে তীর্থযাত্রা সম্ভব নয়।

শনিবারের বিকেল। ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৩, ২৬এ ভাদ্র ১৩৬০। ভদ্রকালীর শিমুলতলা লেনে বসে তাঁর কথা শুনছি। অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর জীবনের সাক্ষী হয়ে তিনি বসে আছেন। খালি গা, খালি পা, মুখ-ভরতি সাদা দাড়ি।

বললেন, "১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ নভেম্বর (১২৮৪ বঙ্গাব্দের ৫ অগ্রহায়ণ) তারিখে শান্তিপুরে আমার জন্ম। আমার পিত্রালয় আর মাতুলালয় দুইই শান্তিপুরের রাস্তার এপারে ওপারে। আমি ছিলাম আমার ঠাকুরদার আদুরে নাতি।"

শান্তিপুরেই তাঁর জন্ম এবং শান্তিপুরেই তাঁদের নিবাস বটে, কিন্তু তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায়। সে সময় গুপ্তিপাড়ায় ভীষণ ম্যালেরিয়া হত। এইজন্যে করুণানিধানের পিতামহ চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার-পরিজনবর্গকে ম্যালেরিয়ার কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে গুপ্তি-পাড়ার পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করে শান্তিপুরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। চন্দ্রনাথ মিশনারি সাহেবদের কাছ থেকে সামান্য ইংরেজি শিখেছিলেন। তাঁর এই ইংরেজী জ্ঞানের জোরে তিনি কলকাতার বিলাতি সদাগরি আপিসে চাকরি পান। বেতনও সেকালের তুলনায় সামান্য ছিল না— মাসিক এক শত টাকা। চন্দ্রনাথ কলকাতায় দুটি বাড়ি তৈরি করেন, একটি ডফ স্ট্রীটে, আর-একটি আহেরীটোলা স্ট্রীটে। কিন্তু সে গৃহ এখন আর তাঁদের নেই। পিতামহ চন্দ্রনাথের অবস্থা-বিপর্যয়ে সে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়ে গেছে।

করুণানিধানের পিতা নৃসিংহচন্দ্র শিক্ষকতা করে জীবিকা অর্জন করেন। তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে কাজ করেন। পিতার সঙ্গে সঙ্গে করুণানিধানও স্থান থেকে স্থানান্তরে যান। বালক করুণানিধানের জীবনে এই জন্যেই হয়তো একটা অস্থিরতার বীজ উপ্ত হয়। তাঁর পরবর্তী জীবনে তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পিতা নৃসিংহের শিক্ষকতা-জীবন শুরু হয় চব্বিশ-পরগনা জেলার বরিষা বেসরকারি স্কুলে ; পরে তিনি দুমকা ও পঞ্চকোট প্রভৃতি সরকারি স্কুলে কাজ করেন। তাঁর কাজে আন্তরিকতা ও যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁর উপর বিশেষ প্রীত হন এবং পঞ্চকোট রাজস্কুলের শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার ও উন্নতি সাধনের ভার ন্যস্ত করেন নৃসিংহের উপর।

পিতা এবং মাতা উভয়ের জীবনের প্রভাবেই করুণানিধানের জীবন প্রভাবিত। তাঁর মাতা নিস্তারিণী দেবী শান্তিপুরের বিখ্যাত সংস্কৃত কবি রামনাথ তর্করত্নের সহোদরা ভগিনী। নিস্তারিণী দেবীর জীবনে কাব্যসাধনার যে উত্তাপ লেগেছিল, স্নেহের উত্তাপের সঙ্গে তিনি পুত্রের জীবনে সেই উত্তাপও দান করেছিলেন। এইজন্যেই সম্ভবত জীবনারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে করুণানিধানের জীবন হয়ে ওঠে কাব্যমনের আধার।

বললেন, "শান্তিপুরে আমার জন্ম। কিন্তু শৈশবকালে কাটে কলকাতায়। ডফ স্ট্রীটে। আমার পিতার আমি একমাত্র সন্তান। পিতামহের তাই আদুরে নাতি ছিলাম। ডফ স্ট্রীটে পিতামহের কাছেই থাকতাম। পাঁচ বছর বয়সে কলকাতায় আমার হাত-খড়ি হয়। তার পর ভর্তি হই পাঠশালায়।"

তখন কলকাতায় সব পাড়াতেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালা ছিল। ডফ স্ট্রীটের কাছে হাতিবাগান লেনে এবং তার কিছু দূরে মানিকতলায় ছিল দুটি পাঠশালা। এই হাতিবাগানের পাঠশালায় কিছুদিন পড়ার পর তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে ইনফ্যাণ্ট ক্লাসে ভরতি হন। তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ছয়।

বললেন, "ছেলেবেলা থেকে কলকাতাতেই জীবন কাটে। শান্তিপুরে যেতাম মাঝে মাঝে। কখনো বা আম খেতে, কখনো বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বিয়ে উপলক্ষ্যে।"

এর পর করুণানিধানকে যেতে হয় দূরে। তাঁর পিতা নৃসিংহ চাকুরির জন্যে বাইরে বাইরেই কাটাতেন। এবার তিনি পুত্রকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে। করুণানিধানের বয়স তখন দশ-এগারো, এই সময় তাঁর উপনয়ন হয়। উপনয়নের পর তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ে যান বি.এন. রেলওয়ের আদরা স্টেশনের

সন্নিকটস্থ গোবিন্দপুরে। এই সময় তাঁর পিতার উপর পঞ্চকোট রাজস্কুলের সংস্কারের ভার পড়ে। তিনি পিতার সঙ্গে সেখানে গিয়ে পঞ্চকোট রাজস্কুলে ভরতি হন। এইখানে বালক করুণানিধান প্রান্তরের ও পাহাড়ের পরিবেশের মধ্যে যেন পেয়ে গেলেন meet nurse for a poetic child। তাঁর কবি-মন এখানে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

পিতা নৃসিংহ সাহিত্যরসিক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ কড়ি ও কোমল তাঁর কাছে ছিল এবং তিনি স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন। বালক করুণানিধানের কাছে এই গ্রন্থ ও পত্রিকা বিশেষ প্রিয় হয়ে উঠল। তিনি অবসর সময়ে এইগুলি পাঠ করে কাটাতেন এবং তাঁর মনে বাহিরের প্রকৃতি অসীম আনন্দ দান করত। জীবনের যা-কিছু চাহিদা তার সবই যেন পেয়ে গেলেন করুণানিধান। কল্পনাপ্রবণ মনের পক্ষে যে পরিবেশ দরকার, পঞ্চকোট যেন সেই পরিবেশের একটি ভাণ্ডার বলে তাঁর মনে হতে লাগল।

বললেন, "প্রথম কবিতা লিখতে আরম্ভ করি এখানেই। তখন আমার বয়স দশ-এগারো হবে। মানভূমের এই পল্লী আমার জীবনে যে আনন্দ দান করেছে তেমন আনন্দের সাক্ষাৎ আর কোনোদিন পাই নি। এদিকে পঞ্চকোট-পাহাড়, ওদিকে মণিহারা-পাহাড়— দূরে শালদিয়ার জঙ্গলে বাঘের ডাক। পাহাড় দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল। কেন যে এরূপ মোহাবিষ্ট হয়েছিলাম, বলতে পারি নে।"

এখানে যেসব কবিতা তিনি রচনা করেন তা কোনোদিন ছাপা হয় নি। বললেন, "ছাপা উচিতও নয়। সেসব তো ঠিক কবিতা নয়, তাকে বলা যায় কাব্যজীবনের উদ্যোগপর্ব— ওটা প্রস্তুতির প্রথম ধাপ মাত্র।"

জীবন ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু জীবনে হঠাৎ দেখা দিল দুর্যোগ। অল্প সময়ের ব্যবধানে তাঁর পিতা ও পিতামহ লোকান্তরিত হলেন। ১২৯৭ সাল, করুণানিধানের বয়স তখন তেরো, এই সময় তাঁর পিতামহ মারা যান। পিতার শ্রাদ্ধে পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে নৃসিংহচন্দ্র শান্তিপুরে আসেন। তারপর

শান্তিপুরের মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে পুত্রকে ভরতি করে দিয়ে তাঁর কার্যস্থলে চলে যান। এর অল্প কয়েক বছর পর তাঁর মৃত্যু হয়।

পুত্রকে শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ দায়িত্ব পড়ল মাতা নিস্তারিণী দেবীর উপর। স্বামীর আত্মীয়স্বজনদের চক্রান্তে তাঁদের যা-কিছু সম্পত্তি তা থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন। নিঃস্ব ও রিক্ত হওয়া সত্ত্বেও নিস্তারিণী দেবী পুত্রকে শিক্ষাদানে বিরত হলেন না। তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টায় করুণানিধানের পাঠে কোনো বিঘ্ন ঘটল না।

বললেন, "১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুল থেকে দ্বিতীয় বিভাগে আমি এনট্রান্স পাস করলাম। এর পর মায়ের চেষ্টাতেই কলকাতার জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে এফ.এ. ক্লাসে ভরতি হলাম।"

এর আগে থেকেই তাঁর কবিতা-প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে। হরতকীবাগান শাস্ত্রপ্রচার কার্যালয় থেকে প্রকাশিত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'বিংশ শতাব্দী' নামক পত্রিকায় তাঁর প্রথম কবিতা মুদ্রিত হয়। বললেন, "কবিতাটির নাম, যতদূর আজ মনে পড়ে, সিন্ধুতটে। এর কয়েক বছর পর ১৩০৭ সালে শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত মোজাম্মেল হক সম্পাদিত 'লহরী' পত্রিকায় বর্ষায় তন্তুবায় নামক কবিতা ছাপা হয়।"

যখন তিনি এফ.এ ক্লাসের ছাত্র, সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশের হৃদয় জয় করে সগৌরবে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। তরুণ করুণানিধান বিবেকানন্দের আদর্শে অনুরক্ত হয়ে বাগবাজারের পশুপতি বসুর গৃহে স্বামীজীর সম্বর্দ্ধনা-সভায় একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। বললেন, "লেখাটা সে সময় প্রকাশিত হয় 'সময়' নামক একটি পত্রিকায়। তার সবটা মনে নেই—

এস এস এস বিবেকানন্দ
ভারতের ধ্রুব পূর্ণচন্দ্র।

গোড়ার এই দুটি ছত্র কেবল মনে পড়ছে।"

কলেজের পাঠ ও কাব্যসাধনা— একসঙ্গে এই দুটি তিনি উৎসাহের সঙ্গে করতে পারেন নি। কাব্যের প্রতি উৎসাহটা স্বভাবতই ছিল বেশি। তিনি এফ.এ. পরীক্ষায় পাস করতে পারলেন না। ছাত্রজীবন এখানেই শেষ হয়ে

যেত, কিন্তু মাতা নিস্তারিণী দেবীর চেষ্টায় করুণানিধানকে পুনর্বার পড়তে হল। তিনি এবার মেট্রোপলিটন ইন্‌স্টিটিউশনে এফ. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। এবং ১৮৯৯ সালে এফ. এ. পাস করলেন।

কলেজ বদল করা হল, কিন্তু মনের কোনো বদল হয় নি। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনে পড়ার সময় সহপাঠী বন্ধুদের নিয়ে একটা সাহিত্য-গোষ্ঠী সেখানে গড়ে উঠেছিল। এরই আকর্ষণে করুণানিধানকে ফিরে যেতে হল পুরাতন শিক্ষানিকেতনে। জেনারেল অ্যাসেমব্লিজে গিয়ে তিনি বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন। এখান থেকে ১৯০১ ও ১৯০২ উপরোউপরি দু বছর পরীক্ষা দিয়েও তিনি পাস করতে না পেরে ছাত্রজীবন শেষ করলেন।

তাঁর পিতার জীবনের কিছু প্রভাব তাঁর উপর পড়ে থাকবে। তাঁর পিতা শিক্ষকতার কাজ আরম্ভ ক'রে স্থান থেকে স্থানান্তরেই কেবল ঘুরেছেন। সেই ভবঘুরে জীবনের রেশ এসে পড়ে করুণানিধানের উপর। তিনি ছাত্র-জীবনের উপর সমাপ্তি টেনে নূতন জীবনের সন্ধানে বহির্গত হলেন। কিন্তু সে-জীবনও তাঁকে এক জায়গায় বেশি দিন বেঁধে রাখতে পারল না। বললেন, "জীবনটা ছিল কেমন যেন উচ্ছৃঙ্খল। কাব্যসাধনার পক্ষে এই রকমের জীবনই উৎকৃষ্ট। এতে যে কবিতা হয়, তা উচ্ছৃঙ্খল কবিতা। এবং উচ্ছৃঙ্খল কবিতাই সার্থক কবিতা। হিসেব-করা নিয়ম-মানা জীবনেরও যেমন কোনো ছন্দ নেই, এই ধরনের কবিতাও তেমনি ছন্দহারা।"

কথাটা বলে তিনি হাসলেন। মনে হল, এখন এই বৃদ্ধ বয়সে আবার তেমনি একটা জীবন পেলে নূতনভাবে তিনি যেন আবার লিখতে বসেন নূতন কবিতা।

ছাত্রজীবনের পর তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করলেন। মাতার অনুরোধে সংসারের অর্থকৃচ্ছ্রতা দূর করার জন্যে তাঁকে নিতে হল চাকরি। বললেন, "শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল হাইস্কুলে দ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে মাসিক ষোলো টাকা বেতনে আমি কাজ নিলাম। আমার চাকুরি-জীবনের এই হচ্ছে সূত্রপাত।"

শান্তিপুরের ইস্কুলে কাজ করার সময় তাঁর চোখে পড়ে সংবাদপত্রের একটি বিজ্ঞাপন। তিনি দরখাস্ত করেন। এর ফলে গাইবান্ধা হাই-

স্কুলের চতুর্থ শিক্ষকের পদে তিনি মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এখানে তিনি মনের মত সঙ্গী পেয়ে গেলেন— তাঁর সহকর্মী 'খিচুড়ি' প্রণেতা সাহিত্যিক বেনোয়ারিলাল গোস্বামী। কিন্তু বিধি বাম, কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁর হাত-পা ফুলতে আরম্ভ করল। বাধ্য হয়ে তিনি গাইবান্ধা ত্যাগ করে চলে এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে তিনি বিপাকে পড়লেন। কোথাও কোনো কাজ পান না। তাঁর এই অবস্থা দেখে কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালায় মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করলেন। দৈনিক এখানে পাঁচ ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়, এইজন্যে এ কাজ করুণানিধানের সহ্য হল না। মাস ছয় বাদে দৈনিক তিন ঘণ্টা কাজ করবেন এই শর্তে কুড়ি টাকা বেতনে তিনি যোগ দিলেন এডোয়ার্ড ইনস্টিটিউশনে। কলকাতায় তিনি সঙ্গী পেলেন ভালো— দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ইত্যাদির সঙ্গে সুখেই তাঁর দিন অতিবাহিত হচ্ছিল। কিন্তু মাসিক কুড়ি টাকায় দুই কুল রক্ষা করা কঠিন— একদিকে সংসার, একদিকে কাব্যসাধনা।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু করুণানিধানকে নিয়ে গেলেন দেওঘরে। সেখানে তাঁর পুত্র সুধীরচন্দ্রের গার্ডিয়ান-টিউটার রূপে তাঁকে নিযুক্ত করলেন। মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনে, থাকা-খাওয়া ফ্রী। এতে অনেকটা সুরাহা হল, কবির কাব্যসাধনা অব্যাহতভাবে চলল। কিন্তু এ চাকরিও তো পাকা নয়। ছয় মাস যেতে না যেতেই এ চাকরিরও আয়ু ফুরিয়ে এল। তিনি হুগলী গবর্নমেণ্ট ব্র্যাঞ্চ স্কুলে পঁচিশ টাকা বেতনের একটা চাকরি জোগাড় করলেন। এখানেও মাস দুয়ের বেশি তিনি টিকতে পারেন নি, অতঃপর উত্তরপাড়া গবর্নমেণ্ট স্কুলে ত্রিশ টাকা মাসিক মাইনে ও তিন টাকা শস্য-ভাতায় নিযুক্ত হলেন। এবং এখানে একটানা পাঁচ বছর কাজ করলেন।

গাইবান্ধায় থাকাকালে ১৩০৯ বঙ্গাব্দে তিনি পঁচিশ বছর বয়সে বিবাহ করেন খড়দহের কুলিনপাড়ার লালবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কন্যা ধরাসুন্দরী দেবীকে। এইজন্যেই তাঁর উপর সংসার চালনার বাড়তি ভার পড়ে। এবং

এই ভার বহনের শক্তি অর্জনের জন্যেই তিনি বিভিন্ন স্কুলের চাকরি গ্রহণ ও বর্জন করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন উত্তরপাড়ায়। এবং সাংসারিক দায়িত্বের চাপেই সম্ভবত এখানে টিকে থাকতে হল পাঁচ বছর।

এখান থেকেই করুণানিধানের জীবনে সাফল্যের সূত্রপাত হয়। এখানে তাঁর আয়ও বাড়ে। হুগলি ও উত্তরপাড়ায় প্রাইভেট টিউশনি করে মাসে মোট পঞ্চাশ টাকা রোজগার হয়। এর আগে তাঁর দুটি বই প্রকাশিত হয়েছে ১৩০৮ সালে বঙ্গমঙ্গল ও ১৩১১ সালে প্রসাদী; উত্তরপাড়ায় আসার পর ১৩১৮ সালে তাঁর তৃতীয় ও শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ ঝরাফুল প্রকাশিত হয়। প্রসাদী পাঠ করার পর সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৃষ্টি বিশেষভাবে তাঁর উপর পড়ে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার তিনি ব্যবস্থা করেন।

বললেন, "তখন রবীন্দ্রনাথের বাহবা পাবার জন্যে আমরা উন্মুখ। সুধীন্দ্রনাথ কবির কাছে আমাকে নিয়ে গেলেন। খুব ভয় আর খুব সংকোচের সঙ্গে গেলাম। কিন্তু এ-পরীক্ষায় পাস করে গেলাম।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বঙ্গকবিকুলের অন্যতম বলে সাদর সম্বর্ধনা জানালেন। 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ঝরাফুলের সুদীর্ঘ প্রশংসামূলক আলোচনা প্রকাশ করেন নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শনে'। এতে করুণানিধানের খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বাংলার বিশিষ্ট কবি-পর্যায়ে উন্নীত হন, এবং অদ্যাবধি সেই উন্নত আসনে অধিষ্ঠিত।

ঝরাফুলের ভূমিকায় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর করুণানিধান সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করেন তাই বস্তুত করুণানিধানের প্রকৃত পরিচয়। সুধীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"তিনি প্রকৃতির দুলাল, প্রকৃতির রহস্যভাণ্ডারের চাবি চুরি করিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত লুকানো ঐশ্বর্য দেখিয়া আসিয়াছেন ও বালকের ন্যায় সরল প্রাণে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে গীতে ছন্দে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। ...সামান্য উপকরণে, ঘরোয়া কথার উপমা সজ্জিত করিয়া এরূপ সৌন্দর্যসৃষ্টি আধুনিক কাব্যসাহিত্যে অতি বিরল। কবির সমস্ত কবিতাগুলিতে দেশীভাবের একটা মিঠে গন্ধ আছে, গ্রাম্যবধূর একটি সরল সলজ্জ ভাব আছে— কবিতাগুলি যেন ছবির পর ছবি।"

১৯১৪ সালের কাছাকাছি সময় তিনি উত্তরপাড়া গভর্নমেণ্ট স্কুল থেকে হাওড়া গবর্নমেণ্ট স্কুলে বদলি হন। এখানে থাকার সময় তাঁর পুরাতন বন্ধু জেনারেল অ্যাসেমব্লিজের সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য সতীর্থ সতীশচন্দ্র বাগচী ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের চেষ্টায় তিনি সার্ আশুতোষের নজরে পড়েন। এবং এরই ফলে ১৯১৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল-কলেজের কর্মীরূপে এক শত টাকা বেতনে বহাল হন, তিনি হন সুপারভাইজার অব ল-কলেজ মেসেস। ১৯৩৮ সালে একষট্টি বৎসর বয়সে তিনি এই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বর্তমানে মাসিক আশি টাকা হারে পেনসন পান।

নেপথ্যে বাস করাই করুণানিধানের জীবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নিভৃত সাধনাই তাঁর জীবনের যেন চরম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সাড়ম্বর সংবর্ধনার পক্ষপাতী তিনি নন। এসব সত্ত্বেও অনুরাগীদের অনুরোধ তাঁকে রক্ষা করতে হয়েছে। ১৯৪৬ সালে বাংলার সাহিত্যিকগণ তাঁকে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে সংবর্ধিত করেন। এ ছাড়া জামসেদপুর চলন্তিকা সাহিত্য-সমিতি, কাশী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ই.আই. রেলওয়ে ইনস্টিটিউট, বর্ধমান সাহিত্য-পরিষৎ, সিঁথি বৈষ্ণব সাহিত্যসম্মেলন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সময় তাঁকে সংবর্ধনা করেছেন ও মানপত্র দিয়েছে। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের (১৯৪৯) ৭ই মাঘ তারিখে কবির ৭৩ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে কলকাতার মূল বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ তাঁকে সংবর্ধনা করেন। এই সংবর্ধনা-সভায় বাংলার নবীন ও প্রবীণ সাহিত্যিকগণ উপস্থিত থেকে করুণানিধানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে (খ্রী ১৯২৯) কবির পত্নীবিয়োগ হয়। তাঁর শরীরও ভেঙে পড়ে। তার পর চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি ভবঘুরের জীবন যাপন শুরু করেন। প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণের জন্যেই সম্ভবত তাঁর এইরূপ ভেসে ভেসে বেড়ানো। মাঝে এসে আশ্রয় নেন ভদ্রকালীতে।

কিন্তু এখানেই শেষ না জীবনের। তাঁর জীবনের শেষ দিন এসে গেল কিছু দিন পরেই। শান্তিপুরে তাঁর জন্ম, জীবনের শেষ শান্তির স্বাদ গ্রহণের জন্যে তিনি সর্বশেষে এলেন শান্তিপুরে। ২২এ মাঘ ১৩৬১, ৫ই ফেব্রুয়ারি

১৯৫৫ শনিবার রাত্রে বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি লোকান্তরিত হন।

রচিত গ্রন্থাবলী

বঙ্গমঙ্গল। বঙ্গাব্দ ১৩০৮। খ্রী ১৯০১

প্রসাদী। বঙ্গাব্দ ১৩১১। খ্রী ১৯০৪

ঝরাফুল। বঙ্গাব্দ ১৩১৮। খ্রী ১৯১১

শান্তিজল। বঙ্গাব্দ ১৩২০। খ্রী ১৯১৩

ধানদূর্বা। বঙ্গাব্দ ১৩২৮। খ্রী ১৯২১

শতনরী। কাব্যসঞ্চয়ন। বঙ্গাব্দ ১৩৩৭। খ্রী ১৯৩০

রবীন্দ্র-আরতি। বঙ্গাব্দ ১৩৪৪। খ্রী ১৯৩৭

গীতারঞ্জন। গীতার মর্মকথা। বঙ্গাব্দ ১৩৪৮। খ্রী ১৯৪৯

ত্রয়ী: বঙ্গমঙ্গল প্রসাদী ঝরাফুল। বঙ্গাব্দ ১৩৬০

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

কিছুদিন আগেও এ-অঞ্চলটা ছিল অনেক শান্ত। গড়িয়াহাট রোড। এই রাস্তা দিয়ে গড়িয়ার হাটে যেত লোকজন আর গোরুর গাড়ি। গড়িয়ার হাট থেকে এই রাস্তা ধরেই গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে তরিতরকারি শাকসবজি ফলফুলুড়ি কলকাতার বাজারে-বাজারে চালান হত। ভোর রাত্রের দিকে অন্ধকার ভেদ করে মন্থর গতিতে চাকায় মৃদু আর্তনাদ বাজিয়ে গোরুর গাড়ি চলত এই রাস্তায়।

কিন্তু গড়িয়াহাট রোডের সেদিন এখন নেই। সে অনাড়ম্বর মন্থর জীবন ভুলে গেছে সে। এখন ব্যস্ততায় ও ত্রস্ততায় গড়িয়াহাট সরগরম। ভারি ভারি গাড়ি চলাচল করছে অনবরত দ্রুতগতিতে; কাতারে কাতারে দোকানপাট বসে গেছে রাস্তার দু পাশে। এক পাশে সার-সার কাঠের গোলা; আর-এক দিকে মনোহারি ও পানবিড়ি সিগারেটের দোকান ও রেস্তোরাঁ। অদূরে রেললাইন—অনবরত ভারি মালগাড়ির শাণিত হুইসল বেজে চলেছে।

এত ভিড় ও হৈ-হাঙ্গামার একপাশে বটগাছের ছায়ার আড়ালে, দেখে ভালো লাগল, একটা বইয়ের দোকান। দোকানের গায়ে বড় বড় হরফে বিজ্ঞাপন লেখা—অমুকচন্দ্র অমুকের অনুবাদ অন্বয় ও টীকা-সহ গীতা।

দোকানের গা ঘেঁষে কয়েক পা এগিয়েই 'ব্রহ্মবিহার'। শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রী এখানে থাকেন।

দেয়ালের পাশ দিয়ে সরু পথ। পথের শেষে সিঁড়ি। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠেই পেয়ে গেলাম একটা নিভৃত পরিবেশ। অতি নিকটের রাস্তায় ব্যস্ততার যে দৌরাত্ম্য চলেছে, এখানে পৌঁছেই তার কথা মুছে গেল মন থেকে। ছাদ-সমান উঁচু আলমারি ভরা বই, মেঝেতে মাদুর বিছানো, এক কোণে একটি ডেস্ক। ডেস্কের ওপাশে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে তিনি লেখাপড়া করছেন।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দের ১৫ই আশ্বিন আজ, ১৯৫২ সালের ১লা অক্টোবর। বেলা আড়াইটে। বাইরে প্রখর রোদ। সেই রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন

রাস্তায় ভারি ভারি গাড়ি ছুটোছুটি করছে। কিন্তু এই ঘরটিতে পৌঁছেই যেমন মন থেকে ব্যস্ততার ছবিটা মুছে গেল, রোদের ঝাঁঝের কথাও ভুলে গেলাম সেইসঙ্গে। বইয়ের দেয়াল দিয়েই এ ঘরটি তৈরি। বাইরে থেকে কোনো দৌরাত্ম্য বা কোনো উপদ্রব যাতে এখানে এসে পৌঁছতে না পারে, তারই জন্যে হয়তো এই ব্যূহ রচনা। প্রকৃতপক্ষে সেই রকম বলেই মনে হল। সমস্ত রকমের কলরব আর কোলাহল উপেক্ষা করে তিনি একান্ত মনে এখানে বসে যেন আরাধনায় রত।

অল্প দিন আগের কথা নয়, চুয়াত্তর বছর আগে তিনি পদার্পণ করেছেন পৃথিবীতে। ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ২৫এ আশ্বিন (১৮৭৮ সালের ১০ই অক্টোবর) শুক্রবার। মালদহ জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামে।

আগের থেকেই তাঁর সঙ্গে দিন ও সময় নির্দিষ্ট করা ছিল। এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের হেতুও জানানো ছিল।

আজ তিনি আমাকে দেখেই বললেন, "মনীষী? আমি ওর মধ্যে কেন?"

কেনর জবাব দেওয়া কঠিন। তাই ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল; ইচ্ছে হল যে, বলি, কেন তিনি ওর মধ্যে নন এইটুকুই প্রমাণ করে দিন। বললাম, "নিজেকে আপনি মনীষী বা স্মরণীয় মনে না করলেও পাঁচজনে যখন করে, তখন তা মেনে নিতে হবে আপনাকে।"

হাসলেন, সরস ও স্বচ্ছন্দ হাসি। সে হাসি অবিকল শিশুর মুখের হাসির মতই মনে হল, মনে হল তেমনি অকপট এবং তেমনি অনাবিল।

অতি ক্ষুদ্রাকার মানুষটি, মুখ-ভরা শ্বেত শ্মশ্রু। অনাবৃত গায়ে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বসে বললেন, "তোমাদের উদ্দেশ্যটা ভালো। কিন্তু এতে ক্ষতিরও সম্ভাবনা আছে।"

এমন দেখা গিয়াছে যে, পাঁচজনে যাঁকে শ্রদ্ধা করে, আরও দশ জন তা দেখাদেখি তাঁকে শ্রদ্ধা করে; কিন্তু কেন করে তা আদপে জানেই না; বিশেষ কোনো ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা করাটা নিয়ম বলেই যেন তা মেনে নেয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে— শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি কি জন্যে শ্রদ্ধেয় এবং জীবনে কি কি করেছেন বলে শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন, এই খবর সকলকে জানিয়ে দেওয়া।

এর দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা আছে শুনে সামান্য শঙ্কিতই হলাম। আমার মুখে আশঙ্কার ছায়া ফুটে উঠে থাকবে।

তিনি হেসে বললেন, "সংস্কৃতে এ বিষয়ে একটা শ্লোক আছে—

ফলং বৈ কদলীং হন্তি
ফলং বেণুং ফলং নডম্।
সৎকারঃ কাপুরুষং হন্তি
স্বগর্ভোঽশ্বতরীং যথা॥

কলাগাছে ফুল ফুটলে বা ফল ধরলে সে গাছ যায় ম'রে, বাঁশের ঝাড়ে ফল ধরলেও তা হয় নির্বংশ, নলখাগড়ায় ফল ফললেও তার প্রাণ যায়, অশ্বতরীর শাবক হলেই সে মারা পড়ে; কাপুরুষেরও হয় সেই দশা— তার কোনো সৎকাজ করলে, অর্থাৎ তাকে স্তুতি-প্রশংসা-সম্মান করলে, তার পতন ঘটে। কেননা তার ছাতি ফুলে ওঠে, সে ভাবে আমি কি-একটা হয়ে গেলাম।"

একটু থেমে আবার হাসলেন, বললেন, "ভাবছি, তোমাদের এই কাজে আমার বা অন্য কারো ক্ষতি হয়ে না যায়।"

এর কোনো উত্তর হয় না। তাঁর সঙ্গে হাসিতে আমিও যোগ দিলাম, বললাম, "কারো ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তাই যাদের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে তাদের ক্ষতি করতে কখনো তাদের কাছে যাব না। আমার তালিকায় তাদের নামই তাই রাখি নি।"

জবাব শুনে শাস্ত্রী মহাশয় হাসলেন. বললেন, "বেশ, এবার তোমার জিজ্ঞাস্য কি বল।"

জিজ্ঞাস্য বিশেষ কিছুই নেই। যাঁরা তাঁদের সুদীর্ঘ জীবন অধ্যয়নে আর অধ্যাপনায়, সাধনায় ও আরাধনায় কাটিয়েছেন, তাঁদের জীবনের কাহিনী তাঁদের মুখ থেকে শুনে বেড়াচ্ছি এবং হুবহু তাই লিপিবদ্ধ করে রাখছি।

বললেন, "আমার পিতামহ প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ও সাধক ছিলেন। কাশীতে পণ্ডিত-মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠা ছিল, পণ্ডিতবর্গ তাঁকে আগমচূড়ামণি বলে সম্বোধন করতেন। আমার জন্মের বছর পাঁচ আগে ১২৮০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি হরিশ্চন্দ্রপুরে নিজের বাটীতে ত্রিশক্তি স্থাপনা করেছিলেন। তখন রেল-

ইস্টিমার ছিল না, কাশী থেকে নৌকোতে ক'রে তিনি স্বগ্রামে এই ত্রিশক্তি আনেন। পিতামহের কয়েক ঘর শিষ্য ছিল। আমার পিতার নাম শ্রীত্রৈলোক্য-নাথ ভট্টাচার্য, তিনিও কিছুদিন শিষ্য-পালন করেছেন, আমি সে ধারা রক্ষা করতে পারি নি। আমার পিতার বিশেষ আগ্রহ ছিল যে, তিনি তাঁর অন্তত একটি ছেলেকে সংস্কৃত পড়াবেন। তাঁর সেই আগ্রহ তিনি আমারই উপরে প্রয়োগ করেন। টোলের ছাত্র হিসাবেই আমার সংস্কৃত-শিক্ষা শুরু।"

হরিশ্চন্দ্রপুর মধ্যইংরেজি স্কুলে তাঁর সাধারণ পাঠ আরম্ভ। এখানকার পড়া শেষ হবার পর তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছা অনুসারে সংস্কৃত-পাঠ আরম্ভ করেন। সতেরো বছর বয়সে তিনি কাব্যতীর্থ পাস করেন। সংস্কৃত পাঠের সময় কাদম্বরীকাব্য পাঠ করে তাঁর ইচ্ছে হয় যে, যে মূল গ্রন্থে এর কাহিনীটি আছে সেই গ্রন্থটি তাঁকে পাঠ করতেই হবে এবং সেই গ্রন্থ থেকে কাহিনী নির্বাচন করে তিনি সংস্কৃতে কাব্য রচনা করবেন।

তাঁর মনের এই ইচ্ছার কথা জানতে পেরে তাঁর অগ্রজ তাঁকে বলেছিলেন যে, কাব্যতীর্থ পাস করলে তিনি তাঁকে কথাসরিৎসাগর কিনে দেবেন।

কাব্যতীর্থ পাস করে তিনি কথাসরিৎসাগর উপহার পেলেন। এর পর আরম্ভ হল তাঁর কাব্যরচনার প্রচেষ্টা। কিছুদিনের মধ্যে তিনি সংস্কৃতে তিনটি কাব্য রচনা করলেন।

"প্রথমটির নাম দিই চন্দ্রপ্রভা। এই কাব্য কাদম্বরীর মত গুরুগম্ভীর গদ্যে লেখা। আরম্ভটা ছিল—'আসীৎ শশ্বদসংখ্য লোকসংঘাতসম্মর্দ বিজম্ভৃমাণ' —ইত্যাদি। এতে শ্লেষ-বিরোধাভাস প্রভৃতির অভাব ছিল না। দ্বিতীয়টি হরিশ্চন্দ্র-চরিত কাব্য— মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে এর কাহিনী নেওয়া, গদ্যে ও পদ্যে মেশানো এই কাব্য। তৃতীয়টি পার্বতী-পরিণয়।"

এর পর তিনি প্রেরিত হন কাশীতে। কাশীতে গিয়ে দর্শন ইত্যাদির চাপে পড়ে কাব্যের ঝোঁক কিছুটা ব্যাহত হয়, কিন্তু তারই মধ্যে রচনা করেন আর-একটি কাব্য, তার নাম দেন যৌবন-বিলাস। এটি ছাপাও হয়। —তখন তাঁর বয়স আঠারো। এর পর মেঘদূতের অনুরূপ একটি কাব্য রচনা করেন, তার নাম দেন চিত্তদূত।

ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতজন এসে মিলিত হতেন কাশীতে। বয়সে প্রাচীন ও জ্ঞানে প্রবীণ হবার পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করেই যেন তাঁরা আসতেন এখানে, এখানে তাঁরা যাপন করতেন কাশীসন্ন্যাস। এই কারণেই কাশী হয়ে উঠেছিল পণ্ডিত ব্যক্তিদের মিলনতীর্থ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ছিল তাঁদের ধর্ম।

আকাশে সপ্তর্ষির দ্বারা যেমন ধ্রুবতারকার সন্ধান মেলে, কাশীতে তেমন জ্ঞানের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন সপ্ত-মহামহোপাধ্যায়ের দ্বারা। তাঁদের নাম সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করলেন শাস্ত্রী মহাশয়—

১ বালশাস্ত্রী
২ তারারত্ন বাচস্পতি
৩ বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী
৪ কৈলাসচন্দ্র শিরোমণি
৫ রামমিশ্র শাস্ত্রী
৬ গঙ্গাধর শাস্ত্রী
৭ শিবকুমার শাস্ত্রী

আর এঁদেরই সঙ্গে নাম করলেন শ্রীসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর। এঁরা প্রকৃতপক্ষে ঋষিই ছিলেন। এঁরা জীবনের ধ্রুবসত্যের সন্ধান দিতে পেরেছেন।

তাঁর অধ্যাপক ছিলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৈলাসচন্দ্র শিরোমণি ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীসুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী। শিরোমণি-মহাশয়ের কাছে ন্যায় ও শাস্ত্রী-মহাশয়ের কাছে তিনি বেদান্ত পাঠ করেন। তখন কাশীতে শিরোমণি-মহাশয় শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও শাস্ত্রী-মহাশয় শ্রেষ্ঠ বৈদান্তিক। শিরোমণি-মহাশয় সকালে সরকারি সংস্কৃত কলেজে আর অপরাহ্নে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়িতে অবিরাম ছাত্রদের পড়াতেন। তিনি বদ্ধাসনে শিবনেত্রে বসতেন, আর এক-একটি ক'রে বহু বিষয় পড়াতেন। তিনি বই বা পুঁথি নিয়ে পড়াতেন না। ছাত্রেরা পুস্তক পড়ত, তাঁর এসব মুখস্থ ছিল। কাশীতে অনেক হিন্দীভাষী ছাত্র ছিলেন, শেষবয়সে তিনি বাঙালিকে হিন্দিতে ও হিন্দুস্থানীকে বাংলায় পড়িয়ে ফেলতেন। তাঁকে সকলেই মহারাজজী বলে সম্মান করত। বললেন, "আমার প্রিয় বন্ধু মহামহোপাধ্যায় ৺বামাচরণ ন্যায়াচার্য এঁরই ছাত্র ছিলেন।"

অপর দিকে তাঁর বেদান্তের অধ্যাপক শাস্ত্রী-মহাশয় ছিলেন অগ্নিহোত্রী। ইনি গঙ্গার উপরেই দারভাঙ্গার বাড়িতেই থাকতেন। বললেন, "প্রাতে আমরা দেখতাম তিনি অগ্নিহোত্র করে তার ভস্মে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে মৃগচর্মের উপরে কুশহস্তে আচমন-পূর্বক বসে আছেন, আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। সন্ধ্যাবন্দনা ক'রে আমাদের যেতে হত, প্রাতে তিনি উপনিষৎ ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্য পড়াতেন। অপরাহ্নে টীকা প্রভৃতির পাঠ হত। ব্রহ্মসূত্র ও ভাষ্য গুরুমুখে শ্রবণ করাই নিয়ম। এখানে একটা কথা মনে হচ্ছে। সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর জামাতা ছিলেন। ইনি ন্যায়ে শিরোমণি-মহাশয়েরও ছাত্র ছিলেন, শ্বশুরের নিকট ইনি বেদান্ত পড়েন। ব্রহ্মসূত্রের প্রথম চারটি সূত্রের (চতুঃসূত্রীর) ভাষ্য বেশি শক্ত, পরে তত নয়। অথচ নিয়ম রয়েছে, সমস্তটাই গুরুর মুখে শুনতে হবে। লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের এই পাঠ শ্রবণের সময় উপস্থিত। অধ্যাপক শাস্ত্রী-মহাশয়ের অন্যান্য ছাত্রের সঙ্গে আমাকেও বললেন যে, আমরাও যেন একসঙ্গে গুরুমুখে এসব শুনে রাখি।"

তাঁরা অপরাহ্নে গিয়ে দেখতেন, অধ্যাপক শাস্ত্রী-মহাশয় দেবার্চনা ক'রে অগ্নিহোত্রের ভস্মের ত্রিপুণ্ডের উপর চন্দনের তিলকে চর্চিত রয়েছেন। বেদান্তের দুরূহ গ্রন্থসমূহের পাঠ চলেছে। বললেন, "এ সম্বন্ধে আর-একটি ক্ষুদ্র কথার উল্লেখ করব। কিছুদিন পরে তিনি অতর্কিত ভাবে আমাদের বললেন— আমি আর তোমাদের পড়াতে পারব না, আমি এখন মনন করব। উপনিষদে যা অধ্যয়ন করা হয়েছে অনুকূল যুক্তির দ্বারা তা পর্যালোচনার নাম মনন। এর থেকেই বোঝা যাবে ঐ সময়ের গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতি কতটা আত্মীয়তাপূর্ণ ছিল।"

আক্ষেপ করে বললেন, "কিন্তু আমাদের আজকালকার শিক্ষা? কী করে যে সব গোলমাল হয়ে গেল, তাই ভাবি। এখন সমাজে কেবল মিথ্যা আর প্রবঞ্চনা দেখা দিয়েছে।"

একটু হেসে বললেন, "এখন একটা নিরক্ষর সাঁওতালের যে সত্যনিষ্ঠা আছে, বিধুশেখর ভট্টাচার্যের তা নেই।"

নিজের নাম করে তিনি ধিক্কার দিলেন বর্তমানের তথাকথিত শিক্ষিতদের। বললেন, "কম্‌পাল্‌সারি ফ্রী এডুকেশনের রব উঠেছে চারধারে এখন। কিন্তু এতে কম্‌পাল্‌শন্‌ও হচ্ছে ফ্রীও হয়তো হচ্ছে বা হবে— কিন্তু এডুকেশন হবে কি না তাই ভাববার কথা। আমাদের দেশের সেই ব্রহ্মচর্যপালন ও গুরুগৃহে-বাসই হচ্ছে আসলে নির্ভেজাল কম্‌পাল্‌সারি ফ্রী এডুকেশন। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার এই সূত্রটি ধরতে পেরেছিলেন, তাই স্থাপনা করেছিলেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও শান্তিনিকেতন।"

কাশী থেকে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন ১৩১১ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসে। কী উদ্দেশ্যে তিনি কাশী থেকে শান্তিনিকেতনে আসবার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন তা তিনি জানতেন না। ভবিষ্যতে সেখানে তাঁর ভালো-মন্দ কী হবে না-হবে, সে কথাও তাঁর মনেই আসে নি। টাকা-পয়সা রোজগারের কোনো প্রয়োজনও তখন মনে হয় নি। কেননা, তাঁর পিতা তখন জীবিত, আর জ্যেষ্ঠাগ্রজ সংসারের যাবতীয় ভার গ্রহণ করেছেন।

বললেন, "জমিদারি না থাকলেও কিছু পত্তনি ছিল আমাদের। বাড়িতে হাতি ছিল, ঘোড়া ছিল। হাতিটা ঠিক মনে পড়ছে না, কিন্তু মস্ত একটা ঘোড়া দেখেছি মনে আছে। আমাদের মস্ত আমবাগান ছিল, তার থেকেও আয় হত বিস্তর। এইসব কারণে টাকাকড়ি রোজগারের কথা কখনো ভাবি নি।"

অর্থকরী চিন্তায় মন বিভ্রান্ত করতে হয় নি, এই কারণে মন-প্রাণ উৎসর্গ করে তিনি অধ্যয়নে রত হতে পেরেছিলেন। সেই সময় কাশীতে শ্রীমতী অ্যানি বিসান্টের উদ্যমে ও উৎসাহে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির খুব প্রভাব ছিল। তিনি জনকয়েক বন্ধুর সঙ্গে এখানে যেতেন। এই সোসাইটি ছিল একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাগানবাড়িতে এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল একটা চমৎকার লাইব্রেরি। এইসব দেখে তাঁর মনে হত, তিনি যদি এমনি একটি নিভৃত উদ্যান এবং এমনি একটি পাঠাগার পেয়ে যান তাহলে যেন জীবন ধন্য হয়ে যায়।

বললেন, "অন্তর্যামী বিশ্বনাথ আমার অন্তরের এ প্রার্থনা নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। তাই আমার আহ্বান এল শান্তিনিকেতন থেকে। আগে বুঝি নি,

সেখানে পৌঁছে বুঝতে পারলাম। এখানে এসে দেখলাম আমার মন যা চায় এ স্থানটি তাই।"

কাশীতে তাঁরা জনকয়েক বিদ্যার্থী মিলে একটা সংস্কৃত কাগজ বের করেন। তার নাম দেন মিত্রগোষ্ঠী-পত্রিকা। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন কাশীতে এসে এই উদ্যমে যোগ দেন। তার পর কাশী ছেড়ে চলে আসার পর কাগজটা উঠে যায়।

১৩১১ বঙ্গাব্দের ১১ই বা ১২ই মাঘ দুপুরে বেনারস-ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বোলপুর পর্যন্ত একটা টিকিট কেটে বেলা দুটো-আড়াইটার সময় গাড়ি বদল করার জন্যে মোগলসরাই স্টেশনে নেমেই এক বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর দেখা। তাঁর কাছ থেকে শুনলেন. পাঁচ-ছয় দিন হল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেছেন।

বললেন, "শান্তিনিকেতনে এসে প্রথম দেখাতেই স্থানটি আমার চোখে লেগে গেল। আশ্রমটি শাল ও তালের শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত বাগানের মধ্যে। আশ্রমের বহু স্থানে উপনিষদের বহু কথা উৎকীর্ণ অথবা লিখিত। অদূরেই পুস্তকালয়— পুস্তকের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও খুব ভালো ভালো বাছাই বই ছিল। দেখলাম, আমার মনের চাহিদার সঙ্গে এর সব-কিছু মিলে যাচ্ছে। তাই, আত্ম-উৎসর্গ করলাম এই স্থানটিতে।"

আরও বললেন, "প্রথমে রবিঠাকুরের কাছে এসেছিলাম। তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও কথাবার্তায় ক্রমশই তাঁর দিকে বেশি আকৃষ্ট হই। কিছুদিনের মধ্যে কেউ রবিঠাকুর বললে কানে বাধত। যেমন দিন কাটতে লাগল মনের গতিও তেমন-তেমন পরিবর্তন হতে লাগল। তাঁকে গুরুদেব বলে উল্লেখ করতে লাগলাম।"

এখানে কেবল সংস্কৃত অধ্যাপনার জন্যেই তাঁর আগমন। এখানে নিভৃত মনোমত পরিবেশ পেয়ে গেলেন এবং পেয়ে গেলেন একটি পুস্তকাগার। তিনি এই পুস্তকাগারের সংলগ্ন একটি ছোট ঘরে নিজের নীড় রচনা করে নিলেন। নিজেকে যেন পুস্তকালয়ের একটি অংশেই রূপান্তরিত করে নিলেন। কাজ অতি অল্প, হাতে সময় যথেষ্ট, পুস্তকালয়ে ক্রমশ প্রচুর সংস্কৃত গ্রন্থও সংগৃহীত হয়েছে, তিনি তাই আকণ্ঠ ডুবে রইলেন এই গ্রন্থসাগরে।

সংস্কৃতে তাঁর জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞান ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল ; কিন্তু পালি তিনি জানতেন না। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে তিনি পালি পাঠ আরম্ভ করেন এবং ক্রমশ এই ভাষাতেও সবিশেষ জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং গ্রন্থ-রচনা করেছেন।

"শান্তিনিকেতনে আমরা ছিলাম রাজার হালে। টাকাকড়ি কম ছিল, তাতে আমরা কোনো অভাব বোধ করি নি। উৎকৃষ্ট কামিনী চালের ভাত খেয়েছি, সোনামুগের ডাল খেয়েছি, খাঁটি গব্যঘৃত খেয়েছি— এর বেশি আর কী খেলে রাজা হওয়া যায় ?"

রহস্য ক'রে বললেন, "হাতি খেলে, না, ঘোড়া খেলে ?"

মনের খোরাকের কথা আগেই বলেছেন, এবার বললেন পেটের খোরাকের কথা। বললেন, "মাইনে বলে যা পেতাম তা হয়তো সামান্যই, কিন্তু অভাব ছিল না কোনো। এখন আমরা আমাদের অভাব সৃষ্টি করতে শিখেছি, তাই দুঃখও আমাদের বারমেসে সঙ্গী হয়েছে।"

যে শিক্ষাধারায় তাঁরা মানুষ, অধ্যাপনার যে আদর্শে তাঁরা অনুপ্রাণিত বর্তমানে তার কিছুই নেই দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, "আমাদের মধ্যের সরলতা উধাও হয়ে গেছে। বাল্যকালে আমরা দেখেছি উচ্চবংশের কোনো বাড়ির বিয়ের উৎসবে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকের সহযোগিতা। যারা ঢোল বাজায় তারা জাতিতে হাড়ি, যাদের আমরা আজকাল অবজ্ঞা করে দূরে ঠেলে রাখি, কিন্তু সেকালে বিয়ে-বাড়িতে তারা ঢোল বাজাত আর গৃহস্থবাড়ির মেয়েরা সেই ঢোলের তালে তালে উৎসবের নাচ নাচত, ধোবানি এসে খাড় দিয়ে বিয়ের ক'নের হাত সাফ করে দিয়ে যেত, নাপিত-বউ এসে আলতা দিয়ে পা রাঙিয়ে দিয়ে যেত। তখন সকলে মিলে ছিল একটা গোষ্ঠী। আজকালকার শহুরে শিক্ষায় আমরা ছন্নছাড়া হয়ে যাচ্ছি। এসব প্রতিরোধ করা যায় কী করে তা ভেবে দেখতে হবে, তা না হলে আমাদের সমূহ-বিপদ।"

আগুন দিয়ে ভালো কাজও করা যায়, আবার খারাপ কাজও করা যায়। আগুনের চুল্লি জ্বালিয়ে রন্ধন ক'রে মহোৎসবও যেমন করা যায়,

তেমনি অঙ্গের ঘরে আগুনও লাগানো যায়। আমাদের বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থাকে তিনি তুলনা করলেন এই আগুনের সঙ্গে। বললেন, "আগে এ দিয়ে হত মনের প্রাঙ্গণে মহোৎসব, এখন আমাদের মনের ঘরে আগুন লেগেছে।"

সেকালের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে বললেন, "সব কালেই অবশ্য সু ও কু সমাজে পাশাপাশি বাস করে। সেকালেও কাশীতে এক জঘন্য ব্যাপার আমরা দেখেছি। সে কথাটা হয়তো সকলে জানে না; আমি আজ সে কথা জানিয়ে যাওয়া কর্তব্য বলে মনে করি।"

তিনি বলে গেলেন কাহিনীটা। কৃষ্ণানন্দস্বামীর বিরুদ্ধে কাশীর তৎকালীন কতিপয় ব্রাহ্মণের চক্রান্তের কথা। কৃষ্ণানন্দস্বামীর সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বের নাম কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। তাঁর নিবাস ছিল গুপ্তিপাড়ায়। তার পর মুঙ্গেরে তিনি প্রথমজীবনে কেরানিগিরি করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি কৃষ্ণানন্দস্বামী বলে খ্যাত হন। অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন তিনি। হিন্দুত্বের গতি করবার জন্যে তিনি ভারতের বিভিন্ন স্থানে হিন্দী ও বাংলায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। এর ফলে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে তাঁর অশেষ প্রতিপত্তি হয়। কাশীর কতিপয় ব্রাহ্মণ এতে বিদ্বিষ্ট হয়ে ওঠেন। "একজন বৈদ্য হয়ে তিনি হিন্দুত্বের ধ্বজাধারী হবেন, কোনো ব্রাহ্মণ তা বরদাস্ত করতে রাজি নন। তাঁরা কদর্য চক্রান্তের দ্বারা তাঁকে জেলে প্রেরণ করেন। সে হীন কুৎসার কথা ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। কিন্তু—" শাস্ত্রী মহাশয় জোর দিয়ে বললেন, "এ অপবাদ মিথ্যা। তার প্রমাণ আমি জানি।"

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রাখালদাস ন্যায়রত্ন তখন কাশীবাসের জন্য সেখানে যান। এলাহাবাদ জেল থেকে কৃষ্ণানন্দস্বামী মুক্তি লাভ করে ফিরে এসেছেন কাশীতে। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র হরকুমার ভট্টাচার্য 'শঙ্করাচার্য' নামে এক নাটক লেখেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় রত্ন চিনতেন। তিনি পুত্রকে পরামর্শ দিলেন যে, নাটকটি নিয়ে যেন কৃষ্ণানন্দস্বামীকে শুনিয়ে তাঁর মতামত নেওয়া হয়। শাস্ত্রী মহাশয় হরকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে কৃষ্ণানন্দস্বামীর কাছে যান। নাটকটি শুনে কৃষ্ণানন্দের চোখে জলের ধারা নাবে।

বললেন, "মানুষের মধ্যে পদার্থ না থাকলে সে কখনো এমন অভিভূত কি হয়?"

তা ছাড়াও নাকি আছে এক প্রমাণ। তখন তাঁরা কাশীর এক পণ্ডিতের বাড়িতে যেতেন। সেখানে গিয়ে একদিন বৈঠকখানার মেজেতে পুরাতন একটি চিঠি পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি চিঠিটি পড়লেন।

বললেন, "তাতে কৃষ্ণানন্দের কথা লেখা। লেখক হচ্ছেন বঙ্গবাসীর সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বসু। তিনি লিখেছেন—'কেড়ো বাঘ ফাঁদে পড়েছে, কিছুতে ছাড়া নয়।'—কৃষ্ণানন্দের বিরুদ্ধে চক্রান্তের এটা একটা দলিল।"

ত্রিশটি বৎসর তিনি কাটিয়েছেন শান্তিনিকেতনে। ছাব্বিশ বছর বয়সে তিনি এখানে আসেন, তার পর একে একে জীবনের সমস্ত শক্তি ও সাধনা তিনি এখানে উজাড় করে দেন। তাঁদের সমবেত চেষ্টায় যেমন গড়ে ওঠে শান্তিনিকেতন, তেমনি তাঁরা নিজেও ক্রমশ গঠিত হয়ে ওঠেন এখানে। 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্'— এই বেদবাক্যটি সার্থক হয়ে উঠেছে যেখানে সেই শান্তিনিকেতনের কথায় তিনি পঞ্চমুখ। বিশ্বভারতী সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে বললেন, "টাকা দিয়ে সহজেই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, বিশ্বভারতী স্থাপন করা যায় না। আমার তো মনে হয়, যা প্রকৃত বিপদ তাই সম্পদের আকারে এখন দেখা দিয়েছে ওখানে।"

বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি সম্মানিত ও সম্বর্ধিত হয়েছেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আচার্য রূপে শ্রীজওহরলাল নেহরু এঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট) উপাধি দান করে সম্মানিত করেন।

বাইরের রাস্তা থেকে ভারি ট্রাকের আওয়াজ আসছিল মাঝে মাঝে, মাঝে মাঝে মালগাড়ির ছুটন্ত হুইসলের শব্দও পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু সেসব শব্দ এসে এখানে কোনো বিঘ্নের সৃষ্টি করতে পারে নি।

পুজোর উৎসব শেষ হয়েছে, দু দিন আগেই গিয়েছে বিজয়াদশমী; শাস্ত্রী-মহাশয়কে প্রণাম ও কোলাকুলি করতে এসেছেন এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি কয়েকটি কীর্তনের আসরের গল্প করলেন। উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে

উঠল শাস্ত্রী-মহাশয়ের বৃদ্ধ চোখ দুটি। করতালের মত কেঁপে উঠল তাঁর দুটি হাত। তাঁর এই উৎসাহ দেখে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি বললেন, "আপনি বৈষ্ণব কি বৌদ্ধ কি শাক্ত কি ব্রাহ্ম—কিছু বুঝবার উপায় নেই।"

শিশুর সারল্যে আবার হাসলেন শাস্ত্রী-মহাশয়। সে হাসিতে যেন স্বীকৃতি আছে যে, তিনি নিজেও জানেন না, তিনি কি।

গড়িয়াহাট রোডে বিকেল নেমেছে। আপিস-আদালত বন্ধ। তবু ভিড় বন্ধ হয় নি। যানবাহনে রাস্তা ঠাসাঠাসি। দুটো বাস্ মুখোমুখী হয়ে মাঝরাস্তায় আটক পড়ে গেছে। যেন কোলাকুলি করছে তারা। পুলিশের বাঁশি বাজছে, বাস্এর হর্ন বাজছে। তবুও রাস্তা পরিষ্কার হচ্ছে না।

গীতা-গ্রন্থের বিজ্ঞাপনটা পড়লাম ভালো করে। লাল হরফে লেখা বড় বড় অক্ষর। বিজ্ঞাপনের বহর দেখে মনে হল, এ যেন গীতার নয়, বহরের ননীর বিজ্ঞাপন, অথবা কোনো লিপস্টিকের।

শাস্ত্রী-মহাশয়ের কথাটা মনে পড়ল, "সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল চারদিকে। চারদিকে কেবল গলাবাজি আর প্রপাগাণ্ডা। এতে জীবন থেকে আমাদের সার উপে যাচ্ছে, আমরা ভেজালের ভক্ত হয়ে পড়ছি। আসল আর মেকি ধরা এখন দায়। ছিলাম আমরা পুরুষ, এখন যা হচ্ছি তা কাপুরুষ।"

সংস্কৃত শ্লোকটা আওড়াতে আওড়াতে ফিরে এলাম, 'ফলং বৈ কদলীং হন্তি—।'

রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

ন্যায়প্রবেশ। আচার্য দিঙ্‌নাগ-কৃত। দ্বিতীয় খণ্ড। মূল তিব্বতী। সংস্কৃত ও চীনা পাঠের সঙ্গে উপমিত। ভূমিকা, তুলনামূলক টীকা, সূচীপত্র সম্বলিত।

ভোটপ্রকাশ। তিব্বতী পাঠাবলী (Tibetian Chrestomathy), ভূমিকা, সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ, টীকা, মূল পাঠ ও শব্দাবলী— সংস্কৃত থেকে তিব্বতী, তিব্বতী থেকে সংস্কৃত।

আগমশাস্ত্র। গৌড়পাদ-কৃত। মূল সংস্কৃত। রোমান হরফে এবং ইংরেজি ভাষায় ব্যাখ্যাত। বিস্তৃত ভূমিকা সহ।

আগমশাস্ত্র। গৌড়পাদ-কৃত। নাগরী অক্ষরে মূল সংস্কৃত কারিকা ও সংস্কৃতে লিখিত ব্যাখ্যা। সূচীপত্র সহ।

The Basic Conception of Buddhism: being the Adhar Chandra Mookherjee Lectures, 1932. Calcutta University.

শতপথব্রাহ্মণ। মাধ্যন্দিন শাখা। প্রথম দুই খণ্ড।

মিলিন্দপ্রশ্ন। মূল পালি ও বঙ্গানুবাদ। দুই খণ্ড।

পালিপ্রকাশ। অর্থাৎ পালিভাষার ব্যাকরণ পাঠাবলী শব্দকোষ ও বিস্তৃত ভূমিকা।

প্রাতিমোক্ষ। অর্থাৎ বিনয়পিটকে ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ। মূল পালি বঙ্গানুবাদ ও বৃহৎ ভূমিকা।

মহাযানবিংশক। নাগার্জুন-কৃত। তিব্বতী ও চীনা থেকে পুনরুদ্ধৃত সংস্কৃত পাঠ ও ইংরেজি অনুবাদ।

বিবাহমঙ্গল। হিন্দু-বিবাহের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে বিবিধ মূল মন্ত্র ও বাক্যের মূল সংস্কৃত ও অনুবাদ।

চতুঃশতক। আর্যদেব-কৃত। তিব্বতী থেকে পুনরুদ্ধৃত মূল সংস্কৃত ও তিব্বতী পাঠ। চন্দ্রকীর্তি-কৃত টীকার সার-সহিত।

মধ্যান্তবিভাগসূত্রভাষ্যটীকা। স্থিরমতি-কৃত। তিব্বতী পাঠের সঙ্গে উপমিত মূল সংস্কৃত। বহু টিপ্পনী-সহিত। ইটালির রয়াল অ্যাকাডেমির অধ্যাপক জি. তুচ্চির সঙ্গে একত্র সম্পাদিত।

যোগাচারভূমি। প্রথম খণ্ড। অসঙ্গ-কৃত। তিব্বতীর সঙ্গে উপমিত মূল সংস্কৃত।

The Historical Introduction to the Indian Schools of Buddhism. In the volume: History of Philosophy—Eastern and Western. Sponsored by the Ministry of Education, Government of India.

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুর। কলকাতা থেকে রেলপথে ১২৫ মাইল দূরে বাংলার এই স্বনামধন্য জনপদ। একদা এখানে যে ঐশ্বর্য ছিল আজও তার স্বাক্ষর চারিদিক ছড়ানো— এক শত আটটি কারুকার্যখচিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এই জনপদের গৌরবময় দিনের সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্দিরের মেখলা যেন পরানো আছে এই নগরীর শ্রোণীদেশে। এই বিষ্ণুপুর, এ বিষ্ণুপুর কেবল মন্দিরের ও সপ্তবাঁধের জন্যেই বন্দিত নয়, সংগীতের সাধনা-কেন্দ্ররূপেও বিষ্ণুপুর নন্দিত। গানের জগতে একে বলা হয় দ্বিতীয় দিল্লী, ১৭০০ খৃষ্টাব্দ থেকে বিষ্ণুপুরের এই খ্যাতি আরম্ভ হয়।

১৯৫৩ সালের ২২ নবেম্বর, ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার, সংগীত-নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিষ্ণুপুরের এবং তাঁর নিজের জীবন-কাহিনী শুনছি। বললেন, "আমার যখন পাঁচ বছর বয়স, তখন থেকে পিতার কাছে গান শেখা আরম্ভ করি। পিতার শিক্ষা ও মাতার উৎসাহ না পেলে হয়তো আমার কিছু হত না। পিতা কোনো কাজে কখনো যদি বিদেশে যেতেন, তখন আমি যাতে নিয়মিত রেওয়াজ করি সেদিকে মাতার কড়া নজর ছিল। গানের প্রতি আমার মায়েরও স্বাভাবিক টান ছিল, আমার মাতৃকুলেরও অনেকে নাম-করা গাইয়ে।"

গোপেশ্বরের পিতা অনন্তলাল বিষ্ণুপুর-রাজের সভা-গায়ক ছিলেন! তিনি বিষ্ণুপুরের একজন খুব বড় ওস্তাদ ছিলেন। তাঁরা বিষ্ণুপুরে যে অঞ্চলে বাস করতেন, তার নাম হয়েছে তাই ওস্তাদপাড়া। বিষ্ণুপুরের এই ওস্তাদপাড়ার নিভৃত ঘরে বসে গোপেশ্বর একে একে বলে চলেছেন গানের ইতিহাস।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরের মহারাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ বিষ্ণুপুরে গানের চর্চা আরম্ভ করেন। যে আমলে রেল হয়নি; দিল্লী থেকে আসতে কম করে দুই মাস সময় লাগত। সেই সময় তিনি দিল্লী থেকে তানসেনের বংশধর বাহাদুর সেনকে (অনেকে ভুল ক'রে বাহাদুর খাঁ বলেন) আনান।

তাঁকে মাসিক পাঁচ শ টাকা দক্ষিণা দিয়ে রাখেন এবং চারদিকে ঢাক পিটিয়ে দেন যে, যার গলা ভালো এমন লোকের রাজবাড়িতে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। ওস্তাদ জোগাড় করে এইভাবে গানগাইবার জন্যে উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করান তিনি। গদাধর চক্রবর্তী, নিতাই নাজির, বৃন্দাবন নাজির, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য প্রভৃতি বাহাদুর সেনের কাছ থেকে গান শিক্ষা করেন। বললেন, "আমার পিতা রামশঙ্করের শিষ্য ছিলেন।"

গোপেশ্বরের পিতা অনন্তলাল যখন বিষ্ণুপুরের রাজসভা-গায়ক তখন বিষ্ণুপুরের মহারাজা ছিলেন দ্বিতীয় গোপাল সিংহ দেব বাহাদুর। তখন বিষ্ণুপুররাজের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে এসেছে, তবুও রাজা গোপাল সিংহ গুণী ও সাধকদের মুক্তহস্তে বৃত্তি দিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু সে-বৃত্তির পরিমাণ বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না। অনন্তলাল অর্থের প্রলোভনে বিষ্ণুপুরের আচার্য-পদ ত্যাগ ক'রে কোথাও চলে যান নি। প্রকৃতপক্ষে তিনিই বিষ্ণুপুরের সর্বশেষ রাজসভা-গায়ক। মহারাজা গোপাল সিংহ অনন্তলালকে "সংগীত কেশরী" উপাধি দেন।

বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের আর্থিক অবস্থা হীন হয়ে পড়ায় অনন্তলালের পর থেকেই বিষ্ণুপুরের অবস্থা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। অনেক উচ্চশ্রেণীর গায়ককে বাধ্য হয়ে বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে।

বললেন, "ভারতবর্ষে সংগীতের কোনো বিদ্যালয় ছিল না। আমার পিতা এই দিকে পথপ্রদর্শক। মহারাজা দ্বিতীয় গোপাল সিংহের ছেলে রামকৃষ্ণ-দেবের সহযোগিতায় তিনিই ১৮৮৫ সালে সংগীত-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন বিষ্ণুপুরে। এর পর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর গানের ইস্কুল খোলেন কলকাতার বাগবাজারে, নাম দেন 'বঙ্গসংগীত বিদ্যালয়'; তারপর বরোদার মহারাজার সাহায্যে প্রফেসর মৌলাবক্স ঘিসে খাঁ 'সংগীত-পাঠশালা' নাম নিয়ে বরোদায় স্কুল খোলেন; তারপর গানাচার্য বিষ্ণু দিগম্বর বোম্বাইতে স্কুল খোলেন এবং লখনউতে মরিস কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।"

বিষ্ণুপুরের সেই স্কুলের এখন নূতন দালান হয়েছে এবং নূতন নাম হয়েছে —'রামশরণ মিউজিক কলেজ'। সংগীত-নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এই

কলেজের এখন প্রিন্সিপাল। এখান থেকে গানের ডিগ্রি দেওয়া হয়— মেয়েদের 'গীতসরস্বতী' ও ছেলেদের 'গীতবিশারদ'। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে বছরে গড়ে চার-পাঁচ জন ডিগ্রি পায়। এখানে পৃথক হোস্টেলও আছে— বিদেশের ছাত্ররা সেখান থেকে গান শিক্ষা করার সুবিধে পায়।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার এই বিষ্ণুপুরেই শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই গানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এবং সংগীত-সাধনার প্রতি তাঁর অনুরাগ দেখা যায়। তিনি অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন বলা যায়, কেননা, কোনো গান একবার শুনলেই সঙ্গেসঙ্গে সে-গান তাঁর পুরোপুরি দখলে এসে যায়। শিশুকাল থেকেই তাঁর এই ক্ষমতার লক্ষণ দেখে সে আমলে অনেক বড় বড় গুণী বিস্মিত হয়েছেন। ধ্রুবপদ-সংগীতের গভীরতার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে এই সংগীত-সাধনার জন্য জীবন উৎসর্গ করেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি, সেই সময়ের মধ্যেই তিনি কয়েক হাজার ধ্রুবপদ-গান শিক্ষা করেন, সেই সঙ্গে খেয়াল টপ্পা এবং অন্যান্য গানও শেখেন। গানের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুরাগ এমন নিবিড় ছিল যে, বালক-কালে যখন তিনি কলকাতায় ছিলেন তখন সে-সময়ের বিখ্যাত ওস্তাদ শিবনারায়ণ মিশ্র, গুরুপ্রসাদ মিশ্র এবং গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (নুলোগোপাল) প্রভৃতির কাছ থেকে তিনি অগণিত গান সংগ্রহ করেন। তাছাড়া, বিষ্ণুপুর রাজদরবারে বাহাদুর সেন যেসব গানের ভাণ্ডার রেখে গেছেন, সেই সব গান উদ্ধার ক'রে তা প্রচলন করা তিনি তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত বলে গ্রহণ করেন।

১৮৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে তরুণ গোপেশ্বর বর্ধমান-রাজের সভা-গায়ক পদে বৃত হন। গানকে তিনি তাঁর প্রাণ ব'লে মনে করেন। তাঁর ধমনীর রক্তস্রোতে সুরলহরীর ঝংকারই তিনি যেন শুনতে পেতেন সর্বদা। তাই সংগীতকে তিনি কেবল শিক্ষণীয় বিষয় জ্ঞান না ক'রে তা সাধনার ধন বলেই তিনি গ্রহণ করেন। বর্ধমানের রাজসভার গায়ক গোপেশ্বর নিজেকে কঠোরতর সাধনার জন্যে প্রস্তুত করে তুলতে আরম্ভ করলেন। সংগীতের সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে হলে হিন্দী সংস্কৃত ফারসি ইত্যাদি জানা প্রয়োজন। গোপেশ্বর

এই সব ভাষা আয়ত্ত করার জন্ত উদ্যোগী হলেন এবং ভারতের প্রাচীন সংগীত -ঐশ্বর্য নিয়ে গবেষণায় রত হলেন। গানকে তিনি কেবল তাঁর কণ্ঠেই রাখেন নি, একে তিনি গ্রহণ করেছেন হৃদয়ে— তাই তিনি গানের উন্নতিকল্পে সংগীত- বিষয়ক গ্রন্থরচনাতেও নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন।

উনিশ-কুড়ি বছর একটানা তিনি বর্ধমান রাজসভার গায়ক ছিলেন। এই সময়ে তাঁর সংগীতসাধনা চলে নিয়মিতভাবে ও গভীরভাবে। এই সময়েই তাঁর প্রথম পুস্তক প্রকাশিত হয়। সবসমেত তিনি প্রায় বারোটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি 'সঙ্গীত-বিজ্ঞান' পত্রিকাও সম্পাদনা করেন।

সঙ্গীত বরাবর রাজপ্রসাদপুষ্ট হয়ে রাজসভার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। ধনীর পৃষ্ঠপোষকতা না থাকলে সংগীতের উন্নতি সম্ভব নয়, সাধকের সাধনার পথও হয়তো মসৃণ হয় না। এ কথা স্বীকার ক'রে নিলেও সংগীতকে সংকীর্ণ সেই পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী নন গোপেশ্বর। তিনি গানকে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসার ক'রে দেবার জন্যে উদ্যোগী হন। রাজপ্রাসাদের প্রাচীর ডিঙিয়ে যাতে গান জনসাধারণের আয়ত্তের মধ্যে আসে— এই ছিল তাঁর চেষ্টা। তাঁর এই উদ্যোগের ফলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীতকে শিক্ষার অন্যতম বিষয় ব'লে গ্রহণ করেছেন। তাঁর জীবনের এই সাফল্যের জন্যে তিনি আনন্দবোধ করেন, তৃপ্তি বোধ করেন।

সারা ভারতে খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে গোপেশ্বরের। আজ থেকে প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে যখন তিনি ভারত-পরিক্রমায় বের হন, তখন ভারতের বিভিন্ন স্থানের কুশলী ও গুণী ওস্তাদেরা এবং রাজন্যবর্গ তাঁকে অসীম প্রতিভাশালী শিল্পী হিসাবে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা জানান।

১৯১৯ সালে বেনারসে নিখিলভারত সংগীত-সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে তাঁর আলাপ এবং ধ্রুবপদ গান এমন উচ্চাঙ্গের হয় যে, সমবেত ওস্তাদ ও জ্ঞানীগুণিগণ তাঁকে অদ্বিতীয় শিল্পী রূপে অভিনন্দন জানান। ভারতের নামকরা ধ্রুবপদী ওস্তাদ আলাবন্দে খানের সমস্তরের শিল্পী বলে তিনি সম্মানিত হন। তিনি এইভাবে বাংলার মুখোজ্জ্বল করেন। বাংলার আর কোনো শিল্পী ইতিপূর্বে এরূপ সম্মানের অধিকারী হন নি। এর পর এলাহাবাদ মিরজাপুর

লখনউ ইত্যাদি স্থানে অনুষ্ঠিত সংগীত-সম্মেলনে তিনি নিয়মিত যোগদান ক'রে এসেছেন।

ভারতবর্ষের মধ্যে গোপেশ্বরই একমাত্র সংগীতশিল্পী যিনি বিশ্বভারতীর নিকট থেকে উপাধি লাভ করেছেন। বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'স্বর-সরস্বতী' উপাধি দেন। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তাঁকে 'সংগীত-নায়ক' উপাধিতে ভূষিত করেন। কলকাতার অ্যাকাডেমী অব মিউজিক তাঁকে 'ডক্টরেট অফ্ মিউজিক' উপাধি দান করেন।

ধ্রুবপদের গীত-পদ্ধতিতে গোপেশ্বর নূতন পথের প্রবর্তক। তাঁর আলাপ ধ্রুবপদ ধামার ইত্যাদি শ্রোতাদের চমকিত পুলকিত বিমুগ্ধ করেছে। তাঁর অপরূপ কণ্ঠস্বর, ছন্দবদ্ধ স্বরবিন্যাস-পদ্ধতি একত্র মিশ্রিত হয়ে এমন অপরূপ ধ্বনিতে শব্দিত হয়ে ওঠে যে, মনে হয় এ যেন কোনো কণ্ঠস্বর নয়, যেন তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝংকৃত হয়ে বেজে উঠেছে একটি বীণা। গমক মূর্ছনা মীড় আশ— একত্রিত হয়ে এমন এক আশ্চর্য পরিবেশের সৃষ্টি করে যে, শ্রোতারা বিস্ময়-বিমুগ্ধ হ'য়ে ব'সে সেই সুরসুধা পান করেন। গোপেশ্বর ধ্রুবপদ গান পুনরুদ্ধার করেছেন, তানসেন-ঘরানার বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে তিনি এই সংগীত পুনরুজ্জীবিত করেছেন। সংগীত-রস-পিপাসুর নিকট তাই তিনি শ্রদ্ধার্হ ও ধন্যবাদার্হ।

বাংলার বিশিষ্ট সংগীত-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান 'সংগীত-সংঘে' মার্গসংগীতের অধ্যাপকরূপে তিনি তেইশ বছর সংগীত শিক্ষা দান করেন। তারপর অবসর গ্রহণ ক'রে এখন বিষ্ণুপুরে অবস্থান করছেন। এ অবসরও পূর্ণ অবসর নয়। এখানে তিনি স্বপ্রতিষ্ঠিত 'মিউজিক কলেজে'র অধ্যক্ষরূপে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানে রত আছেন।

এখন তাঁর বয়স হয়েছে পঁচাত্তর বৎসর। কিন্তু এখনো স্মৃতিশক্তি আছে অটুট, কণ্ঠস্বর আছে দরাজ। বললেন, "তখন আমার বয়স আন্দাজ দশ। সেই সময় গিরিশচন্দ্র-পরিচালিত কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে একটা জলসা হয়। সেখানে আমি গান গাই। কাগজে বিজ্ঞাপন বের হয় যে, দশ বছরের একটি ছেলেকে বিষ্ণুপুর থেকে আনা হয়েছে। কাগজে এই বিজ্ঞাপন দেখে

'দশ বছরের ছেলেটি'কে দেখার জন্যে আমন্ত্রণ জানালেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। জোড়াসাঁকোয় গেলাম— গান গাইলাম। সে আসরে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ইত্যাদি উপস্থিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন হয়তো ত্রিশও নয়। তাঁর সেই তরুণ উজ্জ্বল চেহারাটা এখনো চোখে ভাসছে।"

তাঁর জীবনের গান বা গানের জীবন আরম্ভ হয়েছে পাঁচ বছর বয়সে, তার পর দীর্ঘ সত্তর বছর কেটে গেছে, এখনো সেই জীবন চলেছে একটানা একই সুরে। এখনো তিনি রেওয়াজ করেন। বললেন, "সকালে দু ঘণ্টা, বিকালে দু ঘণ্টা, আর রাত্রে দু ঘণ্টা— দিনে ছয় ঘণ্টা রেওয়াজ এখনো করি।"

এই রেওয়াজ ঠিক রেখেছেন ব'লে এখনো তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও এক সঙ্গে তিন ঘণ্টা ধ্রুবপদ গাইতে পারেন। সম্প্রতি একটি আসরে তিনি একটানা তিন ঘণ্টা ধ'রে গেয়ে সকলকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়েছেন।

বললেন, "এত চেষ্টা, এত যত্ন, এত পরিশ্রম— এতে আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু আজকাল মার্গসংগীতের নামে যা-সব শেখানো হচ্ছে তা দেখে কষ্ট পাই। আমরা যা শেখাই তা তানসেন সদারং অদারং; এই সবই আমরা প্রকৃত গান ব'লে জানি।"— একটু হেসে বললেন, "কিন্তু এখন যা শেখানো হচ্ছে তা শেয়ালের ডাক, না, বাঘের গর্জন, না, মড়াকান্না— ঠিক বুঝতে পারি নে।"

কথা শেষ করে হাসলেন। সে হাসি আনন্দের নয়, বিষাদের। গুন্ গুন্ শব্দে খালি গলায় গাইতে আরম্ভ করলেন, ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠতে লাগল, সিন্ধু ঝাঁপতালে গাইতে লাগলেন—

সুমধুর সুরে হেন দশা কে করিল
বিজাতি সুর ধরণে মার্গসুর মিশাইল।
যে সুর শুনে শ্রবণে
আতঙ্ক আসে যে মনে
প্রাণ যে কাঁপিয়া ওঠে,
মনে হয় কে মরে গেল।

এমন পামরগণ
ভারতে এসেছে কেন
পবিত্র সুরের রাজ্যে অপবিত্র ঘটাইল।
এমন পুণ্যভারতে
পাপ না পারে থাকিতে
আবার ফিরিবে সুদিন,
সত্য জাগিয়া উঠিল।

বললেন, "এটা আমার দুঃখের গান।"

এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন আর-একটি দুঃখের কথা। তিনি বিভিন্ন স্থান থেকে যেসব স্বর্ণপদক পেয়েছেন, সেগুলি হারিয়ে যাবার কথা। বর্ধমানে থাকাকালে বাড়িতে চুরি হয়। অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে সেগুলিও চুরি যায়। তার পর যেসব স্বর্ণপদক পেয়েছেন, তার সংখ্যাও কম না।

তানপুরা নিয়ে বসলেন গোপেশ্বর। বললেন, "আপনাকে গান শোনাই।"

একটি হিন্দী ও একটি বাংলা গান গাইলেন। মাথা নীচু ক'রে ব'সে শুনছি। তারের ঝংকারের সঙ্গে গলার ঝংকার মিশে যাচ্ছে। মাথা তুলে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে যেন আরও চমক লাগছে, এই বৃদ্ধের চেহারার সঙ্গে গলার স্বরের চেহারার কোনো মিল পাচ্ছি নে। মনে হচ্ছে, এ গলা বুঝি কোনো বলিষ্ঠ যুবকের। তাঁর ঐ বৃদ্ধ অবয়বের অন্তরালে অমনি বাস করছে একটি তরুণ প্রাণ। এর পরিচয় গানেও যেমন, তাঁর কথায় আলাপে আলোচনায়ও সেই প্রাণ-শক্তির তেমনি পরিচয় আছে।

বললেন, "ভালো ক'রে আপনাকে গান শোনানো হল না এবার। সংগীত-সম্মেলনে কলকাতা যাব। তখন শোনাব প্রাণ ভ'রে।"

আনন্দে আমার প্রাণ ভ'রে গেল। ভারতের অদ্বিতীয় সংগীতশিল্পী আমাকে গান শোনাবার আগ্রহে আগ্রহী— এ আমার গৌরবের, এ আমার আনন্দের কথা।

বললেন, "অনেক গান আমার কানে অসহ্য মনে হয়। আমি আর কোনো পথ না পেয়ে তানপুরার ঝংকার তুলি। সেই ঝংকার দিয়ে

চাপা দিই অর্থহীন শব্দকে। কেবল ভাবি, কি ক'রে এর প্রতিকার করা যায়।"

প্রতিকারের পথ হয়তো আছে, সিন্ধু ঝাঁপতালে খালি গলায় তিনি যে গান গাইলেন তার কলিতেই এর কথা আছে—

আবার ফিরিবে সুদিন,
সত্য জাগিয়া উঠিল।

এই পুণ্যভারতে এ পাপ নিশ্চয় বেশিদিন থাকবে না। এই আশা এবং এই একমাত্র ভরসা।

ভারতের সুরের এবং ভারতের সাধনার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, সেই জানে ভারতের ঐশ্বর্য কোথায়। এবং তারই মন ভারতীয় ভাবধারায় আপ্লুত হয়। গোপেশ্বর সেই সৌভাগ্যবানদের মধ্যে একজন। তিনি একজন সংগীত-শিল্পী বলেই কেবল নন্দিত নন, তারচেয়েও বড় কথা— তিনি একজন ভারতীয় সংগীতশিল্পী। এই মহাভারতের মাটির রসে তিনি লালিত এবং এই ভারত-মহাদেশের সুরের স্পর্শে তিনি সঞ্জীবিত। অগভীরে তাই তাঁর আস্থা কম, চটুলতার প্রতি তাই তিনি ক্ষুণ্ণ। তাঁর মনের দৃঢ় বিশ্বাসটি তিনি গান দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন—

এমন পুণ্য ভারতে
পাপ না পারে থাকিতে।

কিন্তু যতদিন এ পাপের আয়ু আছে, ততদিন এ থাকবেই। ভারতের ইতিহাসই বলছে— রাম-শক্তির সঙ্গেসঙ্গে রাবণ-শক্তি থাকবেই। এবং এও বলছে যে, রাবণ-শক্তির নাশ হয়ই।

১৯৫৪ সালে দিল্লি বেতারকেন্দ্রে নিখিল-ভারত রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে তাঁর আলাপ ধ্রুবপদ-সংগীত শ্রোতাদের চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

১৯৫৫ সালে তিনি শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্গ-সংগীতের ভিজিটিং প্রফেসররূপে আমন্ত্রিত হন, এবং প্রায় চার মাস যাবৎ সেখানে অধ্যাপক ও ছাত্রছাত্রীগণকে সংগীতবিদ্যা দান করেন।

১৯৫৬ সালে স্বাধীনতা-দিবসের উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি থেকে তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়।
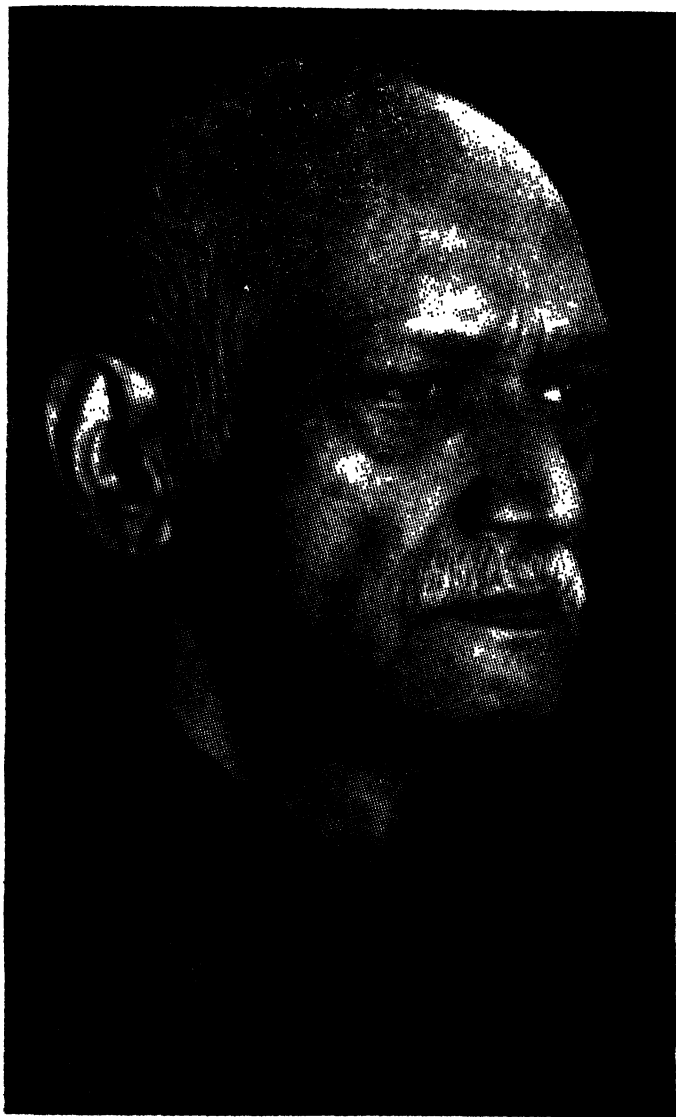
শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

শ্রী চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ

শ্রীবসন্তরঞ্জন রায়

শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীযদুনাথ সরকার

শ্রীইন্দিরা দেবী

সুনয়নী দেবী

সরলাবালা সরকার

শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

রাজশেখর বসু

অনুরূপা দেবী

দেবেন্দ্রমোহন বসু

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

শ্রীক্ষিতীন্দ্র নাথ মজুমদার

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমেঘনাদ সাহা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু
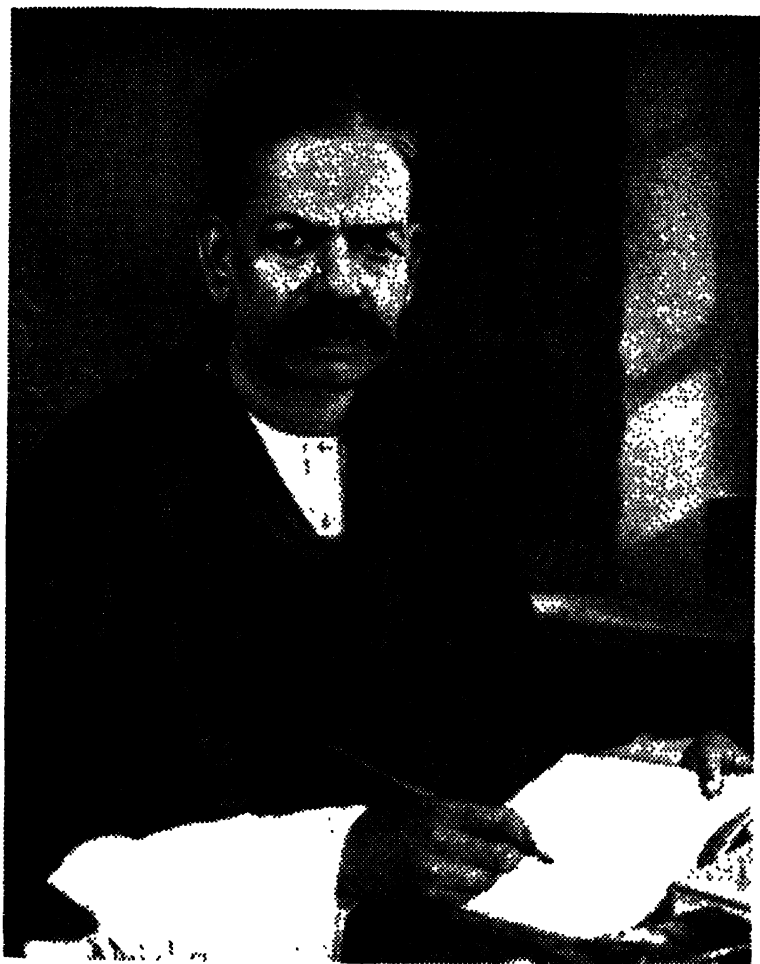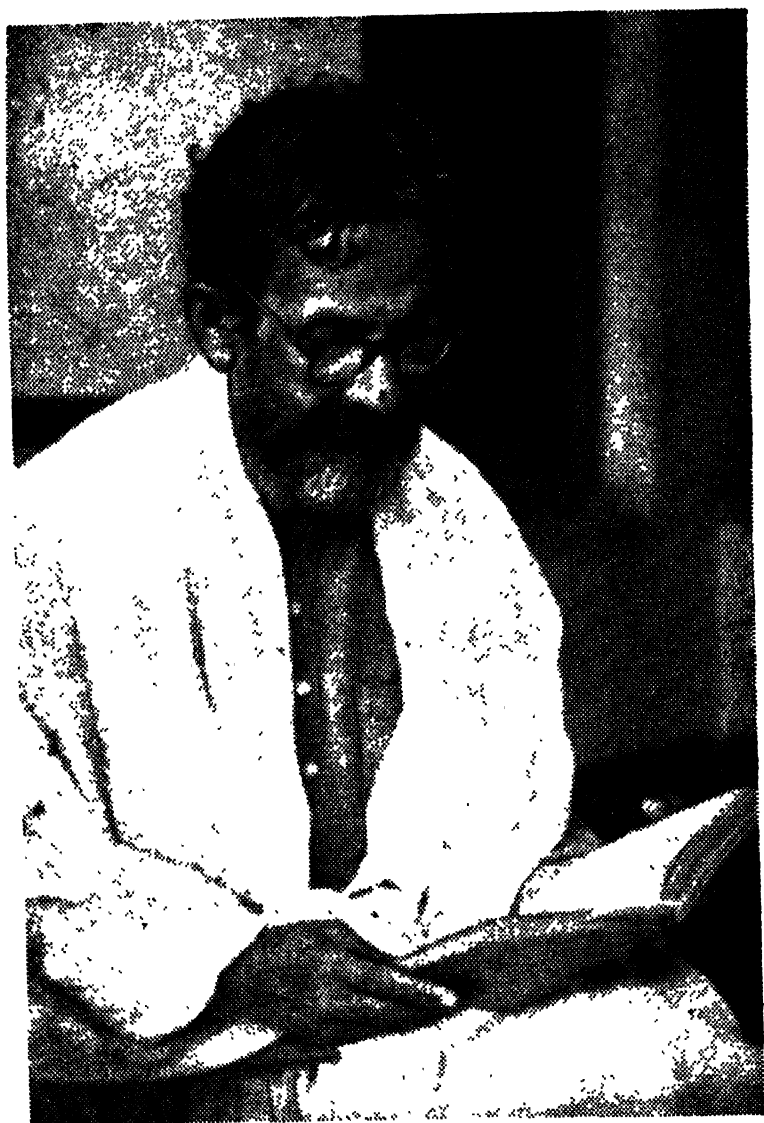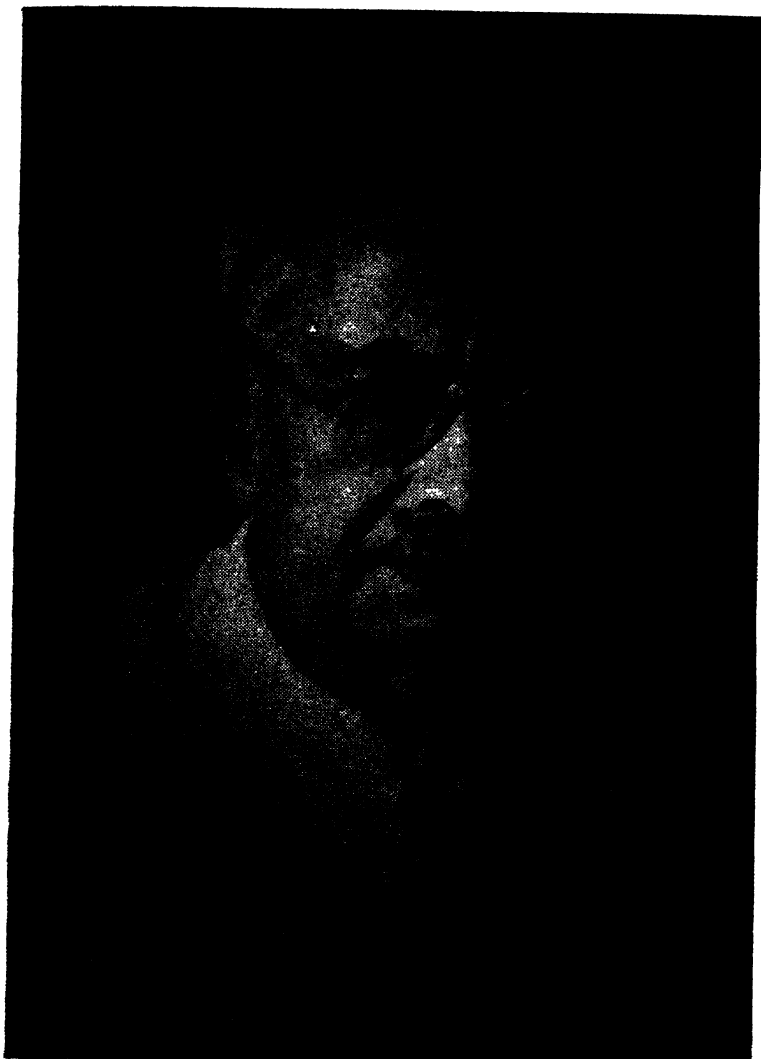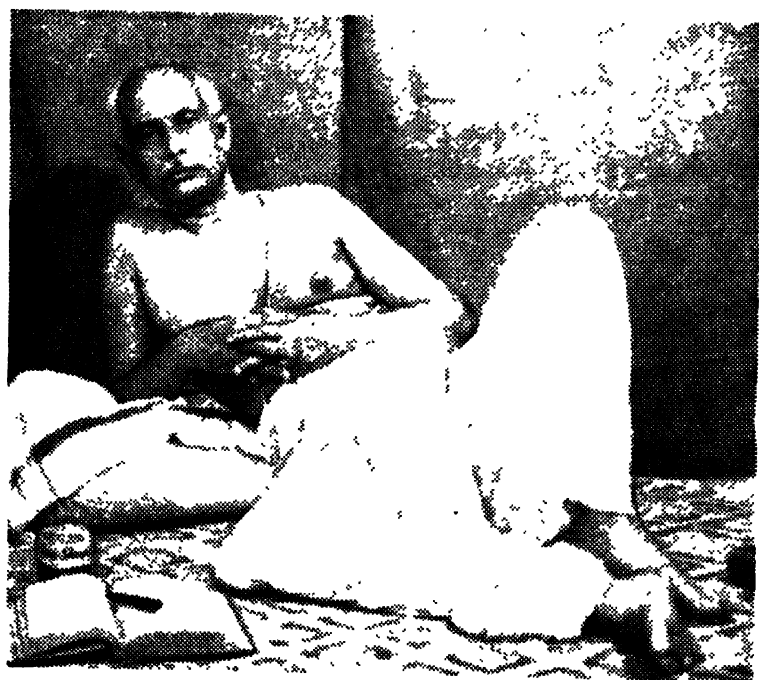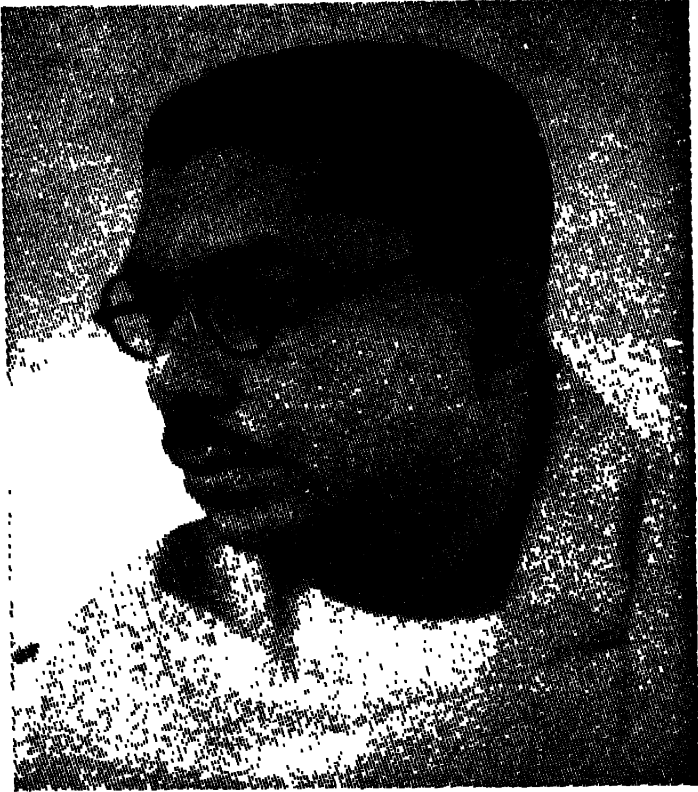
ইনি কেন্দ্রীয় সংগীত-নাটক আকাদমির একজন সম্মানিত সভ্য।

তাঁর নবপ্রকাশিত গ্রন্থ 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস' এক অমূল্য গ্রন্থ।

সংগীত-কুশলতার সঙ্গে তাঁর জ্ঞান নিষ্ঠা ও প্রতিভার পরিচয় তিনি দিয়ে এসেছেন এবং সেই সঙ্গে দিয়েছেন তাঁর ভারতীয়তার পরিচয়। আপন ভূমির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা না থাকলে তার জীবনে কোনো সফলতা সম্ভবপর নয়— গোপেশ্বরের জীবনের সাফল্যের অন্তরালে তাঁর পিতার শিক্ষা, মাতার মমতা যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর স্বদেশ এই ভারতের প্রতি তাঁর অটল শ্রদ্ধা।

পিছনে তানপুরার ঝংকার রেখে ধীরে ধীরে বিষ্ণুপুরের ওস্তাদপাড়ার এলাকা ডিঙিয়ে শাঁখারিপাড়ায় এসে পড়লাম। দূরে মন্দিরের চূড়া। বড় রাস্তা থেকে দেখা গেল দূরে সবুজ জলের রেখা। ওটা নাকি সপ্তবাঁধেরই একটি— ওটা যমুনা-বাঁধ।

অষ্টোত্তর-শত-মন্দির-শোভিত ও সপ্তবাঁধ-পরিবেষ্টিত ভারতের দ্বিতীয় দিল্লি বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে চলে এলাম। মনে হচ্ছে— দূরে ওই জনপদের একটি নিভৃতে এখনো বাজছে তানপুরা এবং সেই সঙ্গে একটি কণ্ঠস্বর।

রচিত গ্রন্থাবলী

সংগীত-চন্দ্রিকা। ২ খণ্ড
সংগীত-লহরী
তান-মালা
গীত-মালা
গীত-দর্পণ
গীত-প্রবেশিকা
বহুভাষা-গীতা
ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস। ২ খণ্ড

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

সংগীত-বিজ্ঞান
সংগীত-মঞ্জুরী

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

"আমার জন্ম শাস্ত্রজ্ঞ পরিবারে। আমাদের বংশের কেউ হয়েছেন পণ্ডিত কেউ কবিরাজ। চৌদ্দ-পনের পুরুষ পূর্বে আমাদের বংশের প্রতি আদেশ হয় যে, এই বংশের সকলে পণ্ডিত হবে এবং দরিদ্র হবে; যে দারিদ্র্য-মোচন করতে যাবে, সেই পাণ্ডিত্য হারাবে।"

বারান্দার ইজিচেয়ারে বসে আছেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। খালি গা। রাত প্রায় নয়টা। বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টি যেমন অস্ফুট আওয়াজ করছে সিমেণ্ট-করা প্যাসেজের শানে পড়ে পড়ে, অবিকল তেমনি গুঞ্জনের ধ্বনিতে তিনি অস্পষ্ট আলোয় বসে কথা বলতে লাগলেন।

আলোটা অস্পষ্ট, কিন্তু সেই আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল তাঁর পেশীবহুল শরীর। বয়স হয়েছে, কিন্তু শরীরে বার্ধক্য নেই। সারা ভারতের মাঠে-ময়দানে মঠে-মন্দিরে পদব্রজে পরিভ্রমণ করে তিনি তাঁর মনকে যেমন ঐশ্বর্যে ভরে তুলেছেন, স্বাস্থ্যও যেমনি যেন হয়ে রয়েছে সম্পদময়। পেশীর বাঁধন একটু ঢিল হয়েছে, এই মাত্র।

কাশীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। সন তারিখ ঠিক জানা নেই। বললেন, "সরকারী চাকরী তো করি নি কখনো, তাই ওসব খুঁটিনাটি নিয়ে নাড়াচাড়াও করা হয় নি।"

কিন্তু একটা তারিখ তিনি ভুলতে পারেন নি।— ১৮৯৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১৩০১ সনের ২০এ মাঘ। এই দিনটি তাঁর জীবনের স্মরণীয় তারিখ, কেবল স্মরণীয়ই নয়, বরণীয়ও। এই দিনে তিনি সন্তমতী সাধকের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

বললেন, "তখন আমার বয়স পনেরো-ষোলো। এই তারিখ দিয়েই আমার বয়সের হিসাব করে নিতে হয়।"

কিন্তু বয়সের হিসেব নেওয়ার জন্যে তাঁর কাছে আসি নি, তিনি যে দীক্ষায়

দীক্ষিত করে তুলেছেন নিজেকে, সেই দীক্ষার সূত্রে কয়েকটি গল্প যদি শোনা যায় তাঁর মুখ থেকে, এই ছিল ইচ্ছে। সে ইচ্ছে পূরণ হল।

ভক্ত হরিদাসের নাম উল্লেখ ক'রে তাঁর স্তুতিবাদ ক'রে তিনি হরিদাস থেকেই উদ্ধৃত করে বললেন—

ভিতরে রস না হইলে
বাইরে কি রে রং ধরে ?
ফলে কি অমৃত নামে
বাইরে তারে রং করে ?

পনেরো-ষোলো বছর বয়সে তিনি যে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন, এই দীর্ঘ কাল ধরে সেই দীক্ষাতেই দীক্ষিত রেখেছেন নিজেকে। এই দীক্ষার মন্ত্র কেবল তাঁর মনের নিভৃতে গিয়েই প্রবিষ্ট হয় নি, এই দীক্ষার মন্ত্র তাঁর সকল তন্তুতে ও তন্ত্রীতে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছে। এই জন্যই তিনি জীবনে পেয়েছিলেন অভিনব প্রেরণা ও অভিলষিত উদ্দীপনা। তাঁর ভিতরটি তিনি রসালো করে তুলতে পেরেছেন বলেই আজ তাঁর বাহিরেও রং ধরেছে।

ইজিচেয়ারে বসে অনুচ্চ মোড়ার উপর পা তুলে বসে আছেন। সারা ভারতের ধূলিকণা ঐ দু-পায়ে যেন মাখানো আছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন এই সাধকদের সন্ধানে, তাঁদের সাধনার ভাগ পাওয়ার ইচ্ছায়।

"প্রথম যাই রাজপুতানায় গুরুদের সঙ্গে। আজমীঢ়ে নারায়ণায় দাদু-পন্থীদের ও সাম্ভানেরে রজ্জবজির মাঠে গিয়েছি। গল্তা সামভর ডিদওয়ানা প্রভৃতি অসংখ্য গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছি। সে-সব গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে আমার মাসি-পিসি সম্পর্ক হয়ে গিয়েছিল। বাইরে বেগানা লোকের মত আমাকে মনে করত না তারা।"

তাঁর দেশ-দেখা বা দেশ-ভ্রমণ রেলগাড়ির কামরা থেকে স্টেশন দেখা নয়, দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেশের মাটি সর্বাঙ্গে মেখে তীর্থ-পরিদর্শনের মত।

বললেন, "তীর্থভ্রমণই বলা ঠিক। সারা ভারতই আসলে একটি অখণ্ড

তীর্থ। প্রাচীনকালে আমাদের না ছিল টাইমটেবল, না ছিল ক্যালেণ্ডার, না ছিল রেল-ইস্টিমার। এক-একটা তিথিতে এক-একটা তীর্থে এক-একটা যোগ হত। সেই যোগ উপলক্ষ্য করে সাধুসন্তরা যুক্ত হতেন এক জায়গায়, মনের আর ভাবের আদানপ্রদান হত। কয়েকটি বিশেষ নক্ষত্র একত্রে যোগ হলে হত এক-একটা উৎসব। এটা একটা অছিলা মাত্র। তীর্থের আসল মাহাত্ম্য ছিল মানবে-মানবে যোগটাতেই।"

একটু থেমে বললেন, "কিন্তু সে তীর্থ আজ আর নাই। রেল-ইস্টিমার এখন তীর্থের বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এখন সেখানে মাতব্বর হচ্ছে কেবল ষণ্ডা পাণ্ডা আর গুণ্ডা।"

কাথিওয়াড় ও গুজরাট, সিন্ধু আর পাঞ্জাব— সর্বত্র ঘুরেছেন তিনি। কেবল দক্ষিণভারতে বিশেষ বেড়ানো হয় নি; এর কারণ দক্ষিণী ভাষা তাঁর কিছু কম জানা ছিল। কাশীতে তাঁর জন্ম; কাশীতে তাঁর বিদ্যারম্ভ। এখানে থাকার দরুন ভারতের প্রায় সব ভাষাই তিনি জানতেন, কেননা এই তীর্থ-ভূমিতে বিভিন্নভাষী লোক জমায়েত হয় এবং তাদের বসবাসও আছে।

ঢাকা জেলার সোনারং গ্রামে তাঁদের আদি নিবাস। তাঁর পিতামহের বয়স যখন বাহাত্তর, তখন তিনি জানতে পারেন যে, ঐ বয়সেই তাঁর ফাঁড়া আছে ব'লে কোষ্ঠীতে উল্লেখ আছে। তাই তিনি কাশীতে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করেন; কিন্তু কোষ্ঠীর বিচার মিথ্যা করে দিয়ে তিনি আরও পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। এইভাবে তাঁর কাশীতে আগমন এবং এই তীর্থভূমিতে তাঁর জন্মগ্রহণ।

বিপরীত দুইটি মনোভাবের মধ্যে তিনি মানুষ হন। তাঁর পিতৃকুল ছিলেন নিদারুণ গোঁড়া এবং মাতৃকুল পরম উদার।

"আমার দাদা ইংরেজি শিক্ষিতদের সঙ্গে মিশে পাঁউরুটি খেলেন। অমনি বজ্রাঘাত হল সবার মাথায়। আমার উপর কড়া হুকুম হল যে, আমাকে সংস্কৃত পড়তে হবে এবং কাশীতেই থাকতে হবে।"

একটু থেমে হেসে বললেন, "কিন্তু লখিন্দরকেও সাপে কাটে— শক্ত

সোহার বাসর মিথ্যে হয়ে যায়। সংস্কৃতের মধ্যেই মানুষ হলাম বটে, কিন্তু ইংরেজি না শিখে আর রেহাই পেলাম কই।"

তাঁর সময়ে কাশীতে যত পণ্ডিতের একত্র সমাবেশ হয়েছিল, গত তিন শো বছরের মধ্যে তেমন আর হয় নি। তিনি এজন্যে বিশেষ গৌরবান্বিত বলে মনে হল। গৌরব এই জন্যে যে, সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তিনি তাঁর মন গঠন করে নিতে পেরেছেন, তাঁদের মননের ভাগও পেয়েছেন, এবং সেই পণ্ডিতমণ্ডলীর জ্ঞানের উত্তাপে নিজেকে উত্তপ্ত করে নিতে পেরেছেন।— বেদে ছিলেন বামনাচার্য, বৈদিক ও লৌকিক ব্যাকরণে দামোদর শাস্ত্রী, সাহিত্য-অলংকারে রামশাস্ত্রী ত্রৈলঙ্গ, ন্যায়ে কৈলাস শিরোমণি ও রাখালদাস ন্যায়রত্ন, ভট্টিশাস্ত্রে রামশাস্ত্রী ভাগবতাচারী, জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে সুধাকর দ্বিবেদী ; এ ছাড়া ছিলেন হরিভট্ট শাস্ত্রী মানেকর ও কেশব শাস্ত্রী। বড় বড় সন্ন্যাসী-পণ্ডিতও ছিলেন— স্বামী বিশুদ্ধানন্দ (এঁকে অনেকে নানাসাহেব বলে মনে করত), স্বামী ভাস্করানন্দ, বেদান্তাদি শাস্ত্রে রামমিশ্র শাস্ত্রী।

জ্যোতিষাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী ছিলেন সন্ত-মতে বিশ্বাসী। এর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন পনেরো-ষোলো বছর বয়সের বালক ক্ষিতিমোহন। দ্বিবেদীজীর কাছেই তাঁর জীবনে অভিনব প্রেরণা লাভ ঘটে বলা যায়। এর ফলে সন্তমতী সাধকের কাছে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন বাল্যকালে।

সন্তমতীরা শাস্ত্রপন্থী নন, তাঁরা জাতিভেদ মানেন না, ঠাকুর-ঠুকুর মানেন না, বাহ্যাচার মানেন না, কর্মকাণ্ড মানেন না ; তাঁদের ধর্ম হল প্রেমভক্তি এবং মানবই হল তাঁদের তীর্থমন্দির।

এই নূতন তীর্থের সন্ধান পেয়ে গেলেন বালক ক্ষিতিমোহন। এই সন্ধান লাভ করে তিনি মানবের মেলায় মিলিয়ে দিলেন নিজেকে। যাযাবর জীবন যাপন করে যে সাধকের দল, পথই যাদের ঘর, পথের পাশের বৃক্ষছায়া যাদের বিরামনিকেতন, যারা পথের ধুলো উড়িয়ে দেশ থেকে দেশান্তরের দিকে যাত্রা করে সাঁইএর সন্ধানে, ক্ষিতিমোহন সঙ্গ নিলেন তাঁদের। এঁরা স্বভাবসাধক, সাধনা এঁদের মজ্জাগত। সেই মজ্জাগত সাধনার উপলব্ধি

থেকে যেসব স্বতঃউৎসারিত গানের কলি তাঁদের মুখ থেকে বার হত তিনি তা সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন। আজ তাঁর ভাণ্ডার তাই এইসব রত্নাবলীতে পরিপূর্ণ।

সন্তদের পরিচয় তিনি তাঁর 'ভারতে মধ্যযুগের সাধনার ধারা' গ্রন্থে (অধর মুখার্জি বক্তৃতা ১৯২৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) দিয়েছেন।

কিন্তু সন্তদের সাধনপদ্ধতি ও সন্তদের দর্শন সম্বন্ধে তিনি কিছু প্রকাশ করেন নি। এর কারণ আছে। যাঁরা নিজেদের আগ্রহে সন্তদের সান্নিধ্যে আসেন, তাঁদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় তুষ্ট হলে সন্তরা তাঁদের কাছে নিজেদের মন উন্মুক্ত করে দেন। কিন্তু তার আগে শপথ করিয়ে নেন যে, তাঁদের মতের কথা কিংবা পথের কথা বাইরে প্রকাশ হবে না। ক্ষিতিমোহন এই প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ। এইজন্যেই বহুদিন পূর্বে তাঁর লেখা 'সন্তদের মত ও পথ' নামে একটি পাণ্ডুলিপি তিনি সযত্নে নিজের কাছে সংগোপনে রেখেছেন। কখনো এটি প্রকাশ করা হবে কিনা বলা কঠিন। না হবারই সম্ভাবনা সম্ভবত বেশি।

আমরা বর্তমানে বাউল-সম্প্রদায় সম্বন্ধে যে সচেতন ও কৌতূহলী হয়েছি, তার মূলে আছেন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন। বহুদিন থেকে তিনি প্রতি বছর নিয়মিতভাবে আসতেন বীরভূমের জয়দেব-কেন্দুলীতে। এখানে প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তির দিন মেলা বসে, সেই মেলাতে বাউলের সমাবেশ ঘটে। তখন কেন্দুলীতে যেসব বাউলের সমাবেশ ঘটত তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নিত্যানন্দ এবং তাঁর শিষ্য হরিদাস।

বললেন, "১৯০৮ সালের আষাঢ় মাসে শান্তিনিকেতনের আশ্রমের কাজে যোগ দিতে আসি। বোলপুর স্টেশনে যখন নামি, তখন প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। সে আমার জীবনে একটি স্মরণীয় রাত্রি। আর তার পরের দিনের প্রভাতও কম স্মরণীয় নয়; বোলপুর থেকে পায়ে হেঁটে শান্তিনিকেতনের কাছে এসে শুনি উদাত্ত কণ্ঠের গান—'আপনি জাগাও মোরে···'। দেহলী নামে তাঁর গৃহের দ্বিতলে দাঁড়িয়ে কবি গান ধরেছেন। আজও সেই গানের সুর আমার কানে লেগে আছে।"

আশ্রমের তখন প্রথম অবস্থা। ঘরবাড়ি খুব কম। ছাত্র ও অধ্যাপক মিলিয়ে দৈনিক পাতা পড়ে মাত্র পঞ্চাশ জনের। সেই তপোবন-জীবন-যাপনের জন্যে তিনি এসে উপস্থিত হলেন এখানে।

বললেন, "সেই অঙ্কুর থেকে যে এই বিরাট মহাবনস্পতির উদ্ভব হয়েছে এর মূলে আছে কবির ধৈর্য সাধনা এবং নিষ্ঠা। কোনো ছোটকেই তিনি জীবনে তুচ্ছ মনে করেন নি। তাই এত ক্ষুদ্র আরম্ভ থেকেই তিনি বিশ্ববিশ্রুত বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পেরেছেন।"

কাশীতে যখন ছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের নামই তিনি শোনেন নি। তখন তো প্রচারের এমন নানাবিধ যন্ত্র ছিল না, এত অজস্র উপকরণ ছিল না। কবির নাম তখন বাংলাদেশের সীমার মধ্যেই ছিল বাঁধা। সে সময় বরিশালের এক ভদ্রলোক কাশীতে তাঁর শ্বশুরালয়ে যান, তাঁর মুখে প্রথম তিনি নাম শোনেন রবীন্দ্রনাথের এবং তাঁরই মুখে আবৃত্তি শোনেন রবীন্দ্রকাব্যের।

গা এলিয়ে দিয়ে বসে ছিলেন, সোজা হয়ে বসে বললেন, "চমকে গেলাম। মনে হল, এ কি, এ যে আমাদের দেশের সাধকদের মর্মেরই ধ্বনি বাজছে এর ছত্রে ছত্রে, নূতন ভাষায় নূতনতর ব্যঞ্জনায়।"

হেসে বললেন, "মত্ত ছিলাম শুঁটকি মাছে, এবার যেন পেয়ে গেলাম টাটকা মাছের স্বাদ— পেয়ে গেলাম তার সন্ধান।"

তার পর কবিকে দেখবার জন্যে আগ্রহ জাগল তাঁর মনে। তিনি এলেন কলকাতায়। ১৯০৫-৬ সালের কথা। দেখেছিলেন কবিকে সেবার, চোখে কল্পনা হয়ে লেগে ছিল যে কবি-চিত্রটি তার সঙ্গে অবিকল মিল পেয়ে গেলেন তিনি।

"এর পর স্বর্গীয় কালীমোহন ঘোষ আমাদের গ্রামে সোনারঙে যান। ফিরে এসে তিনি কবির কাছে আমার কথা বলেন। তার পরেই আসে ১৯০৮ সালের স্মরণীয় সেই আষাঢ়ের রাত্রি, প্রবলবর্ষণমুখর নির্জন সেই বোলপুর স্টেশন। আমার জীবন তার প্রবাহের নূতন খাত পেয়ে গেল। চুয়াল্লিশটি বছর কেটে গেল একে একে।"

১৯৫২ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৩৫৯ সনের ২৫এ ভাদ্র। কলকাতা

লেকের উপকণ্ঠে কবীর রোড— রাত প্রায় ১১টা বাজে। বাইরে এখন বৃষ্টির ধারাপাত শুনে তাঁর কি মনে পড়ে গেছে চুয়াল্লিশ বছর আগের সেই স্মরণীয় রাত্রিটির কথা ?

বললাম, "শান্তিনিকেতনে গিয়েই আপনার সঙ্গে দেখা করব ভেবেছিলাম, কিন্তু হঠাৎ আপনি কলকাতায় এসে পড়ায় আর যেতে হল না। এটা লাভ না, আসলে এটা ক্ষতিই ; আপনাকে স্বস্থানে পেলে আরও ভালো লাগত।"

বললেন, "ঘুরেছি অনেক। বোম্বাইয়ের নবদ্বীপ পান্ঢরপুর, বিল্বমঙ্গলের স্থান কর্নাটের উদীতী, ধাড়োয়ার কাড়োয়ার, মালাবার পলিঘাট, সিন্ধু, কাশ্মীর— সব। কিন্তু সর্বতীর্থসার বলে মনে হয় এই শান্তিনিকেতন। সেখানে বসে কথা বলতে পারলে ভালোই হত। সর্বতীর্থসার বলে মনে হবার কারণ আছে— এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার মূলে, আমরা এসে লক্ষ্য করলাম, কবির ছিল দেশের প্রাচীন সাধনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা। চিরজীবনের জন্যে তাই ধরা পড়ে গেলাম এখানে।"

আঠাশ বছর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতনে আসেন, তার পর থেকে এতগুলি বছর কেটে গিয়েছে এখানকার এই নিভৃত পরিবেশে। তিনি এখানে এসে তাঁর কাশীর সতীর্থ শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য শাস্ত্রীকে পেলেন, পিয়র্সন অ্যাণ্ড্রুজ প্রভৃতি বিদেশী সুহৃদ্‌গণ তখনো এখানে এসে যোগ দেন নি. তিনি এখানে এসে আর যাঁদের পেলেন তাঁরা হচ্ছেন জগদানন্দ রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী ও প্রসিদ্ধ শাব্দিক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বললেন, "বর্ষাকালে আশ্রমে আসি। কবির অন্তরের মধ্যে ঋতু-উৎসবের যে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমাদের তা জানিয়ে তিনি সেবার দিন-কয়েকের জন্যে বাইরে যান। কি করে বর্ষা-উৎসব করা যায় সকলে সেই সমস্যায় পড়লাম। দিনুবাবু (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর) নিলেন বর্ষাসংগীতের ভার, অজিত চক্রবর্তী রবীন্দ্রকাব্য থেকে ভালো ভালো কবিতা আবৃত্তির জন্যে তৈরি হতে লাগলেন, সংস্কৃত সাহিত্য ও বেদ থেকে বর্ষার ভালো ভালো সূক্তি আমরা সংগ্রহ করলাম। বর্ষাকালের উপযুক্ত করে প্রাচীন কালের মত সহজ গম্ভীর নেপথ্যে বর্ষার উৎসবটি সমাপ্ত হল। কবি ফিরে এসে উৎসবের সাফল্যের

কথা শুনে খুব খুশি হলেন। শান্তিনিকেতনে ঋতু-উৎসবের এই হল সূত্রপাত তারপর শারদ-উৎসব করার জন্যে কবি উৎসুক হলেন।"

শান্তিনিকেতনের কথা, আশ্রমের রূপের ও বিকাশের কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। প্রায় একটি অর্ধশতাব্দী কেটেছে যে-আশ্রমের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে, তার কথা মাত্র কয়েকটি ঘটনার বিবরণ দিলেই সারা যায় না, সারা হয় না।

বললেন, "দূর থেকে যাঁকে জেনেছিলাম কেবল কবি ব'লে এখানে এসে দেখি তাঁর প্রতিভা সর্বতোমুখী। কাব্য সাহিত্য সংগীত থেকে আরম্ভ ক'রে ব্যাকরণ বিজ্ঞান চিকিৎসা স্বাস্থ্যতত্ত্ব রোগীসেবা সবই তিনি নিপুণভাবে চালনা করতেন। তাঁর এই উৎসাহ দেখে আমরাও প্রাণে নতুন প্রেরণা লাভ করি। সেই প্রেরণা সম্বল করে আমাদের যাত্রা, আর সেই যাত্রাপথ ধ'রে এগিয়ে এগিয়ে আজ এই পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি।

শান্তিনিকেতনে এসে তাঁর সুবিধে হল আর-একটা। সুদূর কাশী থেকে তাঁকে আসতে হত কেন্দুলীর মেলায়। এবার সে মেলা পেয়ে গেলেন ঘরের কাছে। তিনি সেখানে নিয়মিত যেতে আরম্ভ করলেন। কোথায় যাচ্ছেন, কাউকে কিছু না বলেই অন্তর্ধান করতেন, আবার কয়েকদিন বাদেই ফিরে আসতেন। আশ্রমের অন্যান্যদের কৌতূহল হল, তিনি বছরের এই ক'টা দিন এভাবে আত্মগোপন করেন, যান কোথায়? তিনি কাউকে না জানিয়ে এভাবে যেতেন, তার কারণ ছিল। বাউলেরা বাইরের লোকের কৌতূহলী প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চায় না। নীরবে তারা সাধনা করে, নিভৃতে বসে গান করে। সকলকে জানিয়ে গেলে যদি সঙ্গীরা তাঁর সঙ্গ নিয়ে সেখানে গিয়ে ভিড় করে তাহলে সেই পরিবেশটাই নষ্ট হয়ে যাবে, এই ছিল তাঁর ভয়। কিন্তু একবার নাকি তাঁকে গোপনে অনুসরণ করেন নেপালচন্দ্র রায়, দিনেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি। অনুসরণ করে গিয়ে দেখেন তিনি বাউলের সম্মুখে বসে এক মনে গান শুনছেন তাদের।—

আমরা পাখির জাত
আমরা হাঁইট্যা চলার ভাও জানি না

আমাদের উইড়া চলার ধাত।...
কাজলে আর কাজ কি হবে
যদি নয়নে নজর না থাকে।...

তাঁর সংগ্রহে এমন বিস্তর গান আছে। 'বঙ্গবীণা'তে তাঁর সংগ্রহ থেকে অনেকগুলি বাউল গান চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন—

১ ধন্য আমি বাঁশীতে তোর আমার মুখের ফুঁক
২ নিঠুর গরজী, তুই কী মানসমুকুল ভাজবি আগুনে
৩ আমি মজেছি মনে
৪ পরান আমার সোতের দীয়া
৫ আমি মেলুম না নয়ন
৬ তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
৭ চোখে দেখে গায়ে ঠেকে
৮ আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে
৯ হৃদয়-কমল চলতেছে ফুটে

বিশ্বভারতী পত্রিকায় (নবম বর্ষ, প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা) তিনি বাংলার বাউল সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বাউলতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, অনেক ভণিতায় রচয়িতাদের নামও জানা যায় না; একবার এক বৃদ্ধ বাউলকে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'এভাবে রচয়িতাদের নাম ভুলে যাওয়া কি ভালো?' এর উত্তরে বৃদ্ধ বাউল তাঁকে অদূরে নদীর দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে বলে, 'এই যে নদীর নাও ভরাপালে চলেছে, এর কি পদচিহ্ন কিছু আছে? ঐ ঠেকা-নাওয়ের পথই কাদায় কাদায় আঁকা রইল। এর কোন্‌টা সহজ ও স্বাভাবিক? আমরা সহজ পথের পথিক, আমরা কৃত্রিম পদচিহ্ন রেখে যাওয়াকে বড় বলে মনে করি নে।'

বাউল সম্বন্ধে তাঁর উক্ত রচনা-তিনটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লীলা-বক্তৃতামালায় কথিত হয়েছে।

দেশের নিভৃত ও নিশ্চিন্ত পরিবেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেদের সংগোপনে রেখে সাধনা করে চলেছে বাউল-সম্প্রদায়। বাইরের-জগতের

সঙ্গে এদের পরিচয় নেই, বহির্জগতও এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে উদাসীন। এমনই এক সময়ে, ১৯১০ সালের কাছাকাছি, পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সর্বপ্রথম জনসাধারণের দৃষ্টি এদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে এদের বিষয়ে রচনা আরম্ভ করেন। তাঁর এই লীলা-বক্তৃতামালার উপকরণ তাঁর সেই পুরাতন পাণ্ডুলিপিই।

১৯২৮ সালে ভারতীয় দর্শন কংগ্রেসের সভাপতি হন রবীন্দ্রনাথ। সভাপতির ভাষণ রচনার সময়ে ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথকে বাউলদের দর্শন সম্বন্ধে উপকরণ দেন, এ উপকরণও ঐ পুরাতন পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতেই তিনি দেন।

লীলা-বক্তৃতামালায় কথিত ভাষণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলার বাউল' নামে প্রকাশ করেছেন।

ভারতের অভ্যন্তরে পর্যটন করেছেন তিনি অনেক। ১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ চীন-সফরে যান। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানই এই সফরের উদ্দেশ্য। ক্ষিতিমোহনও সেই সঙ্গে যান। তাঁদের সঙ্গে আরো যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা হচ্ছেন শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও এল্‌ম্‌হার্স্ট। যাবার পথে তাঁরা বর্মা পেনাং মালয় সিঙ্গাপুর হয়ে যান। তাঁদের এই ভ্রমণের একটি দিনলিপি ক্ষিতিমোহন সযত্নে রক্ষা করেছেন।

এর বছর দুই পরে, ১৯২৬ সালে, রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও পরামর্শে হিন্দু-দর্শন প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্ষিতিমোহন ইউরোপভ্রমণে বহির্গত হবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয় না। জনৈক শিল্পপতি ভ্রমণের যাবতীয় খরচ বহন করার জন্যও স্বীকৃত, যাত্রার দিনও স্থির হয়েছে, এমন সময়ে উক্ত শিল্পপতি এসে ক্ষিতিমোহনকে জানালেন, 'আপনার জন্য তুলসীবৃক্ষ ও গঙ্গা-মৃত্তিকা প্রস্তুত', অর্থাৎ হিন্দু দর্শন বা ভারতীয় দর্শন প্রচার করতে গেলে ঐ দুটি পদার্থ অপরিহার্য বলে শিল্পপতি মহাশয়ের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁর এই কথা শুনে ক্ষিতিমোহন রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বললেন, 'যাব না।'

ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে পেঙ্গুইন সিরিজে একটি গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ হয়েছে, তাঁরা সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের সঙ্গে এ ব্যাপারে পত্রালাপ করেছেন।

রাধাকৃষ্ণন তাঁদের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছেন ক্ষিতিমোহনকে এ গ্রন্থ রচনার জন্য অনুরোধ জানাতে, এবং তিনিও ক্ষিতিমোহনকে পত্র দিয়েছেন। বর্তমানে (১৯৫৮) এই গ্রন্থ রচনায় ব্যাপৃত আছেন ক্ষিতিমোহন।

সংস্কৃতে তিনি সুপণ্ডিত। কাশীর পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে তাঁর শিক্ষা। কিন্তু তিনি অন্যান্য ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধেও পারদর্শী। গুজরাটি ও হিন্দীতে তাঁর মৌলিক গ্রন্থ আছে। রামনারায়ণ পাঠক সম্পাদিত গুজরাটি পত্রিকা 'প্রস্থানে'র তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। ১৯১০-১৫ সালে তিনি এই কাগজে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন। অভিনব ভারত গ্রন্থমালার প্রথম বই হিন্দী 'ভারতে জাতিভেদ' তাঁর রচিত; এই বই বাংলা 'জাতিভেদ' গ্রন্থের অনেক আগে লেখা; বাবু পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের পুস্তক-প্রকাশ-প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত 'সংস্কৃতি সংগম' তাঁর রচিত। গান্ধীজীর তিরোভাবের পর অহিন্দীভাষীর হিন্দীচর্চার জন্য ভারতব্যাপী যে পুরস্কার দেবার নীতি প্রবর্তিত হয়েছে, ১৯৫০ সালে তিনি তার প্রথম পুরস্কার 'তাম্রপট্ট' লাভ করেন।

যিনি ভক্তকবি কবীরের ভাবসমুদ্র মন্থন করে রত্ন উদ্ধার করেছেন, যাঁর মুখে সব সময় কবীরের বাণী লেগে আছে, যিনি কবীরের কথায় পঞ্চমুখ, তাঁর সঙ্গে বসে কথা বলছি কলকাতার কবীর রোডে। এই যোগাযোগটির কথা ভেবে ভালো লাগল। শান্তিনিকেতনে কবির সাধনতীর্থে গিয়ে এঁর সঙ্গে দেখা করতে পারি নি বলে আক্ষেপ সম্পূর্ণ দূর হল না বটে, কিন্তু এও তো মন্দ না; যিনি কবীরের ভক্ত, সেই ভক্ত এখন কবীরের নাম-চিহ্নিত রাস্তার এই গৃহ-অলিন্দে বসে কবীর-বাণী উদ্ধৃত করে বললেন—

করনা নহী মন দিলগিরী।
জব জাগো তব মুসাফিরী।

'মন, অবসন্ন হোয়ো না, যতক্ষণ জেগে থাক ততক্ষণ নিজেকে যাত্রী মনে করবে।'

১৯৫২ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষিতিমোহনকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট.) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

তিনি ১৯৫৩-৫৪ সালে কিছুকালের জন্য বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য (ভাইস চ্যান্সেলার) ছিলেন।

জীবনের যাত্রা শুরু হয়েছে অনেক দিন আগে, কিন্তু এখনো তিনি শ্রান্ত নন ক্লান্ত নন, এখনো তিনি পরিশ্রম করেন সমানভাবে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের যাবতীয় উৎসবের পরিচালনভার তাঁর উপরই ন্যস্ত।

এখনো রচনার বিরাম তাঁর নেই। বিভিন্ন পত্রিকায় এখনো তিনি তাঁর জীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা প্রবন্ধের মাধ্যমে বিতরণ করে চলেছেন।

অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর অনেক রচনা বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার পাতায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আছে, যথা—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, নব্য ভারত, প্রবাসী, শান্তিনিকেতন পত্র, বিশ্বভারতী কোয়ার্টারলি, বিশ্বভারতী পত্রিকা, দেশ, আনন্দবাজার।

বৃষ্টি থামে নি। একটু ধরেছে মাত্র। রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। তাঁর জীবনকাহিনীর মাঝে মাঝে তাঁর পরিহাস ও সরস মন্তব্য শুনতে শুনতে সময়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম প্রায়; কিন্তু উঠতে হয় এবার।

বৃষ্টি একটু ধরে আসতেই নেমে পড়লাম রাস্তায়; কবীর রোডের বর্ষা, চুয়াল্লিশ বছর আগের আষাঢ় মাসের বোলপুর স্টেশনের বৃষ্টির রাত্রিটার সঙ্গে এর কোনো যোগ আছে কিনা, তাই ভাবছিলাম।

রচিত-গ্রন্থাবলী

কবীর। ৪ খণ্ড

দাদূ

জাতিভেদ

প্রাচীন ভারতে নারী

ভারতের সংস্কৃতি

বাংলার সাধনা

হিন্দু-সংস্কৃতির স্বরূপ

ভারতের হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা
মধ্যযুগে ভারতীয় সাধনার ধারা
বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা
যুগগুরু রামমোহন
Medieval Mysticism of India.
চিন্ময় বঙ্গ

গুজরাটি
চীন-জাপানো প্রবাস
শিক্ষনো ব্যাখ্যানো মালা
তন্ত্রণী সাধনা

হিন্দী
ভারতে জাতিভেদ
সংস্কৃতি সংগম
ভারতের সংগীত সাধনা। যন্ত্রস্থ

মুদ্রণ-অপেক্ষায়। পাণ্ডুলিপি
সন্তদের মত ও পথ
মন্ত্র। বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখ্যা

শ্রীরাজশেখর বসু

সকাল বেলার নিস্তব্ধ বকুলবাগান। ভাদ্র মাসের রোদ্দুর সারা বকুলবাগানে ছড়ানো। পীচঢালা রাস্তা সটান চলেছে পশ্চিম থেকে পুবে।

ছুটির সকাল। লোক-চলাচল তাই শুরু হয় নি এখনো। সকাল সাতটা থেকে সাড়ে নয়টার মধ্যে পৌছবার কথা। সাতটা বেজে গেছে, তাই দ্রুতপদে চলছিলাম। সূর্যটা ঠিক চোখের সামনে। আলোটা এত তেজী যে, রাস্তাই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না।

বাহাত্তর নম্বর পেরিয়ে এক শ বেয়াল্লিশে পৌছে হুঁশ হল। পিছিয়ে এলাম।

বকুলবাগানকে নিস্তব্ধ দেখে এলাম, কিন্তু বাহাত্তর নম্বর বাড়িটা নিস্পন্দ, নিরালা। লোহার গেট দিয়ে শক্ত ক'রে বাড়িটার নিভৃতি যেন বাঁধা আছে। এখানে থাকেন শ্রীরাজশেখর বসু— বাংলা সাহিত্যের পরশুরাম। কলকাতা শহরের জনারণ্য ও যানারণ্যের এক পাশে একে বলা যায় একটা নিভৃত নিকেতন। জীবনের কর্মময় দিন পেরিয়ে এসে ধ্যানময় দিন যাপনের জন্যে স্তব্ধতার ইঁট দিয়ে গড়া হয়েছে যেন এই গৃহ।

বারান্দায় উঠে চারদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম যে, এইখানে বসেই রচিত হয়েছে ব্যাসের মহাভারত এবং বাল্মীকির রামায়ণ।

খবর দিতেই তিনি নেমে এলেন। না হেসে বললেন, "আপনি বুড়োদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন বুঝি?"

বলতে পারলাম না— বুড়ো খুঁজছি নে, খুঁজছি বড়; যাঁরা কেবল বয়সে বড় নন, চিন্তায় আর চেষ্টায়, সাধনায় আর নিষ্ঠায় যাঁরা বড়।

তাঁর সাহিত্যিক জীবনের কথা উঠলে তিনি বললেন, "জীবনে প্রথম লিখি বেয়াল্লিশ বছর বয়সে, ১৯২২ সালে। সে লেখাটা হচ্ছে শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড। লেখাটি প'ড়ে অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, এটি কোনো উকিলের লেখা।"

অথচ এ লেখাটা কোনো আইনজীবীর নয়, একজন বিজ্ঞানীর লেখা: একজন রসায়নশাস্ত্রীর।

আইন তিনি পড়েছিলেন, আইন পাসও করেছিলেন, কিন্তু ওকালতি করেন নি।

"আমার পিতা ছিলেন দ্বারভাঙ্গা স্টেটের ম্যানেজার। দ্বারভাঙ্গা রাজস্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করি, আর পাটনা থেকে ফার্স্ট আর্টস। তার পর বি. এ. আর কেমিস্ট্রি নিয়ে এম. এ. পাস করি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।"

প্রসঙ্গত বললেন যে, রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদের দাদা মহেন্দ্রপ্রসাদ পাটনায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন।

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড লেখার জন্যেই কি তাহলে তিনি জীবনে প্রথম সাহিত্যিক কলম ধরেছিলেন, এর আগে কখনো কোনো দিন দু-এক ছত্র লেখার শখও কি হয় নি?

বললেন, "হয়েছিল। শিশুদের যেমন একবার হাম-ডিপথেরিয়া হওয়াটা একটা নিয়ম। তেমনি প্রাকৃতিক নিয়মে কবিতা লেখার শখ হয়েছিল বাল্যকালে, তখন দু-এক ছত্র লিখেছি। কিন্তু তা পনরো-ষোলো বছর বয়সের মধ্যেই চুকে যায়।"

পাটনায় সাহিত্যালোচনা তাঁদের হত। সহাধ্যায়ী ও সতীর্থদের সঙ্গে। পাটনায় তাঁর সঙ্গে নয়-দশ জন বাঙালি ছাত্র ছিলেন। তখন বঙ্কিম-হেম-নবীনের প্রবল প্রতাপ। তাঁরাই বাঙালির মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা হত। সতীর্থদের মধ্যে অনেকে বলতেন, বঙ্কিমের মত প্রতিভা নেই, ইউরোপেও নেই; আবার কেউ কেউ বলতেন, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকেও হারিয়ে দেবেন।

বললেন, "রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। তখন তিনি কেবল কবি বলেই পরিচিত ছিলেন, গল্প-উপন্যাস বেশি লেখেন নি। সে আমলে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সাধারণ নালিশ ছিল এই যে, তাঁর লেখা কিছু বোঝা যায় না।"

সাহিত্যের সঙ্গে রাজশেখরের সম্পর্ক ছিল কম। জীবনে যেটুকু সাহিত্য-চর্চা হয়েছে তা কেবল সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে আলোচনা এবং অবসর সময়ে সাহিত্যগ্রন্থাদি পাঠ করা। যেমন আর পাঁচ জনে করে। উত্তর-জীবনে কোনো দিন স্বয়ং সাহিত্যিক হয়ে উঠবেন এবং সাহিত্য-রসে নিজেকে জারিত করে নেবেন—এমন সম্ভাবনাও ছিল না, এমন কল্পনাও মনে উদিত হয় নি কখনো। কেননা, তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হবার সঙ্গেসঙ্গে তিনি যে কর্মজীবনে প্রবেশ করেন, সে জীবন আর যাই হোক, তার সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল না আদপে। অনেকে সে জীবনকে রসময় জীবন বললেও বলতে পারেন, কেননা সে জীবন ছিল পুরাপুরি রসায়নেই জারিত।

প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি রসায়নে এম. এ. পাস করেন। বিজ্ঞানে যখন এই পারদর্শিতা লাভ করেছিলেন, তখন উত্তরজীবনে বিজ্ঞানই হবে তাঁর একমাত্র সাধনার ক্ষেত্র— এ বিশ্বাস তাঁর সম্ভবত ছিল। সেইজন্যেই তিনি সেই দিকেই নিজের মনকে চালিত করেছিলেন।

বললেন, "আমি কলেজ ছেড়েই এক রাসায়নিক কারখানায় যোগ দিই। এইখানে একাদিক্রমে ত্রিশ বছর অধ্যক্ষের কাজ ক'রে স্বাস্থ্যহানির দরুন ১৯৩২ সালের শেষের দিকে অবসর গ্রহণ করি।"

এই কারখানার নাম বেঙ্গল কেমিক্যাল। এখানে তিনি যোগ দেন রাসায়নিক হিসাবে, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানটির দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁরই ছাত্রের উপর।

বাংলা ভাষার উপর তাঁর আন্তরিক টান যে ছিল তার নমুনা পাওয়া গেছে এখানেই। এখানে তিনি হিসাবপত্রাদি রাখার নিয়ম করেন বাংলায়, বিভিন্ন বিভাগের নাম করেন বাংলায়, ওষুধপত্রের নামও হয় সংস্কৃত-ইংরাজী মিশিয়ে। গম্ভীর হয়ে বললেন, "সাহিত্যচর্চার কথা বলছিলেন না? বাল্যের কবিতা রচনার শখের কথা বাদ দিলে এই প্রতিষ্ঠানেই আমার সাহিত্যচর্চার আরম্ভ। এখানেই তার হাতে-খড়ি বলতে পারা যায়। অবশ্য, মূল্যতালিকা তৈরি করা বা বিজ্ঞাপন লেখাকে যদি কেউ সাহিত্য বলে গ্রাহ্য করে।

কেননা শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেডের আগে আমার যা-কিছু বাংলা রচনা তা এ ছাড়া আর কিছু না।"

শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড লিখেই তাঁর লেখা হয়তো শেষ হয়ে যেত। এই গল্পটি তিনি রচনা করেন জনকয়েক ধুরন্ধর ব্যবসায়ীকে ব্যঙ্গ করার জন্যে, তাঁর সে উদ্দেশ্যসাধন এর দ্বারাই হয়ে যায়। আর কিছু লেখার ইচ্ছেও ছিল না, প্রেরণাও ছিল না। কিন্তু তাঁর প্রেরণা হয়ে এলেন জলধর সেন; সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড ভারতবর্ষে ছাপা হবার পর জলধরবাবু তাঁকে আরও লেখার জন্যে চাপ দিতে লাগলেন। এঁরই তাগাদায় এবং এঁরই প্রেরণায় তাঁকে একে একে লিখতে হল চিকিৎসা-সংকট, মহাবিদ্যা, লম্বকর্ণ, ভুশণ্ডীর মাঠে।

এই ভাবে জমে উঠল কয়েকটি গল্প। তখন প্রেরণা দিতে এলেন আর-একজন, তিনি ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। গল্পগুলি হয়তো সাময়িকপত্রের পাতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ে থাকত, কিন্তু উৎসাহী ব্রজেনবাবুর উদ্যোগে এই কয়টি গল্প একত্র করে প্রকাশিত হল প্রথম বই গড্ডলিকা ১৩৩২ বঙ্গাব্দে।

বকুলবাগানের বাড়ি তখন হয় নি, তাঁরা তখন থাকেন পার্শিবাগানের পৈতৃক ভবনে। এখানে তাঁদের একটা আড্ডা ছিল, নাম আরবিট্রারী ক্লাব, পরে বাংলা নাম হয় উৎকেন্দ্র। এই সংঘের সদস্যদের মধ্যে জলধরবাবু, প্রবাসীর কেদারবাবু, ব্রজেনবাবু, প্রভৃতি ছিলেন। শিল্পী যতীন্দ্রকুমার সেন ছিলেন সভাপতি। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে মাঝে মাঝে আসতেন।

আজ মনে হচ্ছে, বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসুকে দান করেছেন যাঁরা, তাঁরা আর কেউ নন, তাঁরা ঐ ব্যবসায়ী-ধুরন্ধরেরাই। তাঁদের ঠাট্টা করতে গিয়ে বাংলা দেশের একজন অখ্যাত রাসায়নিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রখ্যাত রসসাহিত্যিক হয়ে উঠলেন। একজন রসায়নশাস্ত্রী হয়ে উঠলেন একজন রসশাস্ত্রী। এত ছোট একটা উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে এমন-একটা মহোৎসব বড়-একটা দেখা যায় না।

জলধরবাবু আর ব্রজেনবাবু যে চারাগাছটির সন্ধান পেয়েছিলেন, স্নেহের জলে ও উৎসাহের রৌদ্রে সেই শিশুবৃক্ষটিকে বিরাট মহীরুহে পরিণত করার জন্যে তাঁরা চেষ্টা করেছেন, এজন্য বাংলাদেশ ও বাংলা সাহিত্য তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সেই চারাগাছটির সূচনায় ছিল যে অঙ্কুর, যে জনকয়েক ব্যবসায়ী তাঁদের আচার এবং আচরণের দ্বারা তার বীজটি উপ্ত করে গেছেন, তাঁদের সেই আচার-আচরণকে সমর্থন না করলেও তাঁদের আজ ধন্যবাদ জানাতে ইচ্ছে করে। কেননা তাঁরাই পরশুরামকে প্রস্তুত করেছেন।

পয়লা সেপ্টেম্বর ১৯৫২, ১৬ই ভাদ্র ১৩৫৯। সকালবেলা তাঁর সম্মুখে বসে তাঁর জীবনের কাহিনী শুনছি। ছোট ছোট কাটা-কাটা কথা দিয়ে গম্ভীর মুখে তিনি ধীরে ধীরে বলে চলেছেন।

দুর্গাপুজার আর বেশি দেরী নেই। সর্বজনীন পুজোর জন্যে পাড়ায়-পাড়ায় যুবকমহলে উৎসাহের ধুম পড়ে গেছে। আমরা কথা বলছি, এমন সময় বকুলবাগানের পুজো-কমিটির জনৈক তরুণ উৎসাহী এসে বাণী চাইলেন রাজশেখরবাবুর কাছে।

—"বাণী?" তিনি যুবকটির মুখের দিকে চেয়ে বললেন, "বাণী কি? বাণীর মত ভণ্ডামি আর কিছুই নেই।"

নিরুৎসাহও করলেন না, বাণীও দিলেন না, কেবল বললেন, "পুজোপার্বণের মত উৎসবের দিনে রেডিয়োর প্রেমসংগীত বন্ধ করা যায় কি না, সেইটে দেখ। আর, ওরিয়েণ্টাল দুর্গা, ওরিয়েণ্টাল সরস্বতী নাম দিয়ে প্রতিমা গড়ার সময় আর্টের যে শ্রাদ্ধ হচ্ছে তা রোধ করা যায় কি না তার উপায় খোঁজো।"

বাণী দিলেন না বটে, বাণী দেওয়ার মত অপ্রীতিকর বিষয় নেই ব'লে মন্তব্য করলেন বটে, কিন্তু পুজো-কমিটির প্রতিনিধি তাঁর এই উক্তি কয়টিকেই তাঁর বাণী বলে গ্রহণ করে চলে গেলেন। এর দ্বারা কোনো কাজ হবে কি না জানি নে, যদি এই কথা কয়টির জন্যে অন্তত একটা দুর্গাপ্রতিমাও তথাকথিত ওরিয়েণ্টাল আর্টের কবল থেকে রক্ষে পায়, তাহলেই অনেকটা কাজ হয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে।

আমাদের কথায় ছেদ পড়ে গিয়েছিল। বাংলার রুচি ধীরে ধীরে কি ভাবে বিকৃত হয়ে যাচ্ছে, হয়তো তার জন্যে তিনি উৎকণ্ঠিত হয়েছেন মনে মনে। হয়তো তাঁর মনে পড়ে গেছে পুরাতন বাংলার কথা, তার অকৃত্রিম সাধনার কথা, অবিকৃত রুচির কথা, তার জ্ঞানের কথা। মনে পড়ে গেছে বাংলার যশস্বী ও মনস্বীদের কথা।—

বললেন, "যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধে আপনার লেখাটি দেখেছি। খুব ভালো করেছেন লিখে।"

বিদ্যানিধি মহাশয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এতটা গভীর, আগে আন্দাজ করতে পারি নি, বললেন, "এরকম বহু বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক বাংলাদেশে এখন নেই, তাঁর দ্বিতীয় নেই। এঁর সঙ্গে তুলনা করা চলে একমাত্র সেকালের রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের। একটি উদ্ভট শ্লোক আছে, তাতে পাণিনিকে বলা হয়েছে অশেষবিৎ। যোগেশচন্দ্রও অশেষবিৎ।"

বাহাত্তর বছর বয়সের বৃদ্ধ, কিন্তু এখনো যুবাব উৎসাহ আছে পরশুরামের চলায় ও বলায়। কথা বলতে বলতে রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে চট করে উঠে পড়লেন, শেল্‌ফ্‌ থেকে নামিয়ে আনলেন একটা মোটা বই, পাতার পর পাতা উল্টিয়ে আমাকে দেখালেন, বললেন, "এই শব্দকোষ, বিদ্যানিধি মহাশয়ের এ একটা কীর্তি। বইটা বহুদিন ছাপা নেই। কোনো প্রকাশক উৎসাহ করে এ বই আর ছাপছেনও না। এতে কেবল শব্দের অর্থই নেই—এটা আসলে একটা এন্‌সাইক্লোপিডিয়া। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ও রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম লিখেছেন।"

খুব গোছগাছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মানুষটি, প্রত্যেকটি জিনিস ঠিক ঠিক জায়গায় রাখা আছে। একটা জিনিস খুঁজতে গিয়ে দুটো জায়গা হাটকাতে হয় না, উঠে গিয়ে শব্দকোষ রেখে দিয়ে এসে বললেন, "বহুকাল আগে লেখা বিদ্যানিধি মহাশয়ের রত্নপরীক্ষা বইটি কোনো আধুনিক ইংরেজি বইয়ের তুলনায় নিকৃষ্ট নয়। হীরা-মানিক প্রভৃতি রত্ন সম্বন্ধে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে প্রমাণ উদ্ধৃতিসহ এই বইটি লেখা। কেউ ছাপিয়ে যদি প্রচার করে তা হলে বেশ চলে। কিন্তু তেমন উৎসাহী প্রকাশক কই?"

এঁর সম্বন্ধে হয়তো আরো অনেক কিছু বলতেন, কিন্তু বেলা বেড়ে যেতে লাগল। এই জন্যে এই প্রসঙ্গ এইখানেই চাপা পড়ে গেল।

তাঁর জন্ম-সন ও তারিখ আমার জানবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সে কথা বলার আগেই তিনি উঠে পড়লেন। যে উৎসাহ নিয়ে শব্দকোষ নামিয়ে আনলেন, ঠিক সেই ভাবেই উঠে গিয়ে আলমারি খুলে একটা চটি বই নিয়ে এলেন, "আমার বাবার এক বংশতালিকা প্রস্তুত আছে, এর থেকে জন্ম-তারিখ দেখে নিতে পারেন।"

বহু পুরাতন একটি বই। তাঁদের বংশের অনেকের নাম এতে লেখা। তার থেকে আমি টুকে নিলাম— দ্বিতীয় পুত্র, জন্ম ১২৮৬ বঙ্গাব্দ, ৪ চৈত্র [১৬ই মার্চ, ১৮৮০] মঙ্গলবার, রাত্রি ২৪ দণ্ড। —বর্ধমান জেলার ব্রাহ্মণ-পাড়ায় মাতুলালয়ে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

এখন তিনি রচনা করেন দুই নামে, গল্প রচনা করেন পরশুরাম নামে, আর অন্যান্য রচনা স্বনামে। গল্পরচনায় এইরূপ ছদ্মনাম ব্যবহারের তাৎপর্য কি— এ সম্বন্ধে অনেকের কৌতূহল আছে, এ পরশুরাম কোন্ পরশুরাম ?

বললেন, "এ একটি স্যাকরা। পৌরাণিক পরশুরামের সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ নেই।"

যখন সিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড লিখেছেন, এবং তাঁদের পার্শিবাগানের বাড়িতে উৎকেন্দ্র সংঘে সেটি পাঠ করা হয়েছে, তখন এটি একটি কাগজে ছাপার কথা উঠল, সে কাগজ অবশ্য জলধর সেন সম্পাদিত ভারতবর্ষ। নিজের নামে লেখা ছাপানোয় তাঁর সংকোচ ছিল। তাই একটা নামের খোঁজ হচ্ছে সকলে মিলে।

বললেন, "দৈবক্রমে সেই সময় তারাচাঁদ পরশুরাম নামে এক কর্মকার-কোম্পানির অন্যতম পার্টনার পরশুরাম সেখানে উপস্থিত হয়। হাতের কাছে তাকে পেয়ে তার নামটা নিয়ে নেওয়া হল। এই নামের পিছনে অন্য কোনো গূঢ় উদ্দেশ্য নেই। পরে আরো লিখব জানলে ও-নাম হয়তো দিতাম না।"

স্যাকরা পরশুরাম হয়তো জানে না যে, তার নামটা কতটা বিখ্যাত হয়ে

পড়েছে। সে জীবিত আছে কি না জানি নে। জীবিত থেকে থাকলেও হয়তো সে তার এই নামের জন্যে বিন্দুবিসর্গও কেয়ার করত না। নিজের নামটি ধার দিয়ে একজনকে সে কৃতার্থ করে দিয়েছে বলে তার আত্মতৃপ্তিও হয়তো হত না।

বললেন, "জীবনে আমি খুব কম লোকের সঙ্গে মিশেছি, তাই আমার অভিজ্ঞতাও খুব কম। গ্রাম বেশী দেখি নি। কর্মক্ষেত্রে যাদের সঙ্গে মিশেছি তারা সব ব্যবসায়ী আর দোকানদার ক্লাস।"

অভিজ্ঞতা কম হতে পারে, কিন্তু সেই সামান্য অভিজ্ঞতাকেই তিনি যে অসামান্য কাজে লাগিয়েছেন তার প্রমাণ তো তাঁর প্রথম গল্পই। এও তো একটা ব্যবসায়ী ক্লাসকে ব্যঙ্গের অভিপ্রায়ে নিজের অজানিতেই একটা সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণ্ডেরিরাম বাটপারিয়াকে আজ কে না চেনে?

গড্‌ডলিকা প্রকাশিত হবার পর প্রমথ চৌধুরী এঁর সম্বন্ধে সবুজ পত্রে প্রবন্ধ লেখেন এবং রবীন্দ্রনাথ লেখেন প্রবাসীতে।

এই সব ঘটনার পর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রবীন্দ্রনাথকে কৃত্রিম অভিযোগ জানিয়ে লেখেন যে, তিনি পরশুরামের এত সুখ্যাতি করায় প্রফুল্লচন্দ্রকে অসুবিধায় পড়তে হবে এই আশঙ্কা তাঁর হয়েছে; কেননা প্রশংসার দরুন বেঙ্গল কেমিক্যাল ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। হয়তো এতে গড্‌ডলিকা হাজার বারো বিক্রী হবে, এবং কোম্পানির ম্যানেজার কেমিস্ট্রি ছেড়ে গল্প নিয়ে মত্ত হয়ে যাবেন।

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

"শান্তিনিকেতন

সুহৃদ্বর, বসে বসে Scientific American পড়ছিলুম, এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে সন্দেহ হল আমার হৃৎপদ্ম থেকে কাব্যসরস্বতীকে বিদায় করে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রান্ত চল্‌চে। খুলে দেখি, যাকে বলে ইংরেজিতে টেবিল-ফেরানো—আমারই পরে অভিযোগ যে, আমি রসায়নের কোঠা

থেকে ভুলিয়ে ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায় না ; একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন কত ছেলে যারা আজ পেটমোটা মাসিক পত্রে ছোট গল্প আর মিলহারা ভাঙা ছন্দের কবিতায় সাহিত্যলোকে একেবারে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারত, এমন কি, লেখাদায়গ্রস্ত সম্পাদকমণ্ডলীর আশীর্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনায় লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত, তাদের আপনি কাউকে বি. এস-সি. কাউকে ডি. এস-সি. লোকে পার করে দিয়ে ল্যবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী করে তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন মাসিকপত্র বলে যেসব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত ভুশণ্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পালা যেন তিনি রচনা করেন।

"আমার কথা যদি বলেন আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হই নি, বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েচে। এমন কি ভাবচি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মত শুদ্ধির কাজে লাগব, যেসব জন্মসাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের ফের একবার জাতে তুলব। আমার এক-একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন, কিন্তু আর বোধ হয় উদ্ধার নেই। যাই হোক, আমি রস-যাচাইয়ের নিকষে আঁচড় দিয়ে দেখলাম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড্ নন্, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।

"এ অঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন তাহলে মোকাবিলায় আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করা যাবে। ইতি ১৮ অগ্রান ১৩৩২

আপনার

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর"

প্রফুল্লচন্দ্রের কাছে লিখিত এই চিঠিটা সযত্নে তিনি রেখে দিয়েছেন, আমাকে দেখতে দিলেন।

আর-একটা চিঠিও দেখলাম, রাজাগোপালাচারীর লেখা— তাঁর লেখার তামিল অনুবাদ দেখে রাজাজী অযাচিতভাবে তাঁকে একটা প্রশংসাপত্র পাঠান।

কয়েকটি ভাষায় এঁর রচনা অনুদিত হয়েছে। যেমন, হিন্দী তামিল তেলুগু আর কানাড়ী।

কর্মস্থল থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন, আগেই বলেছি, ১৯৩২ সালে। অবসর গ্রহণের পরে সাত-আট বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা ও বানান-সংস্কার সমিতির সভাপতিত্ব করেন, এখন তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সরকারী কার্যের পরিভাষা-সমিতির সভাপতি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৫ সালে সরোজিনী পদক ও ১৯৪০ সালে জগত্তারিণী পদক দিয়ে এঁকে সম্মানিত করেছেন।

১৯৫৫ সালে তাঁর সাহিত্যিক দানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এঁকে রবীন্দ্র-স্মৃতিপুরস্কার দেন।

১৯৫৬ সালে ভারত সরকার এঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে ডি. লিট, উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

বকুলবাগানের রাস্তার একপাশে ছায়া দেখা দিয়েছে এখন। সেই ছায়ায় ছায়ায় ধীরে ধীরে হাঁটা দিলাম। সূর্যকে সম্মুখে করে যাত্রা করেছিলাম, এখন সে সূর্য আমার পিছনে। মনে হল, সত্যিই এক সূর্য-প্রতিভাকেই যেন ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

রচিত গ্রন্থাবলী

গড্ডলিকা । গল্পসংগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৩২

কজ্জলী । গল্পসংগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৩৫

হনুমানের স্বপ্ন । গল্পসংগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৪৪

চলন্তিকা । অভিধান। বঙ্গাব্দ ১৩৪৫

লঘুগুরু । প্রবন্ধসংগ্রহ

মেঘদূত । সটীক বাংলা অনুবাদ। বঙ্গাব্দ ১৩৫০

ভারতের খনিজ। বঙ্গাব্দ ১৩৫০

কুটীরশিল্প। বঙ্গাব্দ ১৩৫০

বাল্মীকি রামায়ণ । সারানুবাদ। বঙ্গাব্দ ১৩৫৩

মহাভারত । সারানুবাদ। বঙ্গাব্দ ১৩৫৬

হিতোপদেশের গল্প। বঙ্গাব্দ ১৩৫৭

গল্পকল্প। গল্পসংগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৫৭

ধুস্তুরী মায়া । গল্পসংগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৫৯

কৃষ্ণকলি। গল্পসংগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৬০

বিচিন্তা। প্রবন্ধসংগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৬২

নীলতারা। গল্পসংগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৬৩

আনন্দীবাঈ। গল্পসংগ্রহ। বঙ্গাব্দ ১৩৬৪

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

উনিশ শতকের বাংলাদেশ নিয়ে আমরা গৌরব বোধ করে থাকি। সাহিত্য-সাধনায়, দেশপ্রেমে, বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক তত্ত্ব-আলোচনায়, এমন কি পরাধীনতার শৃঙ্খলমোচনের জন্যে বৈপ্লবিক আন্দোলনে উনিশ শতকের বঙ্গ-সন্তান সারা ভারতের সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। What Bengal thinks to-day India thinks to-morrow কথাটার উৎপত্তি উনিশ শতকের বঙ্গসন্তানদের বিভিন্নমুখী চিন্তার ও কর্মতৎপরতার জন্যেই। বর্তমানে বাংলাদেশ কি হয়েছে সে-কথা ভেবে রোদন করার সময়ে গতকল্য বাংলাদেশ কী ছিল সে কথা ভেবে সামান্য গৌরব বোধ করতে আমরা ইচ্ছুক।

বিংশ শতকের বাংলাকে অনেকে যজ্ঞাগ্নির ভস্মাবশেষ বলে থাকেন। তাঁদের এ-উক্তির প্রতিবাদ নাহয় না করলাম, কিন্তু এ জন্যে হাহুতাশ করতে আমরা ইচ্ছুক নই, এর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিতেও আমরা রাজি না। আমরা জানি, প্রকৃতির রাজ্যে এরকম ঘটনা নিয়ত ঘটছে। এক বছর কোনো বিশেষ শস্যের অত্যধিক ফলন হলে পর-বৎসর সেই শস্যের ফসল হয়তো ভালো হয় না। সেইজন্যে আর কোনো দিন সুফসল হবে না বলে স্থিরসিদ্ধান্ত করে নেওয়া সম্ভবত সঙ্গত নয়। বাংলাদেশেও একটি শতাব্দী অতিমাত্রায় উর্বরতার পরিচয় দিয়েছে, পরবর্তী শতাব্দীতে যদি একটু আকাল দেখা দিয়ে থাকে তাহলেই বাংলার মাটিকে ধিক্কার দিয়ে তার চিরকাল সম্বন্ধে সমস্ত আশা বিসর্জন দিতে আমাদের মন সায় দেয় না।

উনিশ শতকের সীমা পার হয়ে এসে এই বিংশ শতকে যেসকল বঙ্গসন্তান তাঁদের সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগ আমাদের দিয়েছেন, ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় সেই স্মরণীয়দের একজন। জ্ঞানচর্চায় বিজ্ঞানসাধনায় শিল্প ও সাহিত্য—সৃষ্টিতে যাঁরা বাংলাদেশকে গৌরবান্বিত করেছেন, তাঁদের মত নিষ্ঠা তাঁদের মত সাধনা কিংবা তাঁদের মত সুসংস্কৃত মনের উদার পরিচয় আমরা বিধানচন্দ্র রায়ের মধ্যে হয়তো পাইনি, কিন্তু যা পেয়েছি তা সামান্য নয়।

এই অসামান্যতার জন্যই তিনি অনন্য এবং স্মরণীয়। ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা হবে অন্য ভাবে। লেখা হবে—এই দেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হবার পর থেকে আজ অবধি এ রকম সর্ব কর্মে সমান দক্ষতার পরিচয় দেবার উপযুক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন বলিষ্ঠ মানুষ এ-দেশে আর জন্মায় নি। এখানে কেবল বৃটিশ শাসন কালের কথা উল্লেখ করা হল এই জন্যে যে, এ-দেশের ইতিহাসে এটা একটি অভিনব অধ্যায়. তার আগের ইতিহাস আমরা মন্থন করি নি।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে পাটনায় বিধানচন্দ্রের জন্ম। সে সময় বিহার বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পিতা প্রকাশচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। জীবনের বেশির ভাগ সময়ই তাঁর এই কর্মস্থলে অতিবাহিত হয়।

বিধানচন্দ্রের জীবনের প্রথম কুড়ি বৎসর কাটে বিহারে। এইখানেই তাঁর স্কুল-কলেজের অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। এবং ১৯০২ সালে তিনি বি. এ. পাস করেন।

এর পর তাঁরা এলেন কলকাতায়। এইবার বিধানচন্দ্রের জীবন এবং তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে যা ঘটল তাকে জুয়াখেলা হয়তো বলা যায়। ইঞ্জিনিয়ারিং কিংবা ডাক্তারি— এই দুটির কোন্‌টিতে তাঁর পুত্রকে ভর্তি করবেন এ বিষয় পিতা প্রকাশচন্দ্র মনস্থির করতে পারছিলেন না। অতএব কলকাতার মেডিকাল কলেজে ও শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দু জায়গাতেই ভর্তির আর্জি পেশ করা হল। ঠিক হল, যেখান থেকে উত্তর আগে আসবে সেইখানেই ভর্তি হবেন বিধানচন্দ্র— পিতা ও পুত্র দুজনেই এ বিষয়ে একমত হলেন। অর্থাৎ বিষয় দুটির মধ্যে কোনো বিশেষ একটির প্রতি তাঁদের আগ্রহ যে ছিল না— এই ব্যবস্থা থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু একদিন খবর এল— একই দিনে দু জায়গা থেকে। সকালের ডাকে এল মেডিকাল কলেজের চিঠি, বিকেলের ডাকে ইঞ্জিনিরারিং কলেজের। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিধানচন্দ্র মেডিকাল কলেজে ভর্তি হলেন। যদি ডাকের কোনো রকম গোলযোগে কিংবা চিঠিবিলির হেরফেরে একটু এদিক-ওদিক হয়ে যেত তাহলে বিধানচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কি হত কিংবা আমাদের বর্তমানই বা কি হত,

আমরা বলতে পারি নে। হয়তো আমরা খুব বড়দরের একজন ইঞ্জিনিয়ার পেয়ে যেতাম, হাওড়ার বর্তমান পুলটি বানানোর জন্যে বিদেশ থেকে ইঞ্জিনিয়ার আমদানি হয়তো করতে হত না, কিংবা— কিন্তু সে কথা থাক্। আমরা পেয়েছি অদ্বিতীয় একজন চিকিৎসক, এমন-এক প্রতিভাধর ব্যক্তি যাঁর প্রতিভা শুধুমাত্র বিশেষ একটি বিষয়ে কার্যকর প্রয়োগের জন্যে নির্মিত নয়, যে-কোনো বিষয়ে প্রয়োগের উপযুক্ত কুশলতা যাঁর মধ্যে আছে। বাংলাদেশ অনেক সাহিত্যিক অনেক বৈজ্ঞানিক অনেক দেশপ্রেমিক এবং অনেক রাজনীতিবিদ্ লাভ করেছে। সেজন্যে বাংলাদেশ গৌরব বোধ করতে পারে। সেই গৌরবের সঙ্গে অতিরিক্ত এই গৌরবটিও বাংলাদেশের ভাগ্যে যে লাভ হয়েছে, সে কথাও বাংলাদেশের ইতিহাস স্মরণে রাখবে— বাংলাদেশ পেয়েছে এমন-একটি ধী-সম্পন্ন মানুষ যার তুলনা সহজে পাওয়া দুষ্কর।

বিধানচন্দ্র মহারাজ-প্রতাপাদিত্যের বংশজ। বাংলার ও বাঙালির মুক্তি-সংগ্রামে একদা রাজা প্রতাপাদিত্য নায়কতা করেছিলেন, তাঁর নাম সেইজন্যে বাংলায় স্মরণীয় হয়ে আছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁকে স্মরণ করেছেন—

যশোর নগর ধাম প্রতাপ-আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥

সেই বীর যোদ্ধার বংশে জন্মগ্রহণ করবার দরুনই সম্ভবত আমরা এই গুণাবলীর কিঞ্চিৎ আভাস বিধানচন্দ্রের মধ্যে লাভ করে থাকি। তিনি নির্ভীক এবং তাঁর ব্যক্তিত্বের কাছে সকলে প্রায় নিষ্প্রভ।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য রাজা বসন্ত রায়ের চেষ্টায় তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা ভবানী দাস যশোরে আগমন করেন এবং তাঁর পুত্র যদুনন্দন মাইহাটি ও অন্যান্য পরগনার অধিকারী হয়ে শ্রীপুরে বসবাস আরম্ভ করেন।

বর্তমানে মাইহাটি পরগনাটি চব্বিশ-পরগনার অন্তর্ভুক্ত, এবং শ্রীপুর গ্রামটি মাইহাটির অন্তর্গত। বিধানচন্দ্রের পিতা প্রকাশচন্দ্র যদুনন্দনের সপ্তমপুরুষ।

স্বগ্রামের সমশ্রেণীর কুলীন বিপিনচন্দ্র বসুর কন্যা অঘোরকামিনীর সঙ্গে প্রকাশচন্দ্রের হিন্দুশাস্ত্র-মতে বিবাহ হয়। যৌবনেই এই দম্পতি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

ব্রাহ্ম আন্দোলন আরম্ভ হয় রাজা রামমোহনের দ্বারা। তার প্রায় আশি বছর পরে এই আন্দোলন সমাজসংস্কার ও ধর্মালোচনা এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দ্বিতীয় দলের নেতা রূপে গণ্য হন; প্রকাশ-চন্দ্র তখন কেশবচন্দ্রের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। কেশবচন্দ্র ব্রাহ্মসমাজের এই শাখার নাম দিলেন নববিধান। প্রকাশচন্দ্র তাঁর পুত্রের নামও নির্বাচন করলেন এখান থেকেই, সে নাম হল— বিধান।

বিধানচন্দ্রের পিতা কর্মদক্ষতা সততা সদ্ব্যবহার এবং অনাড়ম্বর জীবন-যাপনের জন্যে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন; বিধানচন্দ্রের মাতা অঘোর-কামিনী ধর্মাচরণ পরোপকার সমাজসেবা এবং লোকহিতকর কার্যাদির জন্য সকলের শ্রদ্ধা লাভ করেন। সেকালে এই পরিবার একটি আদর্শ পরিবাররূপে গণ্য হয়েছিল, এবং শিক্ষিত সমাজ এই পরিবারটিকে 'অঘোর-পরিবার' আখ্যা দিয়েছিল।

বিধানচন্দ্রের মাতার জীবনী রচনা করেছেন বিধানচন্দ্রের পিতা, বইটির নাম 'অঘোর প্রকাশ'; এই গ্রন্থে ঐ মহীয়সী মহিলার জীবনকথা বিবৃত আছে।

মেডিকাল কলেজে পাঠ আরম্ভ করলেন বিধানচন্দ্র। ১৯০৬ সালে এখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এল. এম. এস. ডিগ্রি লাভ করলেন। সে সময় এম. বি. ডিগ্রি প্রবর্তিত হয় নি। তার পর ১৯০৮ সালে বিধানচন্দ্র লাভ করলেন এম. ডি. ডিগ্রি। আঠাশ বৎসর বয়সের এই যুবকের এই কৃতিত্বে সে-সময় সকলেই বিস্মিত হয়, এবং উত্তরকালে এই যুবক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সমান আসন যে লাভ করবেন, সে বিষয়ে কারো কোনো সংশয় থাকে না।

এম. ডি. ডিগ্রি লাভ করবার পর বিধানচন্দ্র প্রাদেশিক মেডিকাল সার্ভিসে যোগ দেন। কিছুদিন বিভিন্ন জেলায় তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়,

অবশেষে ১৯১০ সালে তিনি একজন টিচার রূপে কলকাতার ক্যাম্পবেল মেডিকাল স্কুলে বদলি হন। কিন্তু এ কাজ তাঁর ভালো লাগল না। তিনি এই সরকারি চাকুরির মায়া ত্যাগ করে উচ্চশিক্ষালাভের জন্যে বিলাতে রওনা হলেন। এবং অতি অল্পকাল, মাত্র এক বছরের মধ্যেই, এম.আর.সি.পি. ও এম. আর. সি. এস. এই দুইটি ডিগ্রি লাভ করলেন। এর পর তিনি ইংলণ্ডের এফ.আর.সি.এস. হলেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ সালে রয়াল সোসাইটি অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন অ্যাণ্ড হাইজিনের এবং ১৯৪০ সালে আমেরিকান সোসাইটি অব চেস্ট ফিজিশিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন।

১৯৪১ সালে বিধানচন্দ্র বাংলার স্টেট মেডিকাল ফ্যাকাল্‌টির ফেলো, এবং ১৯৩৯ ও ১৯৪৪ সালে ইণ্ডিয়ান মেডিকাল কাউন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হন। দুইবার তিনি ইণ্ডিয়ান মেডিকাল অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট এবং ১৯৩৩ সালে অল-ইণ্ডিয়া লাইসেনশিয়েট অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট হন।

বিদেশ থেকে সম্মানের মাল্য কণ্ঠে ধারণ করে তিনি দেশে ফিরে এলেন। এখানে এসে অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁর পসার এমন বিপুল ভাবে দেখা দিল যা তাঁর সমব্যবসায়ী অনেক উচ্চশ্রেণীর চিকিৎসকের ভাগ্যেও ঘটে নি। চিকিৎসা-বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতার জন্য অল্পকালের মধ্যেই তাঁর নাম ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক বলে দেশময় প্রকাশিত হল।

প্রায় বারো বৎসর বিধানচন্দ্র এই ভাবে চিকিৎসা-চর্চা নিয়েই ব্যাপৃত ছিলেন। এই সময়ে, ১৯২৩ সালে, তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের দ্বারা রাজনীতিতে দীক্ষিত হলেন, এই সময়ে ভারতের রাজনীতিতে গান্ধী-যুগের আরম্ভ। এই বৎসর কংগ্রেসের অনুমোদন নিয়ে স্বরাজ্য দল মণ্টেগো-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার অনুযায়ী গঠিত আইন সভায় প্রবেশের জন্যে নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচনসংগ্রাম পরিচালিত হয়। রাজনীতিতে হাতে খড়ির সঙ্গেসঙ্গেই বিধানচন্দ্রকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হল। স্বরাজ্য দলের সমর্থন লাভ করে স্বতন্ত্র প্রার্থী রূপে বাংলার আইন-সভার একটি আসনের

জন্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হলেন বিধানচন্দ্র, তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন, আর কেউ নয়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই নির্বাচনে জয়ী হলেন ডাক্তার বিধানচন্দ্র। আইন-সভায় স্বতন্ত্র সদস্য হলেও তিনি দেশবন্ধুর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিলেন। এর পর তিনি যোগ দেন কংগ্রেসে। আজ অবধি সেই প্রতিষ্ঠানের সক্রিয় সদস্য রূপে তিনি কাজ করছেন।

১৯২৮ সালের কলকাতা-কংগ্রেসের তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, এর পরেই তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩১ সালের আইন-অমান্য-আন্দোলনের সময়ে বোম্বাই থেকে কলকাতায় ফিরবার পথে ভারতের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ওয়ার্ধা স্টেশনে তিনি গ্রেপ্তার হন।

মণ্টেগো-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের পরবর্তী শাসন-সংস্কার বিধিবদ্ধ হয় ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে। এর দ্বারা প্রাদেশিক শাসন বিষয়ে জনপ্রতিনিধিদের উপর অধিকতর ক্ষমতা দান করা হয়। কংগ্রেস ১৯৩৭ সালে পুনরায় নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হয়, এই সময়ে বিধানচন্দ্র বাংলার পার্লামেণ্টারি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়ে কংগ্রেসের নির্বাচন-অভিযান পরিচালনা করেন, তিনি নিজে সদস্যপদের জন্য প্রার্থী হন না। এই নির্বাচন-অভিযানের নেতৃত্বে তিনি বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দেন।

১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন কেন্দ্র থেকে কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী রূপে আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

এই বৎসর ভারত স্বাধীনতা লাভ করল। স্বাধীনতা লাভের সঙ্গেসঙ্গে ভারত-ব্যবচ্ছেদ হয়ে বাংলাদেশ ভেঙে গেল দু ভাগে—বাংলার পরিবর্তে উদ্ভব হল পশ্চিম-বাংলার। স্বাধীন ভারতের এই নব রাজ্যে প্রবর্তিত হল স্বাধীন গবর্নমেণ্ট। ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ হলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বেশিদিন তিনি এই কাজ পরিচালনা করতে পারলেন না, কয়েক মাস পরেই, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি পদত্যাগ করলেন। ডাক্তার বিধানচন্দ্র তখন ইউরোপে।

দেশে ফিরে আসার পরই মুখ্যমন্ত্রীত্বের দায়ভার গ্রহণ করলেন বিধানচন্দ্র।

তার পর ১৯৫২ ও ১৯৫৭ দুইটি সাধারণ নির্বাচনের পরও তিনি সেই পদে আসীন আছেন।

রাজনীতিতে এত দীর্ঘকাল ধরে এভাবে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও বিধানচন্দ্র তাঁর সমস্ত শক্তি কেবল রাজনীতিতেই ব্যয় করেন নি। তিনি রাজনীতি-ক্ষেত্রে আসার আগে থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্যে মনোযোগী হন। ১৯২১ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি অ্যান্টিবায়োটিকস্ যাতে ভারতেই প্রস্তুত হতে পারে তার জন্য ল্যাবরেটরির প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শিলঙে জলবিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যবস্থা করেন।

দেশের শিক্ষা-ব্যাপারেও তাঁর মনোযোগ কম ছিল না। তিনি সুদীর্ঘ বত্রিশ বৎসর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। ১৯১৬ সালে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯২৪ সালে বোর্ড অব অ্যাকাউন্টসের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয়ে দশ বছরের বেশি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৩৪ সালে তিনি সিণ্ডিকেটের সদস্য হন। ১৯৪২ সালে তিনি ভাইস-চ্যান্সেলার নির্বাচিত হন, ১৯৪৪ সালের ১২ মার্চ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল ছিলেন। ভাইস-চ্যান্সেলার থাকা কালে তিনি ইণ্ডিয়ান এয়ার-ফোর্স ট্রেনিং কোর প্রতিষ্ঠা করেন, এই সময়ে তাঁর উদ্যোগে সমাজসেবী কর্মীদের শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস খোলা হয়। ১৯৪৪ সালের ১৪ জুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. এস-সি. উপাধিতে ভূষিত করেন।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালে পর পর দুই বৎসর কলকাতা করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে কয়েক বৎসর তিনি করপোরেশনের অল্ডারম্যান ছিলেন।

আর. জি. কর মেডিকাল কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে ইনি এর প্রধান তত্ত্বাবধায়ক রূপে কাজ করেন। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ যে ক্ষুদ্র অবস্থা থেকে আজ একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে তার মূলেও বিধানচন্দ্রের উৎসাহ চেষ্টা ও উদ্যোগ আছে।

চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ক্যান্সার ইন্স্টিটিউট, ক্যালকাটা মেডিকেল অ্যাসো-

সিয়েশন, যাদবপুর টি. বি. হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তনে ও পুষ্টিতে বিধানচন্দ্রের অক্লান্ত শ্রম ও অধ্যবসায় আছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্যে তিনি তফাতে বসে উপদেশ দিয়ে কার্যসিদ্ধি করেছেন ভাবলে ভুল করা হবে। কর্মী বললে যা বোঝায়, তিনি তার বেশি—তিনি, যাকে বলে, কাজ-পাগল। যে কাজে তিনি যোগ দেন, সেই কাজেই নিজেকে সম্পূর্ণ মগ্ন করে না দিলে তাঁর মন ওঠে না। যাবতীয় খুঁটি-নাটি বিষয়ের পুরোপুরি খবর নিয়ে তিনি কাজ করে থাকেন। কাজ সম্বন্ধে তাঁর এইরূপ অপরিসীম আগ্রহ ও উৎসাহের দরুন, তাঁর সঙ্গে যে-ই কাজ করতে আসে তাকেই অনেক সময় এই কর্মপ্রাণ ব্যক্তিত্বের আড়ালে চাপা পড়ে যেতে হয়। প্রদীপের আলো সন্ধ্যাকালের তুলসীমঞ্চ আলোকিত করে রাখে, সে আলোর উজ্জ্বলতা তুচ্ছ করার মত নয়; কিন্তু মধ্যাহ্নসূর্যের তীব্র আলোর নীচে প্রদীপের সে-আলো প্রভাহীন হয়ে পড়েই। বিধানচন্দ্রের সহকর্মীদের প্রভাহীনতা, বিধানচন্দ্র-ব্যক্তিটির ত্রুটি কিংবা বিধানচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের গৌরব? এ তর্ক যদি উঠে থাকে তাহলে তার মীমাংসা করার চেষ্টা আমরা না করলাম।

জীবনে তিনি উন্নতি করেছেন, কিন্তু তাঁর মতে তাঁর জীবনকে তিনি নিজের চেষ্টায় উন্নত করেন নি। বলেন, "ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। আমার মধ্যে কোনো প্রতিভা ছিল না, কৃতিত্ব লাভের বাসনাও ছিল না। অন্যান্য ছাত্রের মতই আমিও ছিলাম সাধারণ একজন। শিক্ষককে ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারলে খুশি হতাম। আবার, পরীক্ষায় পাস করেছি জানতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করতাম। ক্লাসে প্রথম হব, কিংবা সবচেয়ে বড়.হব— এ ধরনের কোনো আগ্রহই কোনোদিন ছিল না। যখন ডাক্তারি করতে আরম্ভ করলাম তখনও মনে করিনি সবচেয়ে উঁচুশ্রেণীর ডাক্তার হব। কিন্তু একটা কথা আছে। যখনই যে কাজ আমার কাছে এসেছে তখন তা করেছি একটিমাত্র তাগিদে—সে হচ্ছে কর্তব্যবোধের তাগিদ। মেডিকাল কলেজে যখন প্রথম ঢুকি, দেখি, বোর্ডে উপদেশ-বাণী লেখা আছে—'যাহা কিছু করিবে সর্বশক্তি দিয়া করিবে।' আমার জীবনের আদর্শের সঙ্গে ঐ উপদেশ মিলে গেল।"

অনুরূপা দেবী

গাঁদার অরণ্য। উজ্জ্বল সেই হলুদ শোভার দিকে মুখ ক'রে ব'সে আছি বারান্দায়। শীতের প্রথম আমেজে ওই ফুলেদের ধড়ে যেন প্রাণ এসেছে, সেই প্রাণের প্রাচুর্য নিয়ে তাই বুঝি এমন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ওরা।

দেওয়ালির উৎসবের দিন। ১৯ কার্তিক ১৩৬০, ৫ নবেম্বর ১৯৫৩। বেলা দুপুর। রানীগঞ্জের স্তব্ধতা। মাঝে মাঝে অবশ্য অদূরের রেললাইন দিয়ে দ্রুতগামী ট্রেনের শাণিত হুইস্‌ল্ এই স্তব্ধতাকে চুরমার করে ভেঙে দিয়ে চলে যাচ্ছে। নিটোল পানাপুকুরে যেন ছুঁড়ে দিচ্ছে ঢিল। কিন্তু চারদিক থেকে আবার সেই পানা যেমন একত্র হয়ে ভরাট হয়ে ওঠে, এও যেন ঠিক তেমনি। স্তব্ধতা আবার নিটোল হয়ে আসছে।

কয়লা-খাদের দেশ এই রানীগঞ্জ। কিন্তু এই এলাকার এই স্তব্ধতায় কোনো খাদ নেই— একে একেবারে নির্ভেজাল বলা চলে। সামনেই ছোট গির্জা, সেও যেন তার চূড়ায় রোদের আলপনা এঁকে এই স্তব্ধতা উপভোগ করছে।

অনুরূপা দেবী তাঁর জীবনের কাহিনী বলছেন। বললেন, "আমার লেখার উৎসাহ বা অনুপ্রেরণা যাই বলা যাক, তার সবই পেয়েছি আমার দিদি সুরূপা দেবীর কাছ থেকে— বাংলা সাহিত্যে যিনি ইন্দিরা দেবী নামে পরিচিত। কি ক'রে দিদির সমান হব, কি ক'রে দিদির মতন লিখতে পারব— এই ছিল আমার চিন্তা এবং এই ছিল আমার উচ্চাশা।"

গত ভাদ্রে একাত্তর বৎসর পূর্ণ হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনো শক্ত আছেন, অনেকক্ষণ ধ'রে তিনি উৎসাহের সঙ্গেই অনেক কথা ব'লে গেলেন। তার সব হয়তো তাঁর জীবনের কথা নয়, সে কথা তাঁর কালের কথা— তাঁর পিতামহ প্রাতঃস্মরণীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের কথা, ভূদেবের সুহৃদ মাইকেল মধুসূদনের কথা। মধুসূদনের মৃত্যুর নয়-দশ বছর পরে অনুরূপার জন্ম; কিন্তু মধুসূদনের অনেক কথা তাঁর জানা— পিতামহ ভূদেবের কাছ থেকে শুনেছেন: ভূদেবকে লেখা মধুসূদনের বিস্তর চিঠিপত্র তিনি চাক্ষুষ দেখেছেন।

১২৮৯ বঙ্গাব্দের ২৪ ভাদ্র, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার শ্যামবাজারে মাতুলালয়ে অনুরূপার জন্ম। বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুরূপা দেবীর মাতামহ।

বললেন, "আমার মায়ের নাম ধরাসুন্দরী দেবী। আমার মায়ের মত রূপ আমার আর চোখে পড়ে নি। পিতামহ তাঁকে পুত্রবধূ-রূপে নির্বাচন করেছিলেন। প্রসেশন দেখার জন্যে আমার মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমার পিতামহ ভূদেব মুখোপাধ্যায় ওই রাস্তা দিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে ফিটনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর চোখ পড়ে সেই বারান্দায়। তিনি নেমে গিয়ে খোঁজ-খবর নেন— অবস্থা অনুকূল জেনে তখনি ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে পাকাদেখা সেরে আসেন।"

তাঁর মা কলকাতার শৌখীন বড়লোকের বাড়ির মেয়ে। কাব্য নাটক এবং নারীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি উৎসাহী ছিলেন। বাড়িতে প্রকাণ্ড পুজোর দালান— শোভাবাজারের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে জগদ্ধাত্রীর মূর্তি গড়া হত। থিয়েটার যাত্রা কবিগান ইত্যাদি চলত উৎসাহের সঙ্গে। ঐ সঙ্গে ছিল আত্মীয়পালন। প্রকাণ্ড দালানটা তাই সারা বছরই সরগরম থাকত। বারান্দার এক অংশ ছেড়ে দেওয়া হত মেয়েস্কুলের জন্যে। মিস্ পিগর্ট ওখানে ক্লাস নিতেন। এই আব-হাওয়ায় তাঁর মা বাংলা-ইংরেজিতে এবং বিভিন্ন শিল্পে অনুরাগী হয়ে ওঠেন।

বললেন, "পিতামহ তাঁকে পুত্রবধূরূপে ঘরে আনলেন। পুত্রবধূর শিক্ষার জন্যে তিনি ব্যবস্থারও ত্রুটি করলেন না। লেখাপড়া শেখার জন্যে এবং পিয়ানো বাজানো শিক্ষার জন্যে মেম রেখে দিলেন। তাঁর নাম মিস কলিন্‌স্— তিনি ছিলেন মাইকেল মধুসূদনের কন্যা শর্মিষ্ঠার ননদ।"

একটু থেমে বললেন, "আমার পিতামহের জীবন-চরিত যখন লেখা হয় তখন শর্মিষ্ঠার লেখা অনেক চিঠি আমি দেখেছি, বাংলায় লেখা চিঠিতে শর্মিষ্ঠার স্বাক্ষর থাকত, লেখা থাকত— তোমার ভাইঝি শর্মিষ্ঠা।"

মধুসূদন ও ভূদেব উভয় উভয়কে ভ্রাতার ন্যায় মনে করতেন। সে কেবল মনে করা নয়, তাঁরা ছিলেন যেন দুটি ভ্রাতাই। এই কারণেই মধুসূদন-দুহিতা ভূদেবকে লিখতেন 'তোমার ভাইঝি'।

বাংলাদেশের সে-আমলটা কেবল সুদিন নয়, বাংলায় সৌভাগ্যের দিন—যে-দিন নিয়ে আজও আমরা গৌরবে বুক স্ফীত করি। সেই সুদিনের স্মৃতিচিহ্ন যেন লেখা দেখতে পেলাম অনুরূপা দেবীর মুখে। তিনি বললেন, "সে-আমলটা ছিল আন্তরিকতার যুগ। তখন দুঃস্থ দরিদ্র আত্মীয় প্রতিপালন করা ছিল একটা ব্রতেরই মত। কিন্তু কারো মধ্যে কোনো ইতর-বিশেষ আমরা দেখি নি। দুঃস্থ ও দরিদ্র বলে তাদের জন্যে কোনো পৃথক্ ব্যবস্থা ছিল না, বাড়ির ছেলেমেয়েদের মতই ছিল তাদের সমান অধিকার, খাওয়া-থাকার সমান ব্যবস্থা। এইরকম অবস্থা আমরা দেখেছি আমাদের বাল্যকালে, আবার সেই চোখ দিয়েই বর্তমানে দেখছি অন্য অবস্থা—বিপরীত ব্যবস্থা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবই বদলায়।"

ছেলেবেলায় অনুরূপা ছিলেন একটু দুষ্টু প্রকৃতির। তাঁদের পড়ার জন্যে ভূদেব প্রত্যেকের একটা ক'রে ডেস্কের ব্যবস্থা করেছিলেন। মাটিতে পিঠ-টান ক'রে এই ডেস্কে ব'সে পড়তে হত। বাড়ির ছেলেমেয়ে ও আত্মীয়স্বজন মিলে বাড়িতে অনেক পড়ুয়া, অতজনের লেখার জন্যে কালি সরবরাহ করা সহজ ছিল না— তার উপর দোয়াত উল্‌টে কালি তো প'ড়ে নষ্ট হবেই। তাই ভুষো কালি তৈরি হত বাড়িতে। নিয়ম ছিল, সপ্তাহে একদিনের বেশি কালি দেওয়া হবে না, আর একদিন চেঁছে দেওয়া হবে সরের কলম। বললেন, "কিন্তু প্রায়ই আমার কালি পড়ে যেত, আর কলম ভোঁতা হয়ে যেত। চুঁচুড়ার বাড়িতে এডুকেশন গেজেট ছাপার জন্যে ছাপাখানা ছিল, আমি সেখানে ম্যানেজার-মশায়ের কাছে গিয়ে তাঁর পাকা চুল তুলে দেবার লোভ দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে কালি নিয়ে আসতাম আর কলম চোখা করে নিতাম।"

আর অনেক নিয়ম-শৃঙ্খলার ব্যবস্থা ছিল বাড়িতে। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে পিতামহকে প্রণাম ক'রে সব কমবয়সী ছেলেমেয়েদের এক সঙ্গে বক্ষবদ্ধ বাহুতে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে স্তবস্তোত্র ও নীতিশ্লোক মুখস্ত বলতে হত, তার পর নির্দিষ্ট কাজ রুটিন-মাফিক সেরে যেতে হত। বিকালে খেলা, তার পর খাওয়া। সন্ধ্যায় আবার মৌখিক অঙ্ক, নামতা; বয়স ও জ্ঞান অনুযায়ী বাংলা ও ইংরেজি কবিতা মুখস্থ করা।

লেখাপড়া তিনি একটু দেরিতে শেখেন। এর কারণ, লেখাপড়া শুরু করার যে বয়স, সেই সময় তিনি কঠিন অসুখে ভোগেন। যখন তিনি রোগ-শয্যায় আটক,তখন তাঁর দিদি তাঁকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত প'ড়ে প'ড়ে শোনাতেন। এতে এসব তাঁর মুখস্ত হয়ে যায়। বললেন, "তাই, নিরক্ষর থাকলেও আমি সেই বয়সে অশিক্ষিত ছিলাম বলা যায় না। কারণ, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী আমি ভালোভাবেই জেনে নিতে পেরেছিলাম। তখন আমার বয়স সাত।"

এর পরই তিনি শিশুশিক্ষা তৃতীয় ভাগ পড়তে শেখেন। বাড়ির নিয়ম অনুসারে রোজ পিতামহের অবসর সময়ে তাঁর কাছে ব'সে রামায়ণ-মহাভারতের এক-একটি পালা শুনতে হত।

বাড়ি থেকে এডুকেশন গেজেট বের হয়। তাই বাড়িতে বই আর মাসিক পত্রিকার অভাব ছিল না। প্রতি সপ্তাহে কাগজ বের হত, আর এরই কল্যাণে যত পত্র-পত্রিকা আর যত নতুন বই আসত বাড়িতে। মস্ত একটা লাইব্রেরী গ'ড়ে ওঠে এইভাবে। এইসব বই হাতে পেয়ে বই-পড়ার অভ্যাস দাঁড়িয়ে যায়, সেটা কেবল অভ্যাস নয়, একটা নেশা হয়ে দাঁড়াল। সুবিধে পেলেই তাঁর মায়ের নিজস্ব বইয়ের আলমারি খুলে রমেশচন্দ্র দত্তের জীবনসন্ধ্যা ও জীবনপ্রভাত নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়তেন, আর সেই সময়েই পড়েন বঙ্কিমের সীতারাম ও দেবী চৌধুরানী। তখন অনুরূপার বয়স মাত্র আট। বটতলার ছাপা বইয়ের পাত্র-পাত্রী নিয়ে পুতুল-খেলাও আরম্ভ হয় তখন। মাকে অনুরোধ ক'রে ক'রে পুতুলের জন্যে পুঁতির গয়না, কৌচ-কেদারা তৈরি করিয়ে নিতেন। বই-পড়া ও পুতুল-খেলা নিয়ে এই সময়টা তাঁরা মশগুল হয়ে ছিলেন। বললেন, "আমার হাতের লেখা ভালো হল না। এদিকে কোনো দিন মনই দিতে পারি নি। মনে হত, হাতের লেখা নিয়ে কত আর সময় দেওয়া যায়, ছাড়া পেলেই তাই পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়তাম।"

পিতামহ ভূদেবের কাছে তাঁর দিদিরা বড় বড় সংস্কৃত কাব্য প'ড়ে কবিতা লেখা অভ্যাস করে। দিদি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে সেখান থেকে রঙীন কাগজে পদ্যে চিঠি লেখে। সেই চিঠি প'ড়ে অনুরূপার মাথায় বজ্রপাত হল। আগে

থেকেই দিদিকে অনুকরণ করার আগ্রহ তাঁর ছিল, কিন্তু সাধ্যে কুলাত না। এবার চিঠি পেয়ে তাই বিব্রত হয়ে পড়লেন অনুরূপা। কিন্তু পিতামহ এই পত্র পড়ে অনুরূপাকে বললেন, "এর উত্তর তোমাকে পদ্যেই দিতে হবে। যাও, লিখে আনো।"

বললেন, "চাপে প'ড়ে অনেক কষ্টে লিখলাম—

পাইয়া তোমার পত্র পুলকিত হল গাত্র
আস্তেব্যস্তে খুলিলাম পড়িবার তরে।
পুঁথিগন্ধ পাইলাম কারুকার্য হেরিলাম
পুলক জাগিল অন্তরে।

এটা আমার মূল রচনা কিনা মনে পড়ছে না। সম্ভবতঃ পিতামহের হাতে সংশোধিত হয়ে এই আকার ধরেছিল। যাই হোক, আমার জীবনের সর্বপ্রথম রচনা এইটেই।"

তাঁর প্রথম লেখা গল্প কোন্ তিথি-তারিখে জন্ম নিয়েছিল তা তাঁর মনে পড়ে না। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর ও বাল্মীকি রামায়ণের আদি পর্বের পদ্যানুবাদ করেন দশ বছর বয়সের মধ্যেই। মহরম, দশহরা, দুর্গাপূজা নিয়ে ফরমায়েসী প্রবন্ধও লিখেছেন এবং এই সঙ্গে দু-চারটে গল্প-লেখার চেষ্টাও চলে। এইসব এলোমেলো প্রচেষ্টার মধ্যে থেকে একটি সম্পূর্ণ গল্প তিনি লিখে ফেলেন, তার নাম দেন 'সমাধি', কিন্তু সে-লেখা দিনের আলো আর দেখতে পায় নি, কখন কি ক'রে সেটা সমাধিলাভ করে তা আজ তাঁর মনে নেই।

বললেন, "আজ সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে পিতামহের কথা। তাঁর সেই অনন্যসাধারণ দিব্যদীপ্ত মূর্তি, ধবলগিরি বা রজতগিরির মত শুভ্র উন্নত দেহে বক্ষবিলম্বী ধবল শ্মশ্রু দেখলে লোক-পিতামহের প্রতিমূর্তিই মনে হত। তাঁর কাছে আমরা কত স্নেহ যে লাভ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। অত বড় কর্মী হয়েও সর্বদিক্‌দর্শী পিতামহদেব আমাদের শিক্ষার স্বাস্থ্যের সমস্ত খুঁটিনাটিটুকু পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করতেন। বাড়িতে বিদ্বৎসমাগমের শেষ ছিল না। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র ঘোষ, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, উচ্চ ইংরেজ কর্মচারী, ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিভিন্ন প্রদেশ থেকে

আগত মহাদেব রাণাডে প্রভৃতি বর্মী শিখ কত বিদ্বান ও জ্ঞানীগুণীরা এসে আমাদের চুঁচুড়ার গঙ্গাধারের বাড়িতে বাস করতেন। আমাদের বাড়ির খান-তিনেক বাড়ি পরেই একখানা বাড়িতে বঙ্কিমবাবু কয়েক বছর চাকরি উপলক্ষে বাস করেছিলেন।"

একাত্তর বছর বয়স হয়েছে, তবু স্মৃতি এখনো তীক্ষ্ণ, এখনো তাঁর স্বচ্ছ মনে আছে সব কথা। একে একে তিনি বলে চলেছেন। মাথায় সাদাপাকা চুলের ফাঁকে সিঁথির উপর সিঁদুরের স্পষ্ট রেখা। ঠিক ঐ রকম স্পষ্ট হয়েই তাঁর মনের সীমন্তের উপর যেন স্মৃতির সিন্দুর-রেখা অঙ্কিত হয়ে আছে।

বালী-উত্তরপাড়ার বাঁড়ুজ্জে-বাড়ির নামডাক ছিল। সেই বাড়ির তীক্ষ্ণধী সুদর্শন এক পুরুষের সঙ্গে অনুরূপার বিবাহ হয়। তাঁর নাম শ্রীশিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাল্যকালে অনুরূপা শিক্ষালাভ করেন পিতামহ ভূদেব ও পিতা মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের কাছে। বিবাহের পর তিনি স্বামী শিখরনাথের কাছে ইংরেজি সাহিত্য পাঠ আরম্ভ করলেন। কর্মজীবনে শিখরনাথ মজঃফরপুরে থাকতেন এবং এই মজঃফরপুর থেকেই অনুরূপার সাহিত্যিক খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর পোষ্যপুত্র উপন্যাস থেকে আরম্ভ ক'রে নামকরা বইগুলির প্রায় সবগুলিই মজঃফরপুরে লেখা।

অনুরূপা দেবীর খুব শৈশবকালের কথা। তাঁদের চুঁচুড়ার বাড়ির ঠিক পাশের বাড়িতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়েক বছর বাস করেছিলেন। দুই পরিবারে সেই থেকে খুব সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড় ছেলে দ্বিপেন্দ্রনাথের প্রথমা পত্নী সুশীলা দেবীর সঙ্গে এই সময় অনুরূপা দেবীর মাতা ধরাসুন্দরী দেবীর বন্ধুত্ব হয়। তাঁদের মধ্যে কাব্য-নাটক চর্চা হত।

পারিবারিক এই সৌহার্দ্য উত্তরজীবনেও অটুট থাকে। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে অনুরূপার অন্তরঙ্গতা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পোষ্যপুত্র উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে বের হয় স্বর্ণকুমারী-সম্পাদিত ভারতী পত্রিকায়। এ উপন্যাস তিনি লেখেন তাঁর ছোট পিসিমার অনুরোধে। এর আগে কুন্তলীন প্রতি-

যোগিতায় দু-তিনটে গল্প দিয়ে অনুরূপা পুরস্কৃত হন, কিন্তু পিসিমার এতে মন ওঠে না। যে লেখা পড়তে আরম্ভ করলেই শেষ হয়ে যায়, তা তাঁর পছন্দ নয়; এমন-কিছু লেখার জন্যে তিনি পিড়াপিড়ি করলেন যা পড়ে শেষ করতে সময় লাগে। এই তাগিদে অনুরূপা লিখলেন এই উপন্যাস। বললেন, "পোষ্যপুত্র ভারতীতে শেষ হতে হতেই স্বর্ণকুমারী-পিসিমা আমার আর-একটা উপন্যাস চাইলেন। তার পর বাগদত্তা থেকে সব উপন্যাসই তাঁর নির্দেশে লেখা হয়েছে— আগে প্লট ঠিক ক'রে ধীরে ধীরে মাসে মাসে লেখা। তাঁর তাগিদ না থাকলে আমার দ্বিতীয় উপন্যাস লেখা হয়ে উঠত কিনা বলতে পারিনে। তাঁরই উৎসাহে আমি লেখার দিকে নতুন প্রেরণা পাই।"

ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর আকর্ষণ। মজঃফরপুরে তিনি প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার কাজে হাত দেন, রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরী দেবীর সঙ্গে 'চ্যাপম্যান গার্লস স্কুল' নামে মেয়েদের একটি স্কুল স্থাপনা ও পরিচালনা করেন। তারপর থেকে তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন, এখনো আছেন। বারাণসীর হিন্দু-মহিলাশ্রম, আর্য-বিদ্যালয়, মাতৃমঠ প্রভৃতির তিনি অধ্যক্ষা। কলকাতার বাণীপীঠ নারী-কল্যাণ-আশ্রম, হিন্দু-মহিলাশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ।

১৩২৬ বঙ্গাব্দ, খ্রীষ্টীয় ১৯১৯ সালে শ্রীভারত মহামণ্ডল তাঁকে 'ধর্মচন্দ্রিকা' উপাধি, একটি মানপত্র ও একটি রৌপ্যপদক দেন; ১৯২০ সাল থেকে কয়েক বছর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এ. পরীক্ষার বঙ্গসাহিত্যের প্রশ্নপত্র-রচয়িত্রী ও পরীক্ষকমণ্ডলীর সদস্যা ছিলেন। পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন তাঁকে স্বতন্ত্রভাবে 'সরস্বতী' উপাধি দেন; ১৯২৩ সালে ইনি 'ভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধিতে ভূষিতা হন। ১৯৩৫ ও ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একে জগত্তারিণী ও ভুবনমোহিনী স্বর্ণপদক দেন। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'লীলা লেকচারার' নিযুক্ত হন, বক্তৃতার বিষয় ছিল 'সমাজে ও সাহিত্যে নারী'— সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ এবং মিশর ব্যাবিলন অ্যাসিরিয়া চীন, মধ্যযুগের ও আধুনিক ইউরোপীয় সমাজ ও সাহিত্য—সমগ্র জগতের ইতিহাস থেকে নারীর স্থান সম্বন্ধে তিনি এই বক্তৃতায় আলোচনা

করেন। ১৯৪৪-৪৬ সালে প্রস্তাবিত হিন্দু কোড বা রাও কোড সম্বন্ধে আন্দোলন করেন, এবং প্রায় পাঁচ শত সভায় সভানেতৃত্ব করেন। ১৯৪৬ সালে যশোহর-সাহিত্য-সঙ্ঘ তাঁকে 'সাহিত্যভারতী' উপাধি দেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৮— এই কয় বছর তিনি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের মূল ও শাখা সভাপতির পদে বৃত হন।

সাহিত্যসাধনার সঙ্গেসঙ্গে তিনি একজন সমাজসেবীর কর্তব্যও পালন করে চলেছেন। বাহিরের সঙ্গে তাঁর যোগ তাই ঘনিষ্ঠ, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে পরিচয়ও নিবিড়। এই জন্যেই সম্ভবতঃ তাঁর দৃষ্টিতে সংকীর্ণতা নাই, উদারভাবে তিনি সবই গ্রহণ করতে জানেন।

তাঁর উপন্যাসের মধ্যে মন্ত্রশক্তি, পোষ্যপুত্র, মা, মহানিশা, পথের সাথী কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গালয়ে নাটকাকারে অভিনীত হয়েছে। এই কয়টি বই এবং সেই সঙ্গে উত্তরায়ণ চলচ্চিত্রে গৃহীত ও প্রদর্শিতও হয়েছে।

আমাদের কথা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, ওদিকে ফিরতি ট্রেনের সময়ও ঘনিয়ে এসেছে। এমন সময় ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন শিখরনাথ। স্মিত হেসে কয়েকটি কথা বললেন মাত্র। তিনিও বার্ধক্যে বিব্রত, কিন্তু পঙ্গু-অথর্ব নন।

১৩৩৪ সালের ১৫ জানুয়ারি তারিখে বিহার-ভূমিকম্পে তাঁদের মজঃফর-পুরস্থ বাসগৃহ ভূমিসাৎ হয়। এই দুর্ঘটনায় অনুরূপা আহত হন এবং তাঁর দশ বৎসরের পৌত্রী অরুণা মারা যায়। শোকাকুলা অনুরূপা স্বামীপুত্র-সহ কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন।

তারপর বাস করছিলেন পৌত্রের কর্মস্থলে— রানীগঞ্জে।

৬ বৈশাখ ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, ১৯ এপ্রিল ১৯৫৮ শনিবার তিনি করোনারি থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় ছোট ভগ্নির গৃহে লোকান্তরিত হন। তাঁর মৃত্যুর বছর দুই আগে ১৯৫৬ সালে তাঁর স্বামীর মৃত্যু ঘটে।

সেদিন বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম! আর একবার তাকালাম সামনের ঐ বাগানের দিকে, দেওয়ালির উৎসব আজ— তাই যেন অগণ্য প্রদীপের শিখার মত জ্বলে উঠেছে ওই ফুলেরা।

কলকাতার দিকে ছুটে চলেছে ট্রেন, বিকেল ডিঙিয়ে সন্ধ্যা এসে গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। গাঢ় অন্ধকার ভেদ ক'রে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছি : সেই অন্ধকারের ওপার থেকে মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি, লোকালয়ের সংকেত— ঘনগাছের ওপারে সুসজ্জিত প্রদীপের মিছিল। গঙ্গাপার হয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল দক্ষিণেশ্বর-স্টেশনে। অনেক উঁচুতে এই স্টেশন। ট্রেনে ব'সে তাকালাম দুধারে, মহানগরী যেন আলোর শতনরী হার গলায় দিয়ে সেজেছে আজ। আবার মনে হয়— এই মহানগরী আজ যেন হয়েছে এক মহা-উদ্যান। সারা বাগান ভরে ফুটে উঠেছে যেন ওই আলোর গাঁদাফুল।

রচিত গ্রন্থাবলী

পোষ্যপুত্র। ১৩১৯
মন্ত্রশক্তি। ১৩২২
মহানিশা। ১৩২৩
মা। ১৩২৭
বাগদত্তা
জ্যোতিহারা
উত্তরায়ণ
পথহারা
চক্র
বিবর্তন
সর্বাণী
হিমাদ্রি
গরীবের মেয়ে
হারানো খাতা
সোনার খনি
ত্রিবেণী
জোয়ার ভাটা

রামগড়

পথের সাথী

প্রাণের পরশ

রাঙা শাখা

মধুমল্লী

চিত্রদীপ

উল্কা

বিদ্যারণ্য

কুমারিল ভট্ট

নাট্য-চতুষ্টয়

বর্ষচক্র

সাহিত্য ও সমাজ

সাহিত্যে নারী

উত্তরা খণ্ডেব পত্র

বিচারপতি

অসমাপ্ত রচনা

জীবনের স্মৃতিলেখা

শ্রীনন্দলাল বসু

আমাদের কলরব-কোলাহলের সংসারে এক-এক সময় এমন একজন মানুষ আবির্ভূত হন, যিনি নিজেকে এইসব কোলাহল থেকে সরিয়ে পরম-নির্বিকার ভাবে নীরবে দিন যাপন করতে পারেন। তপোবন তপস্যার উপযুক্তই উপবন; কিন্তু পৃথিবীর এই কোলাহলের মধ্যে ব'সেও যিনি তপ করতে পারেন তাঁকে কেবল তপস্বী বললেই সব বলা হয় না। আমাদের এই প্রলোভনে-ভরা পৃথিবীতে নির্লোভ ও উদাসীন মানুষের অভাব আছে; সে অভাব পূরণ করার জন্যে মাঝে-মাঝে এক-এক জন আশ্চর্য মানুষের আবির্ভাব ঘটে— যিনি সব লোভকে উপেক্ষা ক'রে নিজের মনে নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে নিজের কাজ ক'রে যান; সে কাজের দিকে পাঁচ জনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হোক বা না হোক,সেদিকে ভ্রূক্ষেপ তাঁর নেই। যখন পাঁচ জনে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রচারের জন্যে প্রতিযোগে রত, তখন এই নির্বিকার পুরুষটি আপন মনে বসে বসে নিজের মনের মত কাজ করে যান, নিজের মনের খুশিটাকেই তিনি নিজের কৃতিত্বের নিরিখ ব'লে মনে করেন। এই মানুষ নীরব স্তব্ধ ও মৌন, নিজেকে নিয়েই নিজে বিভোর। বাইরের প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মনের প্রকৃতির আশ্চর্য রকম মিতালি,তাই জনতার থেকে নিজেকে তফাতে রেখে তিনি প্রকৃতির তপস্যা করেন। এমনি এক অদ্ভুত মানুষ হচ্ছেন শিল্পী নন্দলাল— শ্রীনন্দলাল বসু।

রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র শান্তিনিকেতন এই শিল্পীর মনের উপযোগী স্থান, এটি যেন তাঁর জীবনের শান্তির নিকেতন। ১৯২১ সাল থেকে নন্দলালের সঙ্গে শান্তিনিকেতনের নিবিড় আত্মীয়তা। এই স্থানটিকে তিনি যেন পেয়েছেন তাঁর আত্মার আত্মীয় রূপে। এখানকার নিভৃত পরিবেশ, উদার নীলাকাশ, দিগন্তবিস্তৃত মাঠ, শালতালতরুশ্রেণী, এবং গ্রাম-ছাড়া রাঙা-মাটির পথ শিল্পীর মনকে যেন একেবারে ভুলিয়ে দিয়েছে। প্রকৃতির দুলাল নন্দলাল এই মনোরম পরিবেশে ব'সে মনের খুশিতে চর্চা করে চলেছেন শিল্পের। এই নিভৃত নিকেতনের সীমানা অতিক্রম করে তাঁর

খ্যাতি আজ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। কিন্তু তবুও তিনি নীরব, তিনি মৌন। নিজের খ্যাতি সম্বন্ধেও যেন উদাসীন। আপন মনে তিনি ধ্যান করে চলেছেন। কিসের এই ধ্যান? শিল্পের প্রতি তাঁর সমস্ত হৃদয় যেন শ্রদ্ধায় ও নিষ্ঠায় প্রণত হয়ে আছে, দু-চোখে সেই বিনীত নমস্কারের ছায়াই যেন ধ্যানের রূপে দেখা দেয়।

কথা বলেন খুব কম, স্বভাব অত্যন্ত লাজুক, অচেনা কারো সঙ্গে দেখা হলে সংকোচে জড়িত হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবনের কথা তাঁর কাছ থেকে জেনে নেওয়া এই জন্যে সহজ নয়।

কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতনের আচার্য হিসেবে জহরলাল নেহেরু শান্তিনিকেতন-পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি কলাভবনে গেলেন, কিন্তু কলাভবনের যিনি অধ্যক্ষ সেই নন্দলালই তখন সেখানে নেই। কিছুক্ষণ পরে নন্দলালকে নিয়ে আসা হল। জহরলাল সানন্দে নন্দলালকে দু-হাত দিয়ে ধরে বলে উঠলেন, 'আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন। কেমন আছেন, শরীর ভালো তো?' এই আন্তরিক প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে নন্দলাল যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।—এই ঘটনা থেকেই নন্দলালের লাজুক স্বভাবের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়।

অভিমানহীন আড়ম্বরহীন একটি অতি সহজ জীবন যাপন করে চলেছেন নন্দলাল। আমাদের কলকোলাহলে-ভরা পৃথিবীর সামান্যতম ছায়া এসে পড়েনি তাঁর জীবনে কিংবা কর্মে। তিনি যেন নিসর্গেরই নন্দন, এবং নিসর্গই যেন তাঁর কাছে ভূস্বর্গ। এই জন্যেই তাঁর ধ্যানী মূর্তি দেখে মনে হয় তিনি বুঝি স্বর্গসুখে বিভোর হয়ে আছেন। বাইরের পৃথিবীর প্রতি তাঁর উদাসীনতার কারণ সম্ভবত এই।

বলা যায়, তুলির শিক্ষা তাঁর আছে, বুলির শিক্ষা নেই। মুখে তাই কথা নেই, কিন্তু তাঁর তুলি তাঁর হৃদয়ের অজস্র কথা অনবরত বলে চলেছে। ভারতের চিত্রকলার উৎকর্ষসাধনে তাঁর দানের কথা ভারত তাই কখনো বিস্মৃত হবে না। তিনি কেবল ভারতের শিল্পী নন, তার চেয়েও বড় কথা, তিনি একজন ভারতীয় শিল্পী। ভারতের আত্মার বাণী তাঁর নিজের হৃদয়ের বাণী

হয়ে তাঁর তুলির রেখায় রেখায় মুখর হয়ে উঠেছে। এই জন্যে সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁকে সসম্ভ্রম নমস্কার করে। সারা ভারতের প্রতিনিধিরূপে জহরলাল নেহরু এই জন্যই নন্দলালকে সেদিন অভিবাদন জানিয়ে গেলেন।

স্কুল-কলেজে পড়ার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করলে নন্দলাল আদৌ বিদ্বান নন, যেমন রবীন্দ্রনাথও ছিলেন না। তিনি এফ. এ. পর্যন্ত পড়েছিলেন। তার পর কলেজের পাঠ ত্যাগ ক'রে তিনি শিল্পসাধনার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেন।

নন্দলালের জন্ম মুঙ্গের-খড়্গপুরে। ১২৯০ বঙ্গাব্দের ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর। এখানে তাঁর পিতা পূর্ণচন্দ্র বসু খাল-খননের কাজের পরিদর্শক ছিলেন। এই সময়ে শ্রীরাজশেখর বসুর পিতা চন্দ্রশেখর বসু ছিলেন দ্বারভাঙ্গা-স্টেটের নায়েব। কিছুদিন পরে চন্দ্রশেখর বসুর সুপারিশে নন্দলালের পিতা দ্বারভাঙ্গা রাজস্টেটের স্থপতি নিযুক্ত হন। নন্দলালের জননী ক্ষেত্রমণিও ছিলেন সুরুচিসম্পন্না— নকৃশী-কাঁথা সেলাইয়ে তিনি ছিলেন নিপুণা; খয়েরের পুতুল, মিষ্টান্নের ছাঁচ ইত্যাদিও তিনি তৈরি করতেন।

বালক-নন্দলালের জীবনে পিতার ও মাতার প্রভাব পড়ে। তার উপর সে সময়ে তিনি একটি উন্মুক্ত উদার পরিবেশ লাভ করেন— দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে ও সীমাহীন সুনীল আকাশের চন্দ্রাতপের নীচে তাঁর জীবন বিকশিত হয়ে উঠবার জন্যে ব্যাকুল হয়। তিনি নিবিষ্ট মনে বসে বসে কুমোরদের মূর্তি-রচনার কাজ দেখতেন; দেখতেন, এক-এক পিণ্ড মাটি কেবল আঙুলের চাপের কারসাজিতে কি ভাবে এক-একটা আকার লাভ করছে। নন্দলালও কাদা নিয়ে বসলেন। কুমোরদের দেখাদেখি মূর্তিগড়ার চেষ্টা করতে লাগলেন। ক্রমশ তাঁর হাতের মাটির ডেলা সত্যিই একটা মূর্তিতে রূপায়িত হয়ে উঠল। বালক-নন্দলাল সম্ভবত নিজের হাতের কাজ দেখে আনন্দে আত্মহারা হলেন। উত্তরজীবনে সামান্য এই মাটির কাজ যে খাঁটি শিল্পের পথ ধ'রে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, এ কথা হয়তো তখন তিনি বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মনকে তিনি চিনেছিলেন; চিনেছিলেন যে, এ মন ধরাবাঁধা রাস্তা ধ'রে এগিয়ে যাবার মন নয়; এ মন একটা বেআড়া মন; সোজা আর সহজ পথ ধ'রে যাবার চেয়ে বাধা আর সাধনার পথ ধ'রে চলাতেই এর টান।

দ্বারভাঙাতেই তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়। সেখান থেকে তিনি যখন কলকাতায় আসেন, তখন তাঁর বয়স ষোলো। এখানে এসে তিনি ভর্তি হলেন সেন্‌ট্রাল কলেজিয়েট স্কুলে। স্কুলের ছাত্র তিনি, কিন্তু পুঁথির পাঠ্যবিষয়ে তাঁর মন নেই, তাঁর মন তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে অন্যত্র। সংস্কৃত পাঠ্য বইয়ের ব্যাকরণ জানার চেয়ে সেই বইয়ের গল্পের পাশে চিত্র-রচনাতেই তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। এখান থেকে তিনি এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে পাস করলেন। তখন তাঁর বয়স কুড়ি। এন্‌ট্রান্স পাস ক'রে তিনি মেট্রপলিটনে (বিদ্যাসাগর-কলেজে) ভর্তি হলেন। কিন্তু এফ. এ. পাস করা আর হয়ে উঠল না। কী ক'রে হবে। পাঠ্য কেতাবে তাঁর মন কিছুতেই বসত না। তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার পাশে রঙিন চিত্রভাষ্য রচনা করতেন বসে বসে। চিত্র-সংবলিত তাঁর এই বইটি পরবর্তী কালে বিলেতে রোদেনস্টাইনের কাছে নাকি পাঠানো হয়। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কাব্যের উপযুক্ত চিত্রই সম্ভবত হয়েছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে এর বেশি কিছু জানা যায় না।

এফ. এ. তিনি দু'বার ফেল করেন। অভিভাবকরা স্থির করলেন, তাঁকে অন্য কোনো বিষয়ে পড়ানোই ভালো। চিরাচরিত পাঠে ওঁরে হয়তো মন বসছে না। তাই তাঁকে ডাক্তারি পড়ানোর জন্যে চেষ্টা করা হল, কিন্তু কলেজে ভর্তি করানো সম্ভব হল না। অগত্যা, অন্য দিক দেখতে হল। নন্দলালকে ভর্তি করা হল প্রেসিডেন্সি কলেজের বাণিজ্য-বিভাগে।

বাণিজ্যে নাকি লক্ষ্মী বাস করেন। লক্ষ্মীর আরাধনা করার অভিপ্রায় ছিল না নন্দলালের। তাই বাণিজ্যে তাঁর মন ধরল না। যাঁর চোখের ইশারা তিনি অনেক আগেই পেয়ে গেছেন, তিনি অন্য আর-এক দেবী। মনে মনে হয়তো এতদিন নন্দলাল এঁরই উদ্দেশ্যে বলেছেন—

যদি এতটুকু পাই ওই আঁখি-ইশারা
হব নিমেষেই নির্ঘাৎ লক্ষ্মীছাড়া।

অর্থকরী বিদ্যার নিকেতন ত্যাগ করে তিনি অনর্থকরী বিদ্যার প্রতি ধাওয়া করলেন।

বণিজ্য-কলেজের পাঠের জন্য বই-কেনার টাকা অন্যভাবে ব্যয় হতে লাগল। পুরনো বইয়ের দোকানে ঘুরে ঘুরে তিনি নানা শিল্পীর ছবি সম্বলিত সাময়িক পত্র কিনতে লাগলেন সেই টাকা দিয়ে। র‍্যাফায়েলের ছবি ও রবি বর্মার ছবি অনেক সংগ্রহ করলেন। তিনি ঠিক করলেন, বাণিজ্য-ক্লাস ছেড়ে দিয়ে আর্টস্কুলে গিয়ে ভর্তি হবেন।

নন্দলালের পিসতুতো ভাই অতুল মিত্র তখন আর্টস্কুলের ছাত্র। নন্দলাল তাই তাঁর এই ভ্রাতার কাছ থেকে অঙ্কনের দু-একটা পদ্ধতি শিখতে লাগলেন বাড়িতে। অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন, অবনীন্দ্রনাথের বৈঠকী স্বভাবের কথা এবং অমায়িক ব্যবহারের গল্পও তিনি শুনেছেন। অবনীন্দ্রনাথের উপর অগাধ শ্রদ্ধা তাঁর মনের মধ্যে স্তূপ হয়ে জমে উঠেছে; এমন সময়ে একদিন তিনি সত্যেন বটব্যাল নামে আর্টস্কুলের এক ছাত্রের সঙ্গে গিয়ে হাজির হলেন অবনীন্দ্রনাথের সম্মুখে।

'পড়াশুনায় কিছু হল না বুঝি? তাই এসেছ ছবি আঁকা শিখতে?' অবনীন্দ্রনাথের এই হল প্রথম সম্ভাষণ।

এই তিরস্কার কৃত্রিম, নন্দলাল তা বুঝতে পারলেন। তাই স্থির হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। আর্টস্কুলের ভাইস-প্রিন্সিপাল অবনীন্দ্রনাথ। তিনি নন্দলালকে নানারকম প্রশ্ন করতে লাগলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, লেখা-পড়া কতদূর করা হয়েছে। এনট্রান্স পাস শুনে সার্টিফিকেট দেখতে চাইলেন।

সার্টিফিকেট নন্দলালের কাছে ছিল না। অনেক চেষ্টায় আর তদ্বিরে তা উদ্ধার করে এবং সেই সঙ্গে নিজের আঁকা এক বাণ্ডিল ছবি নিয়ে নন্দলাল চললেন আর্টস্কুলে। নিজের আঁকা ছবির মধ্যে কয়েকটা তাঁর মৌলিক আঁকা ছবি, কয়েকটা বিদেশী শিল্পীদের আঁকা ছবির নকল। আর্টস্কুলে গিয়ে তাঁকে মুখোমুখি দাঁড়াতে হল প্রিন্সিপাল হ্যাভেলের। হ্যাভেল ছবিগুলি দেখতে চাইলেন। নকল-করা ছবিগুলি পছন্দ হল না হ্যাভেলের, তিনি ঐ গাদা থেকে বেছে বার করলেন নন্দলালের মৌলিক ছবির একটা— মহাশ্বেতা। এই অঙ্কন দেখে খুশি হলেন প্রিন্সিপাল। তবুও রেহাই নেই। তাঁকে পরীক্ষা

করা হল। মন থেকে আঁকতে বলা হল একটা ছবি। নন্দলাল আঁকলেন—সিদ্ধিদাতা গণেশ।

ছবিটা অবনীন্দ্রনাথকে দেখতে দেওয়া হল। অবনীন্দ্রনাথ জানালেন হাত পাকাই আছে। এর ফলে সিদ্ধিলাভ করলেন নন্দলাল। এটা হল তাঁর সিদ্ধিলাভের প্রথম সোপান। তিনি যেন তাঁর যশের মন্দিরের একটি ধাপ উঠে এলেন সেইদিন। নন্দলাল ভর্তি হলেন আর্টস্কুলে।

এনট্রান্স পাস করার পরের বছরই নন্দলালের বিবাহ হয়। জামাতার এইরূপ সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখে শ্বশুরকুল বিচলিত ও চিন্তিত হয়ে উঠলেন। যে বিদ্যা লাভ করলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, অর্থাৎ জীবনে অর্থ উপার্জনের একটা রাস্তা পাবার সম্ভাবনা, সেই পথ পরিত্যাগ করে নন্দলাল কিনা একটা অর্বাচীন পথের যাত্রী হলেন! কিন্তু তাঁদের দুশ্চিন্তায় সান্ত্বনা দেবার ভাষা নন্দলালের জানা ছিল না। তিনি তখন তাঁর অশান্ত জীবনকে প্রবোধ দেবার পথ পেয়ে গেছেন— এইটেই তাঁর কাছে তখন বড় কথা। তিনি তাঁর জীবনের সাধ মেটাবার জন্য নিজেকে নিয়ে তখন ব্যস্ত।

নন্দলাল কিছুদিন ডিজাইনের ক্লাসে শিক্ষালাভ ক'রে সরাসরি এসে গেলেন অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসে। এ ক্লাসের আবহাওয়াই ছিল আলাদা। শিক্ষক আর ছাত্রের মধ্যে গুরুশিষ্য সম্পর্ক ছিল না, ছিল বন্ধুর সম্পর্ক। গল্পের আনন্দের ও বৈঠকের মধ্যে দিয়ে নন্দলালের শিল্প-শিক্ষা চলতে লাগল। নন্দলাল ক্রমশ কয়েকটি চিত্র আঁকলেন— শরাহত মরাল-ক্রোড়ে শোকার্ত সিদ্ধার্থ, সতী, শিবসতী, জগাই-মাধাই, কর্ণ, নটরাজের তাণ্ডব, ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা প্রভৃতি।

ভগিনী নিবেদিতা এই সময় একদিন আর্টস্কুলে এসে তরুণ শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হন এবং তাঁর শিল্পের সঙ্গেও। নন্দলালের অঙ্কিত চিত্র দেখে নিবেদিতা অভিভূত হন, এবং তাঁর চোখে চিত্রের মধ্যে যা ত্রুটি বলে তাঁর বোধ হয়েছিল অকপটে তা উল্লেখ করেন।

নন্দলালের ছাত্রাবস্থায় আঁকা উপরোক্ত ছবি উত্তরকালে বিশেষভাবে খ্যাত হয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তাঁর তুলি প্রথম অবস্থা থেকেই

তাঁর বশে ছিল কতখানি। নন্দলালের মন যে সম্পূর্ণ ভারতীয় মন, এতে আর সন্দেহ কি। তাঁর চিত্রের বিষয়-নির্বাচন থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

নন্দলাল আর্টস্কুলে পাঁচ বছর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি এই সময় স্কুল থেকে বৃত্তিও লাভ করেন।

নন্দলালের আর্টস্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত হবার আগেই অবনীন্দ্রনাথ আর্টস্কুল ছেড়ে যান। পার্সি ব্রাউন তখন আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল। তিনি নন্দলালকে আর্টস্কুলেই শিক্ষকতার কাজ নিতে অনুরোধ করেন। ওদিকে অবনীন্দ্রনাথ অনুরোধ পাঠালেন জোড়াসাঁকোর বাড়িতে থেকে চিত্রাঙ্কন করার জন্যে। অবনীন্দ্রনাথের আহ্বান এড়ানো অসম্ভব। ছাত্র এসে উপস্থিত হলেন গুরুর পার্শ্বে। বছর তিন নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছ থেকে বৃত্তি লাভ করে এখানে ছবি-আঁকায় রত থাকেন। এই সময় নন্দলাল ভগিনী নিবেদিতার *Indian Myths of Hindoos and Buddhists* বইয়ের চিত্র অঙ্কন করেন।

যে ভারতীয় সাহিত্যের ও পুরাণকাহিনীর দ্বারা তাঁর মন আচ্ছন্ন, এবং যার প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর চিত্রে, এবার নন্দলাল বহির্গত হলেন সেই ভারত-সন্দর্শনে, ভারতভ্রমণে। ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলীর প্রদর্শনীতে তাঁর অঙ্কিত শিবসতী চিত্রটি প্রদর্শিত হবার পর তিনি পুরস্কারস্বরূপ পেলেন পাঁচ শ টাকা। সেই টাকা তিনি ব্যয় করলেন সৎ কাজে। পাটনা গয়া কাশী আগ্রা দিল্লী মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি স্থান ঘুরে তিনি ভারতীয় শিল্পকীর্তির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ক'রে মনের ঐশ্বর্য বাড়িয়ে এলেন। তার পর পুনরায় গেলেন দক্ষিণ-ভারতে, তার পরে কোনারকে। সারা ভারত ঘুরে তিনি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতি ও শিল্পকীর্তি দেখে মনের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করে তুললেন।

এর কিছুদিন পরের কথা। সম্ভবত সেটা ১৯১০ সাল। বিলেত থেকে বৃদ্ধা লেডি হেরিংহ্যাম এলেন ভারতে। অজন্তা-গুহাচিত্র নকল করার জন্যে। ভগিনী নিবেদিতার পরামর্শে তরুণ শিল্পী তাঁর সঙ্গে গেলেন এই কাজের সহকারী রূপে। এইখানে এসেই নন্দলালের ভারতীয় মন যেন একটা দৃঢ় ভিত্তি লাভ করল, এবং তাঁর মন ভারতীয় ধারার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ে পরিচিত হয়ে পরিপুষ্ট হয়ে উঠল।

এর পর নন্দলাল করেন আর-একটি কাজ। ১৯১৯ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্রের আহ্বানে তিনি বসু-বিজ্ঞান-মন্দির অলংকৃত করেন মহাভারতের কাহিনী চিত্রিত করে।

১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে (বঙ্গাব্দ ১৩২১ বৈশাখ) নন্দলাল সর্বপ্রথম যান শান্তিনিকেতনে। সেখানকার নিভৃত পরিবেশটি দেখে তাঁর মন অভিভূত হয়। কিন্তু তিনি তখন সেখানে থাকার জন্যে যান নি। পরে একদিন জোড়াসাঁকোয় বসে নন্দলাল যখন অঙ্কনে রত ছিলেন, তখন পিছন থেকে এসে রবীন্দ্রনাথ সস্নেহে তাঁকে শান্তিনিকেতনের সাধন-কেন্দ্রে যাবার জন্যে বললেন। কবির আহ্বানে নন্দলাল রাজি হলেন, তিনি শান্তিনিকেতনে গেলেন। তখন সেখানে কলাভবন গড়ে উঠছে। নন্দলাল সেখানে গিয়ে যোগ দিলেন। কিন্তু কলকাতায় তখন অবনীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছেন সোসাইটি বা ভারতীয় প্রাচ্যকলামণ্ডলী। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যকে ডেকে নিলেন এই কাজে। নন্দলালকে ছাড়তে হল ব'লে রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ ক'রে তখন অবনীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—'আমি যে সৌধ গড়ে তুলতে চেয়েছি, নন্দলালকে নিয়ে গিয়ে তুমি সে চূড়া ভেঙে দিলে।'

কিন্তু এ চূড়া ভাঙবার নয়, এ চূড়া অভ্রভেদী হয়ে উঠবেই— এই ছিল কালের নির্দেশ। কিছুদিন পরে নন্দলাল ফিরে এলেন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে। সম্ভবত ১৯২৩ সালে। নন্দলাল তাঁর সাধনার জন্যে এই কলাভবনকে একটি তপোবন-রূপে মনে মনে গ্রহণ করলেন।

এখানে আসবার কিছুদিন আগে তিনি বাগ-গুহার ভিত্তিচিত্রের নকল নিতে যান।

১৯২৪ সালে নন্দলাল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেশভ্রমণে বহির্গত হন। চীন, জাপান, দ্বীপময় ভারত তিনি ঘুরে আসেন। তার পর যান সিংহলে। তাঁর মনের ঐশ্বর্য এবং অভিজ্ঞতার পরিধি এতে ক্রমশই বিস্তারলাভ করতে থাকে।

মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে তিনি কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভারতশিল্পের প্রদর্শনী সজ্জিত করেন, কংগ্রেসের ফৈয়জপুর

অধিবেশনে তিনি কারুময় মঞ্চ ও তোরণ রচনা করেন, কংগ্রেসের পল্লী অধিবেশনে তিনি পল্লীজীবনের বিভিন্ন দিক রূপায়িত করেন।

নিজের দেশের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা কতটা নিবিড় তাঁর অঙ্কিত এইসব চিত্র দেখে তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। এই জন্যই স্বাধীন ভারতের সংবিধানের পাণ্ডুলিপি অঙ্কিত করার ভার অর্পিত হয় নন্দলালের উপর। তাঁর নেতৃত্বে এই সংবিধানের ইংরেজি সংস্করণ অলংকৃত হয়েছে, কয়েকটি চিত্র তিনি স্বয়ং রচনাও করেছেন।

নন্দলাল দীর্ঘজীবনের সাধনায় নিবিষ্ট থেকে যে অগণিত চিত্র রচনা করেছেন তার তুলনায় তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে খুব কম। কয়েক বছর আগে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ তাঁর চিত্র-প্রদর্শনী করেন; তারপর কিছুদিন আগে বোম্বাইতে এক প্রদর্শনী হয়। আজকাল সাময়িক পত্রিকাদিতেও এঁর রচিত চিত্র বিশেষ মুদ্রিত হয় না, কেবলমাত্র 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' 'দেশ' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ছাড়া। এই জন্যে বর্তমান কালের অনেকের পক্ষে তাঁর চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়া তেমন সম্ভব নয়। তাছাড়া, আজকাল কোনো প্রকাশককেও তাঁর চিত্র-সংগ্রহ প্রকাশের জন্যে উদ্যোগী হতে দেখা যাচ্ছে না। এসব আক্ষেপেরই কথা।

কিন্তু এ-আক্ষেপ দূর হয়েছে কিছুটা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকারের অর্থানুকূল্যে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের কলকাতা শাখা নন্দলাল অঙ্কিত চিত্রের একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেছেন। একটি অ্যালবামে শিল্পীর সারা জীবনের রচিত চিত্রসম্ভার প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ১৯০৮ থেকে ১৯৪৯ সাল—এই চল্লিশ বৎসরব্যাপী তাঁর সাধনার নিদর্শন এই অ্যালবামে গ্রথিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে নন্দলালের জন্মদিবসে এই অ্যালবাম তাঁকে উপহার দেওয়া হয়।

১৯৫০ সালে কাশী বিশ্ববিদ্যালয় নন্দলালকে ডক্টরেট পদবী দ্বারা, এবং ১৯৫৩ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট.) উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ১৯৫৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী তারিখে শান্তিনিকেতনের কলাভবনে অনুষ্ঠিত বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দান করেন।

স্বাধীনতার নবম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে ১৯৫৬ সালের আগস্ট মাসে শান্তিনিকেতনে সংগীত ভবনে গুণী-সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে আচার্য নন্দলালকে গরদের ধুতি চাদর ও অশোকস্তম্ভ উপহার দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

১৯৫৮ সালে ইনি দাদাভাই নৌরজী স্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি অথবা সাহিত্য বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের জন্যে এই পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

বর্তমানে তিনি চিত্র-অঙ্কনের কাজ বিশেষ করতে পারেন না। কিন্তু প্রত্যহ তিনি স্কেচ অঙ্কন করে থাকেন।

আর-একটি কাজ তিনি করেন, যার নাম তিনি দিয়েছেন 'হেলাফেলার কাজ' : এ-কাজটা শুরু হল এই ভাবে—কলাভবনের জনৈক অধ্যাপক তাঁর ছাত্রদের হাঁস-মুরগী স্টাডি করাচ্ছেন, অদূরে একটি চেয়ারে বসে নন্দলাল তা দেখছেন। তাঁর হাতে কাগজ-পেন্সিল নেই, কিন্তু হাতের আঙুলগুলি বুঝি ছবি-আঁকার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তাই, ছেড়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে সেই কাগজ ছিঁড়ে ছিঁড়ে তিনি হাঁস-মুরগী স্টাডি দেখালেন ছাত্রদের।

বলেন, "ছবি করার নতুন টেকনিকটি পেয়ে আমারও কাজ করার নেশা আবার জেগে উঠল। পুরনো বাক্সে কাগজ, খাম ও চিঠি, ছেঁড়া কাগজের টুকরো পেলেই ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছবি করতে আরম্ভ করলাম। এখন অটোগ্রাফের খাতায় নাম-স্বাক্ষরের সঙ্গে এই ধরনের ছবিই করি দিচ্ছি।"

এই শিল্পীর জীবন একটানা দীর্ঘ সাধনার জীবন। এই জীবনের ঘটনার ও সাধনার কথা বহু স্থানে লিপিবদ্ধ করেছেন অনেকে। কিন্তু তা'তে বুঝি সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে না জীবনটি। এই কারণে ভারত সরকার এই শিল্পীর জীবন ও জীবনী চলচ্চিত্রে ধরে রাখার জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলছেন, 'বাজারে ঠকা ভালো, নিজেকে ঠকানো ভালো না। আমি নিশ্চিত জানি নন্দলাল নিজেকে ঠকাতে অবজ্ঞা করেন তাঁর লেখনী নিজের অতীতকালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিনী।'

সেই যাত্রাপথ ধ'রে এগিয়ে চলেছে নন্দলালের তুলিকা। সুদূর ভবিষ্যৎকালের দিকে তিনি যেন দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বসে আছেন।—যে কাল এখনো অনাগত, কিন্তু যে কাল তাঁর আয়ত্ত।

রচিত গ্রন্থাবলী

শিল্পকথা

শিল্পচর্চা

রূপাবলী। তিন খণ্ড

ফুলকারী। তিন খণ্ড

Ornamental Art

Pictures from the life of Buddha

Paintings

Six Sketches of Nandalal Bose

চিত্রিত গ্রন্থাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সহজ পাঠ। দুই খণ্ড

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছড়ার ছবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্রমের রূপ ও বিকাশ। ১৩৫৮

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা। 'বিচিত্রা', ১৩৩৪ আষাঢ়

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, টাকডুমাডুম ডুম। ১৩৫১

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বুড়ো আংলা

রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের আরও কোনো কোনো গ্রন্থে নন্দলাল-অঙ্কিত অনেক চিত্র আছে।

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

ল্যাপল্যাণ্ড দেশটি দেখি নি, শুনেছি সে দেশটা নাকি অত্যন্ত কুস্থান। অবশ্য যে কবি একে কুস্থান বলেছেন, তাঁর চোখে ঐ দেশটি হয়তো মনোরম ঠেকে নি। কিন্তু কবিই বলেছেন যে, সে দেশ যত কদর্যই হোক সেই দেশের নিবাসীর কাছে জিজ্ঞাসা করলে অবশ্যই জানা যাবে যে 'তেমন সুখের দেশ আর নাকি আছে!' একে অন্ধদেশপ্রীতি বলে অবহেলা করা চলে না; আসলে নিজের দেশ সম্বন্ধে যারা উদাসীন, অবহেলার পাত্র তারাই। পৃথিবীর ইতিহাস ঘেঁটে এমন-একটি মানুষের খোঁজ পাওয়া যায় না— যিনি নিজের দেশকে অবজ্ঞা করে জীবনে সফলকাম হতে বা কারো শ্রদ্ধার পাত্র হতে পেরেছেন। অথ স্বদেশজিজ্ঞাসা কথাটির মধ্যেই অথ আত্মজিজ্ঞাসা কথাটিও নিহিত আছে বলে মনে হয়।

যাঁরা এই স্বদেশজিজ্ঞাসায় ধ্যানস্থ রাখতে পেরেছেন নিজেদের, তাঁরা আমাদের নমস্য। কেবল আমাদের নয়, তাঁরাই দেশের ও বিদেশেরও নমস্য। এই স্বদেশজিজ্ঞাসীকে তাই নমস্কার করে স্বদেশ ও পরদেশ উভয়েই।

'আমার ভারতবর্ষ তুমি' বলে যেদিন আমরা ভারতের ভূমিকে প্রীতির শৃঙ্খল দিয়ে নিজের আত্মার সঙ্গে বাঁধতে শিখব, আমাদের আত্মার উন্নতি হবে সেই দিন, এবং সেই দিন আমাদের স্বদেশের উন্নতি দেখতে পাব আমরা চাক্ষুষ। আমাদের বিবেক সেই দিন আনন্দলাভ করতে পারবে। 'ভারতের ধূলিকণা আমার স্বর্গ'— স্বামী বিবেকানন্দের এই সোল্লাস উক্তির প্রতিধ্বনি যেদিন চারদিকে বেজে উঠবে, সেই দিন সত্যসত্যই স্বর্গে পরিণত হবে এই ভারতবর্ষ।

নিজের দেশকে জানবার প্রাথমিক উপায় নিজের দেশের ইতিহাস জানা। ঐতিহাসিকদের মধ্যে যাঁরা ভারতের অতীত ইতিহাস মন্থন করে ভারতের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন, তাঁরা আমাদের নমস্য। এই নমস্যদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডক্টর রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

১৯শে মার্চ ১৯৫৩, ৫ই চৈত্র ১৩৫৯। তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম। বালীগঞ্জের একডালিয়া রোডে। ট্রাম আর বাস্ চলাচলের সদর রাস্তার উপরে বাড়ি। সকালবেলা। কলরব-কোলাহল তাই তখনো শুরু হয় নি।

অতি ছোটখাটো দেখতে মানুষটি, অতি সাদাসিধে। বয়স সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু দেখে তা মনে হয় না।

বললেন, "আমার জন্ম ১৮৮৪ (বঙ্গাব্দ ১২৯০) সালে। কোষ্ঠী হারিয়ে গেছে, তাই মাস-তারিখ কিছু বলতে পারছি নে।"

একটু থামলেন, হেসে বললেন, "যাদের কোষ্ঠী হারিয়ে যায় তাদের কী বিপদ।"

ভারতের অতীত ইতিহাস উদ্ধার করে জীবন কাটালেন ইনি, কত সন-তারিখের অরণ্যে পথ খুঁজে খুঁজে চলতে হয়েছে এঁকে, উদ্ধার করতে হয়েছে কত ঐতিহাসিক পুরুষের জন্ম-ঠিকুজি। এত-কিছু রক্ষা করেছেন, কিন্তু নিজেরটাই ফেলেছেন হারিয়ে। তাই তাঁর কথা শুনে অন্য কথা মনে পড়ে গেল আমার। মনে পড়ল যিশুখ্রীষ্টের কথা। কত জীবকে তিনি ত্রাণ করলেন, কিন্তু নিজেকে পরিত্রাণ করতে পারলেন না—

He saved others but Himself He could not save.

কথাটি মনে পড়ে গেল বটে, কিন্তু তাঁর অন্য কথা শোনার জন্যে তৈরি হয়ে বসলাম।

বললেন, "আমার পিতার নাম স্বর্গীয় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে তিনি উকিল ছিলেন। আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয় সেখানেই।"

ইতিহাসের প্রতি রাধাকুমুদ যে অনুরক্ত হয়েছেন, সে অনুরাগ উত্তরাধিকার-সূত্রে পিতার কাছ থেকেই তিনি পেয়েছেন। তাঁর পিতার ছাত্রজীবন ছিল কৃতিত্বপূর্ণ— তারপর তিনি যখন আইনজীবীরূপে জীবন আরম্ভ করেন তখনও তিনি অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং এরই ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে টেগোর ল প্রফেসর রূপে নিয়োগ করেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশতঃ তিনি এই পদে যোগ দেবার আগেই পরলোকগমন করেন।

বহরমপুরে স্কুলের পাঠ সমাপ্ত করে রাধাকুমুদ কলকাতায় আসেন। এখানে এসে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে পাঠ আরম্ভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেকটি পরীক্ষায় তিনি প্রথম গ্রেডের সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। তিনি একটি নূতন রেকর্ডও স্থাপন করেন। ১৯০১ সালে দুটি বিষয়ে অনার্সসহ তিনি বি. এ. পাস করেন এবং ঐ সালেই ইতিহাসে এম. এ. ডিগ্রি ও অর্থনীতিতে কবডেন পদক পান। এর পর বৎসর ১৯০২ সালে তিনি ইংরেজিতে এম. এ. পাস করেন। ১৯০৫ সালে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন; এই বৃত্তির সাত হাজার টাকার সঙ্গে তিনি একটি স্বর্ণপদকও পান। ১৯১৫ সালে তিনি পি. এইচ-ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

সংক্ষেপে এই হল তাঁর ছাত্রজীবন। এই জীবনের মধ্যে তিনি যে অসাধারণতা দেখাতে পেরেছেন, তার থেকেই তাঁর উত্তরজীবন সম্বন্ধে সে সময় অনেকের মনেই আশার সঞ্চার হয়। তিনি তাঁদের সে আশার অতিরিক্ত ভরসা দিতে পেরেছেন তাঁর জীবনের নিষ্ঠা ও শ্রমের দ্বারা।

এবার কর্মজীবনে প্রকাশ করলেন রাধাকুমুদ। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করার আগেই ১৯০৩ সালে তিনি ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপকরূপে যোগ দেন কলকাতার রিপন কলেজে এবং কিছুদিন পরেই কলকাতার বিশপ কলেজে।

বছর তিনেক পরে তিনি বাংলার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনে হেমচন্দ্র বসুমল্লিক অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের অধ্যক্ষতাধীনে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজে অধ্যাপনা করেন।

বিভিন্ন কলেজে অধ্যাপনা করে তাঁর অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে থাকে। এর পর তিনি যান কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৬ সালে। এখানে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির মহারাজা সার্ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অধ্যাপকরূপে যোগ দেন; এ অধ্যাপক-পদটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর তিনি এই পদে সর্বপ্রথম নিযুক্ত হন। এর পর যান মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক রূপে।

এইভাবে দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে তিনি বিদ্যাবিতরণ করে চলেছেন, বিদ্যাবিতরণের সঙ্গেসঙ্গে তিনি বিদ্যা-অর্জনও করে চললেন, জ্ঞান-আহরণও

হতে লাগল সেই সঙ্গেসঙ্গে ; নিজের দেশকে জানতে হলে কেবল পুঁথিপাঠের দ্বারাই তা সম্ভব নয়, তার ধূলিকণার সঙ্গে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে ও তার অধিবাসীর সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকাও দরকার। রাধাকুমুদ অধ্যাপকরূপে স্থান থেকে স্থানান্তরে গিয়ে নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে তুলতে লাগলেন। ভারতের মাটির ও মানুষের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল ক্রমশ। এই আত্মীয়তার দ্বারা তিনি আত্মস্থ করে নিলেন ভারতভূমিকে। তাই দেশ এবং বিদেশ তাঁকে আজ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জীবনী-গবেষণাগার থেকে প্রকাশিত 'বায়োগ্রাফিকাল এনসাইক্লোপিডিয়া অব দি ওয়ার্ল্ড'এ পৃথিবীর সেরা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনী-সংকলনে তাই রাধাকুমুদেরও জীবনী সংকলিত হয়েছে।

মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছিলেন ১৯২১ সাল পর্যন্ত। এই বছরই তিনি আসেন লখনউ। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক এবং উক্ত বিভাগের প্রধানরূপে যোগ দেন। এইবার তাঁর জীবনে যেন এল স্থিতি। এখানেই তিনি অধ্যাপনা-জীবন অতিবাহিত করেন।

ভারতের ইতিহাসে ডক্টর রাধাকুমুদের দান অসামান্য। ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের ও প্রসারের জন্যে তিনি বিশেষভাবে কাজ করেছেন। বর্তমানের পৃথিবীর কাছে ভারতের আজ যে মর্যাদা তার মূলে আছে ভারতের গৌরবময় অতীত এবং সম্ভাবনাপূর্ণ ভবিষ্যৎ। সেই অতীতের সঙ্গে পরিচয়-সাধনের জন্যে যাঁরা বিশেষভাবে প্রয়াস করেছেন রাধাকুমুদ তাঁদের মধ্যের একজন। তিনি যে আজ দেশে এবং বিদেশে অভিনন্দিত হচ্ছেন, তার হেতু তাঁর এই স্বদেশপ্রাণতা।

তাঁর ঐতিহাসিক গবেষণার ধারা ও প্রণালী দেখে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর ভিনসেণ্ট স্মিথ উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলেছেন যে, ডক্টর রাধাকুমুদ কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা যেসব তথ্য উদ্ধার করেছেন, সেইসব তথ্য ডক্টর স্মিথ তাঁর নিজের লেখা বই *Early History*র পরবর্তী সংস্করণে ভুক্ত করতে পারলে ধন্য হবেন।

বিদেশী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিই নয়, স্বদেশের নায়কগণও তাঁর গবেষণার

দ্বারা আকৃষ্ট হন। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও অন্যান্য অনেকে ভূয়সী প্রশংসা করেন রাধাকুমুদের।

তাঁর গবেষণায় প্রীত ও আকৃষ্ট হয়ে বরোদা সরকার তাঁকে যে উপাধিতে ভূষিত করেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর পরিচয় সেখানেই। বরোদা সরকার তাঁকে 'ইতিহাস-শিরোমণি' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

লখনউতে তিনি অধ্যাপকরূপে কাজ করে চলেছেন। কিন্তু তখনো ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর কাছে আহ্বান এসেছে ক্রমাগত। মহীশূর কাশী পঞ্জাব কলকাতা বোম্বাই আন্নামালী মাদ্রাজ নাগপুর ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানের কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দানের জন্যে আহূত হয়ে তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন:

তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের সঙ্গেসঙ্গে চলেছিল আরও একটি জীবন। সে হচ্ছে তাঁর কর্মী-জীবন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত ভারত যখন জাতীয় আন্দোলনে আলোড়িত হয়ে ওঠে ডক্টর রাধাকুমুদ তখন সেই আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে। তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং তখন তিনি জাতীয় শিক্ষা-আন্দোলনের প্রচারকরূপে বাংলার বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করেন।

১৯৩৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মনোনয়নে তিনি বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলের (ঊর্ধ্বতন পরিষদ) সদস্য ও বিরোধী পক্ষের নেতা নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তিনি বাংলা সরকারের ফ্লাউড কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে FAO Preparatory Commission at Washingtonএ ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন। বর্তমানে ইনি রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য।

লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের রজতজয়ন্তী উপলক্ষে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছেন।

বর্তমানে রাধাকুমুদ ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার প্রচারকরূপেই বিশেষভাবে পরিচিত ও পরিগণিত। তিনি অনলস গবেষণার দ্বারা যেসব গ্রন্থ রচনা করেছেন তার জন্যেই তিনি আজ বন্দিত। অধ্যাপক হিসাবেও তাঁর

সমকক্ষ পাওয়া দুরূহ। তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে নূতন দৃষ্টির সঞ্চার করেছেন, সেই নূতন দৃষ্টিতে সেই ছাত্রবৃন্দ ভারত-ইতিহাস লক্ষ্য করে নূতন জ্ঞানালোক দেখতে পেয়েছে। তাঁর অধ্যাপনা-জীবনকে তাই প্রচারক-জীবনও বলা চলে। দেশের ইতিহাসের এবং দেশের মাটির খবর রাখাই যে সর্বপ্রধান কর্তব্য এবং জীবনে মর্যাদালাভের প্রকৃষ্টতম পথ— এই সংবাদ বিতরণ ক'রে গিয়েছেন রাধাকুমুদ তাঁর কাজের দ্বারা এবং কথার দ্বারা।

অতি সহজ ও সাধারণ জীবন যাঁর, তাঁরই জীবনে মনন সম্ভব। রাধাকুমুদ তাঁর জীবনকে মননের উপযুক্ত করেই গড়ে তুলেছেন ধীরে ধীরে। বিনয়ে তিনি নম্র। এই নম্রতা দেখে মনে হয়, বুঝি-বা জীবনকে নমনীয় না করলে জীবন কমনীয়ও যেমন হয় না, তেমনি কৃতার্থও হয়ে ওঠে না। দেশের মাটির সঙ্গে স্বাভাবিক যোগ না থাকলে এই কোমলতা অর্জন করা কঠিন। রাধাকুমুদ নিজের দেশের মাটিকে এবং দেশের মানুষকে ভালোবাসতে জানেন ব'লেই তিনি ভারতবাসীর প্রিয়জন।

১৯৫৭ সালের প্রজাতন্ত্র দিবসে ভারত সরকার রাধাকুমুদকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

তাঁর নিষ্ঠা ও শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ অথবা হয়তো কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যেই তাঁর অনুরাগিগণ ১৯৪২ সালে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের হায়দরাবাদ অধিবেশনের সময় স্থির করেন যে, রাধাকুমুদকে তাঁরা একটি গ্রন্থ (Volume of Studies) উপহার দেবেন এবং তাঁর নামে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার বিষয়ে এক লেকচারশিপের ব্যবস্থা করবেন। এর জন্যে একটি পরিকল্পনাও রচিত হয়— তার জন্যে পঁচাত্তর হাজার টাকার দরকার এইরূপ স্থির হয়। এর জন্যে যে আবেদন প্রচারিত হয় তাতে স্বাক্ষর করেন ভারতের সর্বক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এর দ্বারাই তাঁর সর্বভারতীয় মর্যাদা সূচিত হয়। বলা বাহুল্য, এই টাকা সংগৃহীত হয়েছে এবং পরিকল্পনা অনুসারে কাজও হয়েছে। তাঁর নামে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারশিপের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তাঁকে 'ভারত-কৌমুদী' নামে পাঁচ শ পাতার বৃহৎ একটি গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়েছে—

এই গ্রন্থে রচনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন দেশের ও বিদেশের বিদ্বজ্জন। এই গ্রন্থ একটি সম্পদবিশেষ। সর্বভারতের বন্দনা যিনি লাভ করেছেন, তিনিই সত্যই ভারত-কৌমুদী। এই গ্রন্থটির নামও সেই জন্যে সার্থক।

রচিত গ্রন্থাবলী

The History of Indian Shipping
The Fundamental Unity of India
Local Government in Ancient India
Nationalism in Hindu Culture
Men and Thought in Ancient India
Hindu Civilization
Asoka
Harsha
Ancient Indian Education
Chandragupta Maurya and His Times
Gupta Empire
Early Indian Art
Asokan Inscriptions
India's Land System
A New approch to the Communal Problem
Akhand Bharat
The University of Nalanda

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

মানুষের জীবন হচ্ছে একটি বহতা নদী। কোথাও এর গতি হয় দ্রুত, কোথাও স্তিমিত। কখনোই বাঁধা-পুকুরের মত নিশ্চল হয়ে এ দাঁড়িয়ে থাকে না। কোনো কোনো নদী পাহাড় ডিঙিয়ে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রান্তরে, সেখান থেকেই সমতল প্রান্তর পার হয়ে গড়িয়ে গেছে সাগরে। কিন্তু এমন নদীর সংখ্যা কম, এর সার্থকতাও সামান্য। পাথরের বিস্তর জাঙাল ভেঙে, সরু ঝরণার রূপে, উদ্দাম প্রাণবেগের তাড়নায় ঝিরঝির করে নেমে এসেছে একটা অজানা জলের ধারা, পথ না পেয়ে পাহাড়ের খাঁজে-খাঁজে পা ফেলে, বাধা-বন্ধন ডিঙিয়ে ডিঙেয়ে অনেক দুরূহ সাধনায় অবশেষে পেয়েছে মাটির ছোঁয়া, পেয়েছে সমতলের স্পর্শ, তখন সে হয়েছে নদী, তখন সে পেয়েছে অকৃত্রিম স্রোত, এমন নদীর সংখ্যাই বেশি। কিন্তু এমন নদীকেও ব্যর্থ হতে হয়, পাহাড় থেকে প্রান্তরে আসার কঠোর সাধনাও নিষ্ফল হয়ে যায়, কত মরুপথে এমন কত নদী তার ধারা হারিয়ে ফেলেছে। সমতলের বুকের উপর দিয়ে গড়িয়ে যেতে যেতে নব নব দেশের নব নব বাতাসের নব নব জীবনের সংস্পর্শে এসে যে নদী স্রোতে উদ্দাম এবং তরঙ্গে উত্তাল হয়ে দুকূল উর্বর করে দিয়ে অবশেষে সমুদ্রে গিয়ে লীন হয়, সেই নদীই সফল নদী, সেই নদীই সার্থক নদী। সুরেন্দ্রনাথের জীবন ছিল এই নদীর মত।

২৩এ ডিসেম্বর ১৯৫২, ৮ই পৌষ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ। লখনউ এসে তাঁর জীবনের কাহিনী শুনছি। একটা অজানা জলের ধারার মতই তাঁর জন্ম, অনেক বাধা আর অনেক বিপত্তি ডিঙিয়ে নিজের প্রাণবেগের তাড়নায় তিনি এগিয়ে চলেছেন, বাধা যতই প্রবল হয় তাঁর প্রেরণাও প্রবল হয়ে ওঠে সেই অনুপাতে। তার পর জীবন হয়ে এল সহজতর তিনি সমতল প্রান্তর পার হয়ে এগিয়ে চললেন, জ্ঞানে ও অভিজ্ঞতায় দিনে দিনে ঐশ্বর্যবান হয়ে— জীবনের সংস্পর্শে এসেছে যত ছাত্র, তিনি তাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে চলেছেন স্বোপার্জিত জ্ঞানৈশ্বর্যের সার— উর্বর করে দিয়েছেন দুকূল। এই তাঁর জীবন।

কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ ক'রে তিনি শেষজীবন লখনউতে অতিবাহিত করছিলেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার দ্বারা তাঁর জীবনের কাহিনী অবগত হয়ে তাঁর জীবনকথা রচনার অভিপ্রায় তাঁকে জানাই। তিনি এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যেদিন (১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫২, ৩রা পৌষ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ) আমাকে চিঠি দেন, দুর্ভাগ্যবশত সেই দিনই অকস্মাৎ তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর চিঠি ও মৃত্যুসংবাদ প্রায় একই সময় আমাদের কাছে পৌছয়। তাঁর লিখিত চিঠি হুবহু এখানে তুলে দিলাম—

সুলতানের বাংলো, বাদশাবাগ
২২, ক্যামেরন রোড, লখনউ
১৮।১২।৫২

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার ১৭।১২।৫২ তারিখের লিখিত পত্র পাইয়া সুখী হইলাম। আমি আজ প্রায় সাত বৎসর যাবৎ নানারোগে শয্যাগত হইয়া আছি এবং এই অবস্থাতেও আমার ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের ৫ম খণ্ড লিখিতেছি। এই অবস্থায় এখন আমার নিজের উদ্যোগে নিজের সম্বন্ধে কিছু লিখাইয়া রাখা আমার পক্ষে রুচিকর নয় এবং ইহাতে আমি ক্লান্তিও বোধ করিব। তাহা ছাড়া আপনাদের কাগজে আমার সম্বন্ধে কতটুকু স্থান দিতে পারেন এবং আমার জীবনের কোন্ অংশগুলি আপনাদের কাগজের পক্ষে আদরণীয় হইবে তাহা আমার পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। সেইজন্য আপনি যদি এখানে আসিয়া আমার সহিত গল্প-আলাপ করিয়া যান এবং তাহাই অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু লিখিবার তাহা লেখেন এবং আমাকে তাহা শোনাইয়া যান, তাহা হইলেই ভালো হয় বলিয়া মনে হয়। আপনিও সেই প্রস্তাবই করিয়াছেন। আপনারা যে উদ্যোগ করিতেছেন, তাহার প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং আমি যতটুকু পারি সে বিষয়ে সাহায্য করিব। ভগবান্ আপনাদের মঙ্গল করুন। ইতি—

মঙ্গলার্থী
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

পুনশ্চ—আমাদের বাসা একেবারে ইউনিভার্সিটির মধ্যে। ইউনিভার্সিটির অনেকগুলি গেট আছে। পোস্টঅফিসেব সন্নিকটস্থ গেট দিয়া আসিলে অল্প দূরেই আমাদের বাড়ীতে আসা যায়। এখানে ট্যাক্সি বা ঘোড়ার গাড়ী নাই। সাইকেল-রিকশা বা টোঙ্গাই প্রধান যানবাহন। ইউনিভার্সিটি লখনউ-স্টেশন হইতে ৪ মাইল।

এইটেই সম্ভবত তাঁর জীবনের শেষ রচনা। এই পত্র রচনার কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি পরলোকগমন করেন।। পত্র পাওয়া-মাত্র স্থির করি, লখনউ গিয়ে তাঁর জীবনের তথ্যাদি সংগ্রহ ক'রে এনে তাঁর জীবনকথা রচনা করব। পরদিনই কাশী হয়ে লখনউ অভিমুখে যাত্রা করি। সেখান থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তার উপর নির্ভর করে এই জীবনকথা রচনা করা হল।

১৯৪৯ সালের ১১ই মার্চ তারিখে তিনি তাঁর আত্মজীবনী রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু মাত্র কয়েক পাতা লিখেই সে রচনা স্থগিত রাখেন। তা'তে নতুন ক'রে হাত দিতে পারেন নি। সেই অসমাপ্ত আত্মচরিতের পাণ্ডুলিপির কপিও তাঁর জীবনকথা-রচনায় ব্যবহৃত হয়েছে।—

স্টেশন থেকে আমিনাবাদের হোটেল। সেখান থেকে সাইকেল-রিকশা চেপে সটান চলে এসেছি ইউনিভার্সিটিতে। কড়া শীতের সকাল, তাজা রোদ্দুর উঠেছে। ঝরঝরে পিচের রাস্তা দিয়ে মসৃণ দ্রুততায় এগিয়ে চলেছে রিকশা। গানের দেশ লখনউ, এবং বাগান-বাগিচার। বাঁ-পাশে ভাতখণ্ডের সংগীতভবন, এপাশে-ওপাশে বাগিচায় নানা রঙের ফুল ফুটে আছে। একটু এগিয়ে যেতেই চড়াই। নীচে গোমতী নদী। সাঁকো পার হয়ে ঢালু পথে নেমে গেল রিকশা। ইউনিভার্সিটির গম্বুজ দেখা গেল। কয়েকটা ফটক ডিঙিয়ে পোস্টাফিসের ফটকে এসে নামলাম। বাদশাবাগ। সুলতানের বাংলো খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগল। তবু সহজেই হল বলতে হবে। সুরেন্দ্রনাথ যদি তাঁর চিঠিতে পথের নির্দেশ দিয়ে না দিতেন তাহলে হয়তো খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্যই হত।

জীবনের কোনো কাজে কোনো খুঁত না রাখাই ছিল তাঁর জীবনে সাফল্য-লাভের মূলসূত্র। তিনি তাঁর শেষ চিঠিতেও তারই প্রমাণ দিয়ে গেছেন। দূরদেশ থেকে যে তাঁর কাছে আসবে তার কোনো অসুবিধে না হয়, এই আন্তরিকতাটুকু দেখায় ক'জন? তাঁর অবর্তমানে এই আন্তরিকতার অভাবটাই সবচেয়ে বড় লোকসান বলে মনে হল।

১৮৮৫ সালে কুষ্টিয়ায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন ১৮৮৭, কিন্তু এটা নাকি ভুল। পিতা কালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত ছিলেন কাম্নুনগো। মাসিক বেতন পেতেন পঞ্চাশ টাকা। পিতার এই সামান্য বেতনে সংসারে সচ্ছলতা ছিল না। অতি দরিদ্রভাবে জীবন আরম্ভ হয়। পিতা নানা জায়গায় বদলি হতেন। তাঁর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথেরও স্থানবদল হত।

তাঁর বয়স যখন দুই-তিন বৎসর তখনই তাঁর জীবনে অস্বাভাবিক শক্তির লক্ষণ দেখা যায়। অক্ষরপরিচয় তখনো তাঁর হয় নি, কিন্তু এ সত্ত্বেও রামায়ণ পাঠ করতে পারতেন। এমনকি 'কাঞ্চন' কথাটির অর্থ পর্যন্ত বলে তিনি সকলকে চমৎকৃত করে দেন। এই সময় তার খেলার জিনিস ছিল অতি ক্ষুদ্র একটি কৃষ্ণের মূর্তি এবং সেই অনুপাতেরই একটি ছোট ভোগের পাত্র।

একটি শিশুর এই ভক্তিভাব দেখে এবং তার এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা দেখে সকলে আশ্চয হয়ে যায়। একদিন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে দেখা করানো হয় এই শিশুটিকে। বিজয়কৃষ্ণ এর সঙ্গে কথা বলে অভিভূত হন, বলেন, 'এ এক জাতিস্মর বালক'। এর পর সুরেন্দ্রনাথের নাম হল 'খোকা ভগবান'। খোকা ভগবানের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেল চারদিকে। দলে দলে লোকজন আসতে লাগল তাঁর কাছে। নানা জনের নানা প্রশ্ন। লোকের আনাগোনার বিরাম নেই। একটি শিশুর জীবন একটা বিরাট জনতার দ্বারা জীর্ণ হয়ে যেতে লাগল।

নেহাত কাহিনী বলে এই ঘটনাকে উড়িয়ে দেওয়া হয়তো যেত। কিন্তু এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। সে আমলের সংবাদপত্রে এই কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে।

১৩০১ সনের ৭ই বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৯এ এপ্রিল ১৮৯৪ তারিখের 'সুলভ দৈনিক' সংবাদপত্রে "অদ্ভুত বালক" শিরোনামায় এইরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে—

"ইংরাজি সংবাদপত্র 'হোপে' একটি অদ্ভুত বালক সম্বন্ধে একটি অত্যাশ্চয ঘটনা প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যথাযথ প্রকাশ করা গেল—

"সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত নামক একটি সপ্তম [নবম ?] বর্ষীয় বৈদ্য বালকের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। বালক বিদ্যালয়ে আখ্যান-মঞ্জরী ও ইংরেজি বর্ণমালা পাঠ করে, সংস্কৃত এখনও পড়িতে শিখে নাই; কিন্তু তাহাকে ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধে যে-কোনো প্রশ্ন করা যাউক-না কেন, তৎক্ষণাৎ তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া বড় বড় দার্শনিককেও বিস্মিত করিয়া দেয়। সম্প্রতি বালককে বেঙ্গল থিয়সফি সোসাইটির গৃহে নানা লোকে নানাপ্রকার কূট প্রশ্ন করে, সেইসকল প্রশ্নের উত্তর বালক দিয়াছে—"

এর পর নানা প্রশ্ন এবং তার উত্তর প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি বাহুল্য-ভয়ে এখানে উদ্ধৃত করা হল না।

অশেষ ক্ষমতা নিয়ে তিনি যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এর থেকেই তা সহজে বোঝা যায়।

কিন্তু এই প্রশ্ন ও উত্তরের ভিড়ের মধ্যে যদি এঁকে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে লেখাপড়ায় বাধা হবে— তাঁর পিতার এই ভয় হল। তাঁর পিতা বদলি হলেন ডায়মণ্ডহারবারে। সুরেন্দ্রনাথের জীবনে এল নূতনতা। একটি জনতার দেশ থেকে তিনি এসে পৌঁছলেন যেন একটি জনহীনতার রাজ্যে। তিনি নাকি বলেছেন যে, তাঁর জীবনের এই সময়টা সবচেয়ে নিঃসঙ্গ ও নিরুত্তাপ ভাবে কেটেছে।

সুরেন্দ্রনাথের আদি নিবাস বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামে। তাঁর প্রপিতামহ কবীন্দ্র মদনকৃষ্ণ দাসগুপ্ত বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পারিবারিক টোল ছিল। ন্যায় কাব্য সাংখ্য আয়ুর্বেদ ইত্যাদি সেখানে পড়ানো হত। এই টোলে মুসলমান ছাত্রেরাও আয়ুর্বেদ পড়ত। গৈলা কবীন্দ্র-বাড়ি বলেই এঁদের গৃহের পরিচয়। এই গৃহে সর্বদা চলত জ্ঞানযজ্ঞ। এই টোল সেদিন পর্যন্তও

টিকে ছিল, কিন্তু বাংলাদেশ বিভক্ত হবার পর পূর্ববঙ্গ থেকে বহু লোক চলে আসায় বর্তমানে টোলের অবস্থা নিষ্প্রভ হয়েছে। এখন এই টোল কবীন্দ্র-কলেজ নামে অভিহিত। এই টোলে বরাবরই সরকারী বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর পিতার একমাত্র সন্তান। তাঁর প্রপিতামহের লোকান্তরের বহুদিন বাদে তাঁর জন্ম। কিন্তু বালক সুরেন্দ্রনাথের অদ্ভুত প্রতিভা দেখে অনেকেই সেকালে বলাবলি করতেন যে, কবীন্দ্র আবার বুঝি ফিরে এলেন।

ডায়মণ্ডহারবারে অবস্থানকালে যখন তাঁর দিন নিঃসঙ্গ কাটছে, তখন তাঁর বয়স নয়-দশ। এই সময় বৃত্রসংহারের অনুকরণে তিনি রচনা আরম্ভ করেন এক মহাকাব্য— প্রায় চারটি সর্গ রচনা করেন। তাঁর হাতের লেখা ভালো ছিল না বলে তিনি এই কাব্য মুখে মুখে বলে যান, আর তাঁর এক সহপাঠী লেখেন।

তাঁর পিতা বদলি হলেন কৃষ্ণনগরে। সুরেন্দ্রনাথ এখানে এসে ভর্তি হলেন স্কুলে। নূতন এই অদ্ভুত বালককে পেয়ে সহপাঠীরা জ্বালাতন করতে শুরু করল, নানাভাবে তারা উপদ্রব আরম্ভ করল, কথায় কথায় তাঁর মাথায় চাঁটি মেরে মজা পেত তারা। এখান থেকেই ১৯০০ সালে প্রথম ডিভিশনে তিনি এনট্রান্স পাস করেন। এনট্রান্স পাস করে তিনি যান দেশে— গৈলায়। সেখানে গিয়ে টোলে যোগ দেন। এখানে তিনি পঞ্জী ও টীকাসহ দুরূহ কলাপ-ব্যাকরণ ছাত্রদের পড়াতে আরম্ভ করলেন, নিজেও পড়তে লাগলেন।

পুনরায় আসেন কৃষ্ণনগরে। এখানকার কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন। এফ. এ. পড়ার সময় কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর লড়াই বাধে। সুরেন্দ্রনাথ নানাবিধ প্রশ্নের দ্বারা অধ্যাপককে বিব্রত করে তোলেন। অধ্যাপক দেখলেন, ক্লাসে যা পড়ানো হয় সুরেন্দ্রনাথ তার চেয়ে অনেক এগিয়ে আছেন। অগত্যা অধ্যাপক কলেজ লাইব্রেরি থেকে 'সিদ্ধান্ত-কৌমুদী' ছাত্রদের ইশু করা বন্ধ করে দেবার ব্যবস্থা করলেন।

এই সময় তিনি সংস্কৃতে অনুষ্টুভ্ ছন্দে একটি কাব্য রচনা করেন— তিলোত্তমা কাব্য।

এক বছর বি. এ. ফেল ক'রে পর বৎসর কলকাতার রিপন কলেজ থেকে তিনি সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করেন। নিস্তারিণী বৃত্তি পান।

বি. এ. ক্লাসে ইংরাজী পড়াতেন টি. এল. ভাসানি। একদিন ভাসানি শেক্স্‌পীয়ার পড়াচ্ছেন, সুরেন্দ্রনাথ তাঁকে অনবরত নানা রকমের প্রশ্ন করছেন। সব প্রশ্নের জবাব দেওয়া অধ্যাপকের পক্ষে সম্ভব হয় না, অধ্যাপক ভাসানি রেগে ক্লাস থেকে বেরিয়ে যান। দু-একদিন পরে ভাসানি সুরেন্দ্রনাথকে ডেকে সস্নেহে বলেন, তুমি যা জানতে চেয়েছিলে, সে প্রশ্ন সংগত প্রশ্ন।

সে সময়ে বি. এ.-তেও বিজ্ঞান পড়তে হত। সুরেন্দ্রনাথ কেমিস্ট্রি আদ্যোপান্ত মুখস্থ করেন। ক্লাস-পরীক্ষার খাতায় তিনি কমা-সেমিকোলন সমেত হুবহু বইয়ের কথা লেখেন। অধ্যাপক খাতা দেখে চটে যান, বলেন, এ নিশ্চয় নকল করা। সুরেন্দ্রনাথ এ অভিযোগ অস্বীকার করলে অধ্যাপক বই খুলে তাঁকে মুখস্থ বলতে বললে তিনি অনর্গল মুখস্থ বলে অধ্যাপককে বিস্মিত করেন। এই ব্যাপারে তাঁর প্রতি অধ্যাপক এতটা আকৃষ্ট হন যে, কোনোদিন সুরেন্দ্রনাথ ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে অধ্যাপক বলতেন, তাহলে আজ আমরা ক্লাস না নিলাম।

বি. এ. পাস করে জীর্ণ বস্ত্রে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। অর্থের খুব প্রয়োজন। অনটন অত্যন্ত। এই সময় তিনি পেলেন একটি প্রাইভেট টিউশন। টানাটানি ছিল, কিন্তু আত্মমর্যাদাজ্ঞানও ছিল সেই সঙ্গে। টিউশনের বাড়িতে তিনি দেখলেন, তাঁর মর্যাদায় আঘাত লাগছে তাদের ব্যবহারে। তিনি ছেড়ে দিয়ে চলে এলেন।

সংস্কৃত কলেজে এম. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেন সুরেন্দ্রনাথ। অলংকার ও দর্শন শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। অনেকে এইসব শাস্ত্র আলোচনার জন্ত তাঁর কাছে আসত।

তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, "কলেজে পড়িয়া কোনো দিন আনন্দ পাই নাই। টোলের পড়ুয়াদের সরল জীবনযাত্রার সঙ্গে আমার জীবন সেই সময় এমনই গাঁথিয়া গিয়াছিল যে, আজও তাহার ছবি মনের মধ্যে জলজ্বল করিতেছে।"

এম. এ. ক্লাসের পাঠ শেষ ক'রে তিনি পরীক্ষা দিলেন। "আমার পিতা তখন মুর্শিদাবাদ লালবাগে স্বল্প বেতনের একটি চাকুরি করিতেন। সংস্কৃত

কলেজ হইতে ১৯০৮এ সংস্কৃতে এম. এ. পাস করিয়া লালবাগে পিতার আশ্রয়ে বাস করিতেছি। আমাদের সে সময়ে কলেজে চাকুরি পাওয়া ভারী কঠিন ছিল। কলেজের সংখ্যা ছিল কম এবং তদনুপাতে পদপ্রার্থীও কম ছিল না। পাস করিয়া যে চাকুরির চেষ্টা করিব এমন কোনো সুযোগ ছিল না। ·· তখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম একটা স্বতন্ত্র প্রদেশ হইয়াছে। আমাদের বাড়ি পূর্ববঙ্গে, তাই পূর্ববঙ্গে কোনো ডেপুটিগিরি চাকরি পাওয়ার জন্য একটু চেষ্টা করিলাম।"

তাঁদের বাড়ির টোল পরিদর্শনের ও পারিতোষিক বিতরণের জন্যে প্রতি বৎসর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আসতেন। সেবার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন রীড নামে এক সাহেব। "রীড সাহেবকে তাঁর মোটর-লঞ্চ হইতে আমাদের বাড়ি পর্যন্ত আনার ভার পড়িল আমার উপর। তাঁর লঞ্চ থামিত আমাদের বাড়ি হইতে তিন মাইল দূরে। আমরা দুইজনে এই পথ মাঠের মধ্য দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে আসিলাম। রীড সাহেব বিলাতে কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছিলেন। পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিলাম। রীড সাহেবও তাঁর পূর্ব-পঠিত 'নল-চরিতে'র নানা শ্লোক ইংরেজি রকমের গদ্‌গদ্ উচ্চারণে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। কি কারণে জানি না, আমাকে রীড সাহেবের বেশ ভালো লাগিয়াছিল। তিনি দুইবার আমাকে বিলাত যাইবার জন্য সরকার হইতে স্টেট স্কলারশিপের ব্যবস্থা করিয়া টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন।"

পিতার একমাত্র সন্তান তিনি। এই প্রস্তাবে তাঁর পিতা বিষণ্ণ হয়ে পড়েন। তাঁকে এতদিন দূর বিদেশে রাখার কল্পনায় তাঁর পিতার মন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। বিলাত যাওয়ার কথায় সুরেন্দ্রনাথের মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কিন্তু পিতার মানসিক অবস্থা কল্পনা করে তাঁর উৎসাহ দমে যায়। "বিলাত যাইয়া বড় হইব, অনেক অর্থ উপার্জন করিব, এ রকম একটা উচ্চাভিলাষ আমার মনের মধ্যে কখনোই জাগিয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। আমি দরিদ্রের পুত্র, দরিদ্রভাবে লালিত-পালিত, বড় বড় সৌভাগ্যের স্বপ্ন আমার মধ্যে কখনোই আসিত না।"

বিলাত যাওয়ার কথা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু উপার্জনের জন্যে কিছু-একটা করতে হয়। এবার কর্মজীবনে প্রবেশের জন্যে উদ্যোগী হয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ। "যখন ডেপুটিগিরির চেষ্টায় নামিলাম তখন আমার রীড সাহেবের কাছেই যাইতে হইল। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করিয়া ঢাকায় গিয়া কমিশনার হন এবং ঢাকা হইতে আমাকে প্রথম ব্যক্তি নির্বাচিত করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার সহিত যখন আমার আলাপ-আলোচনা হয় তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি এখন বেকার হইয়া চাকুরির চেষ্টা করিতেছ, না, আর কিছু করিতেছ?' ইংরেজি দর্শনে এম. এ. পড়িবার আমার একটা ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তথাপি বেকার বসিয়া আছি এবং চাকুরি খুঁজিতেছি, এ কথা বলিতে কেমন লজ্জা করিতে লাগিল, আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, 'আমি এবার ইংরেজি দর্শনে এম. এ. দিব।' তিনি সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'তোমার লেখাপড়ার প্রতি যেরূপ অনুরাগ তাহাতে তোমার শিক্ষাবিভাগের কাজ লওয়া উচিত।' আমি বলিলাম, 'শিক্ষাবিভাগে কাজ দেয় কে?' তখন পূর্ববঙ্গে ডিরেক্টর ছিলেন শার্প সাহেব। রীড সাহেব তৎক্ষণাৎ শার্প সাহেবের নিকট আমাকে এক পরিচয়পত্র দিলেন। শার্প সাহেবের সঙ্গে দেখা করায় তিনি বলিলেন, 'চাকুরি তো এখন কোথাও খালি নাই, তবে রাজসাহীতে অল্পদিনের জন্যে একটা কাজ খালি আছে, বেতন ১০০৲ টাকা।' আমি বলিলাম, 'আমি ১০০৲ টাকার চাকুরি লইব না, ১৫০৲ টাকা হইলে লইতে পারি।' সেদিন শার্প সাহেবের সঙ্গে আলোচনা এই পর্যন্তই হয়।"

রীড সাহেবকে তিনি বলেন যে, দর্শনে তিনি এম. এ. দেবেন। এই কথা সত্য করার জন্যে বহরমপুর থেকে বই আনিয়ে পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯১০ সালে, পরীক্ষা দিয়ে ইংরেজি দর্শনে এম. এ. পাস করেন।

এবার কর্মজীবন শুরু হল সুরেন্দ্রনাথের। তিনি তিন মাসের জন্য রাজসাহী কলেজে যোগ দেন। এখানে তিনি এলেন— পরনে পুরাতন দেশী পরিচ্ছদ। ছেলেরা তাঁর এই সাজ দেখে হাসতে লাগল।

তার পর অশ্বিনীকুমার দত্তের আহ্বানে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে

যোগদানের জন্যে যান। বরিশাল ঘাটে এসে শার্প সাহেবের লঞ্চ থামে। খবর যায় সুরেন্দ্রনাথের কাছে— অবিলম্বে তাঁকে চট্টগ্রাম কলেজে যোগদান করতে হবে।

ডেপুটিগিরি তিনি পান নি, এটা একটা আশীর্বাদ। তিনি শিক্ষকতার দিকে এলেন, এইটেই তাঁর পথ। এই পথ পেয়ে দ্রুত তিনি ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সমতল দেশে পৌঁছে খরস্রোতে বয়ে চলল তাঁর জীবন-নদী।

১৯১১ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত তিনি চট্টগ্রাম গবর্নমেণ্ট কলেজে সংস্কৃত ও বাংলার সিনিয়র প্রফেসার রূপে কাজ করেন। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার ছিলেন। ১৯২২ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল হন। দুই বছর পরে ১৯২৪ সালে আই. ই. এস. হয়ে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ইংরেজি দর্শনের প্রধান অধ্যাপক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের লেকচারার-পদে নিযুক্ত হন। ১৯৩১ সালে গবর্নমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল হন। দশ বছর এই পদে তিনি সগৌরবে কাজ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবিজ্ঞান অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

এর পর তিনি বিদেশে যান। ১৯৫০ সালে বিদেশ থেকে ফিরে লখনউতে বাস করছিলেন।

১৯১১ থেকে ১৯৪৫— একটানা পঁয়ত্রিশ বৎসর তিনি তাঁর জীবনকে লিপ্ত রেখেছিলেন কাজের মধ্যে। কিন্তু এরই মধ্যে জ্ঞানান্বেষণা তাঁর থামেনি। এর বিরাম ছিল না। অধ্যাপনার সঙ্গে নিজের অধ্যয়নও সমানে চলেছে। ভারতবর্ষের সীমানা পার হয়ে তাঁর খ্যাতি পৌঁছেছে দূর বিদেশেও। পিতার মনোকষ্টের হেতু না হবার জন্যে যে বিলাত একবার প্রথমজীবনে বাতিল করেছিলেন, সেই ইঙ্গভূমি তাঁকে সম্মানে ভূষিত করেছে।

১৯২০ সালে তিনি ভারতীয় দর্শনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ-ডি. হন, ১৯২২ সালে ইংরেজি দর্শনে ডি. ফিল. হন কেম্ব্রিজের। ১৯৩৯ সালে রয়াল ইউনিভার্সিটি অব রোম তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দান করেন।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। এ ছাড়া বিভিন্ন দেশ তাঁকে নানাবিধ উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেছে— সে এক দীর্ঘ তালিকা।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সঙ্গেসঙ্গে তিনি গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন— ব্রাউনিঙ ও বের্গসঁ, বেদান্তের বাস্তবতা, নির্বাণের তাৎপর্য, তন্ত্রের দর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতির অর্থ, ক্রোচে ও বৌদ্ধধর্ম ইত্যাদি।

তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা পাঁচ খণ্ডে সমাপ্য ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হয়েছে। চারটি খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীজওহরলাল নেহরুর ব্যক্তিগত অনুরোধে তিনি পঞ্চম খণ্ড রচনা আরম্ভ করেছিলেন, প্রায় অর্ধেক লেখাও হয়েছে। এই বই তিনি আর শেষ করতে পারলেন না।

বাংলা থেকে অনেক দূরের মাটি। ছয় শ' মাইলের উপর। এত দূরে এসেছি যাঁর জীবনের কাহিনী জানতে, যদি তাঁর নিজের মুখ থেকেই সে-কাহিনী শোনা যেত— তা হলে দীর্ঘপথের এই ক্লান্তি আর ক্লান্তি বলে মনে হত না নিশ্চয়। ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। সূর্য তখন সোজা মাথার উপর। রোদ তবু তাতে নি, কিন্তু মনটা যেন তেতে উঠেছে। একটা অজানা জলের ধারা নিজের প্রাণের আবেগে কী ভাবে একটা বিশাল নদী হয়ে উঠতে পারে, সেই কাহিনীর উপকরণ নিয়ে এলাম এক্ষুনি, মন তাই চাঙ্গা ঠেকতে লাগল।

আবার সাইকেল-রিকশা, হোটেল অভিমুখে। নীচে ওই গোমতী নদী নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছে, শীতের দুপুরে গা এলিয়ে যেন রোদ পোয়াচ্ছে। হাসি পেল, নামেই নদী, কিন্তু নদীত্ব নেই এতটুকু। বাদশাবাগ পিছনে ফেলে চলে এলাম। তাতে ক্ষতি নেই কিছু, পথের দু ধারে ফুলবাগিচা, নানা রঙের পাখা মেলে দিয়ে তারা সর্বাঙ্গে রোদ মাখছে।

দার্শনিকী। প্রবন্ধ

রবি-দীপিতা। রবীন্দ্রকাব্য-আলোচনা

সাহিত্য-পরিচয়। প্রবন্ধ

কাব্য-বিচার। অলংকারশাস্ত্র

তত্ত্বকথা। ধর্মশাস্ত্র-আলোচনা

আয়ুর্বেদ। ভারতীয় ভেষজশাস্ত্র আলোচনা

ক্ষণলেখা। কাব্যগ্রন্থ

নিবেদন। কাব্যগ্রন্থ

বিজয়িনী। কাব্যগ্রন্থ

চারণী। কাব্যগ্রন্থ

চারণ। কাব্যগ্রন্থ

সৌন্দর্যতত্ত্ব। প্রবন্ধ

ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা। প্রবন্ধ

প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলা। প্রবন্ধ

অধ্যাপক। উপন্যাস

ইংরেজ

A History of Indian Philosophy. 5 vols.

A Study of Patanjali.

Yoga Philosophy in relation to other Systems of Indian Thought.

Yoga as Philosophy and Religion.

Hindu Mysticism.

Indian Idealism.

A History of Sanskrit Literature (Classical Period).

Fundamentals of Indan Art, 1954

বসু-বিজ্ঞানমন্দির। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর আরব্ধ কাজ পরিচালনা করছেন এখন ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু। ১৯৩৮ সালে জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁরই ইচ্ছা ও আগ্রহ অনুসারে দেবেন্দ্রমোহনের উপর এই বিজ্ঞানমন্দির-পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে।

বললেন, "খুব ছেলেবেলায় আমার পিতৃবিয়োগ হয়। আমার লেখাপড়ার বিষয় তাই নির্দেশ দিতেন আমার মামা— আচার্য জগদীশচন্দ্র। তাঁরই নির্দেশক্রমে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আরম্ভ করি শিবপুরে। সেখানে গিয়ে ম্যালেরিয়া হয়। অসুস্থ হয়ে ফিরে আসি। আমাকে আর শিবপুরে না পাঠানোই ঠিক হয়; কেননা শিবপুর সে সময় ছিল ম্যালেরিয়ায় ভরা। স্থির হয়, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ানোর জন্যে আমাকে পুনায় পাঠানো হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে হলে জিয়োলজি জানা দরকার। তাই জগদীশচন্দ্র ঠিক করলেন, পুনায় যাবার আগে আমার জিয়োলজি পড়া উচিত। তাই প্রেসিডেন্সি কলেজে জিয়োলজি নিয়ে বি. এস-সি.তে ভর্তি হলাম। এ হচ্ছে ১৯০৩ সালের কথা। জগদীশচন্দ্র এর কিছুদিন আগে চেতন ও অচেতন পদার্থ একই প্রকার সাড়া যে দেয়, সে সম্বন্ধে গবেষণা করে সুফল পেয়েছেন। তাঁর পুত্র ছিল না। তার আরব্ধ কাজ চালিয়ে যাবার জন্যে তিনি মনে মনে চেয়েছিলেন একজন উত্তরাধিকারী। তাই তিনি তাঁর মত পরিবর্তন ক'রে আমাকে পিয়োর সায়েন্স পড়ানো স্থির করলেন। আমি ফিজিক্স পড়া আরম্ভ করলাম। সে আমলে বিজ্ঞানচর্চার এত প্রসার হয়নি, তাই তাঁর মনে সংশয় ছিল যে, হয়তো তাঁর অবর্তমানে তাঁর কাজ নিয়ে আর কেউ অগ্রসর হবে না। ১৯০৬ সালে আমি ফিজিক্সে এম. এ. পাস করলাম।"

এম. এ. পাস করার পর এক বছর তিনি জগদীশচন্দ্রের অধীনে গবেষকরূপে কাজ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি কেমব্রিজে ক্রাইস্টস্ কলেজে যোগদান করেন, এবং কিছুদিন ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবরেটরিতে জে. জে. টমসনের অধীনে

গবেষণা করেন। ১৯১২ সালে তিনি রয়াল কলেজ অব সায়ান্স থেকে ফিজিক্সে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বি. এস-সি. অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে এক বছর সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন। এর পরেই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের ঘোষ-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঘোষ-অধ্যাপকরূপেই তিনি দু বছর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসে জার্মানী যান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় তাঁর অধ্যয়নে বাধা পড়ে। কিছুদিন পরে তিনি তাঁর অধ্যয়ন চালিয়ে যাবার অনুমতি পান, কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হলে ডক্টরেট-পরীক্ষা দিতে পারেন না। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি. উপাধি পান। সেই বছর জুলাই মাসে তিনি লণ্ডন হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষ-অধ্যাপক পদে তিনি নিযুক্ত ছিলেন ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত। এই সময় সার্ সি. ভি. রমনের জায়গায় তিনি পালিত অধ্যাপক হলেন। ১৯৩৮ সালে আচার্য জগদীশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দেবেন্দ্র-মোহন বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের ডিরেক্টর হয়ে এলেন জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারী-রূপে।

বললেন, "সেই থেকে এই মন্দিরে আছি।"

এখানে যোগদানের পর থেকে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্ভিদের শারীর-বৃত্ত সম্বন্ধে গবেষণার ক্ষেত্র প্রসারিত করার কাজে লিপ্ত। জীবের মত উদ্ভিদেরও যে চেতনা আছে, জগদীশচন্দ্র এই বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রবর্তক; দেবেন্দ্র-মোহন বিজ্ঞানের এই দিকের এখন প্রসারক।

১লা আগস্ট ১৯৫৩, ১৬ই শ্রাবণ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। ৯৩ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে বসু-বিজ্ঞানমন্দিরের প্রকোষ্ঠে ব'সে দেবেন্দ্রমোহনের জীবনের কাহিনী শুনছি।

বললেন, "আমার জীবনের কাহিনী হচ্ছে এই পল্লীর উন্নয়নের কাহিনী-টাই। আমার চোখের সামনে গড়ে উঠেছে এই পল্লীটা।"

আপার সার্কুলার রোডের এই এলাকাটি তিনি একটা বিজ্ঞান-কলোনি বলে মনে করেন। বসু-বিজ্ঞানমন্দির, সায়েন্স কলেজ, আর. জি. কর মেডিকাল

কলেজ, ব্রাহ্ম গার্লস স্কুল, বেঙ্গল কেমিক্যাল, নারী-শিক্ষা সমিতি, ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল— সব ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে এইখানেই। সে-এক দীর্ঘ কাহিনী।

১৮৮৫ সালের ২৬এ নভেম্বর (১২৯২ বঙ্গাব্দের ১২ই অগ্রহায়ণ) তারিখে কলকাতায় দেবেন্দ্রমোহনের জন্ম। পিতা মোহিনীমোহন ছিলেন হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার, হোমিয়োপ্যাথির একটা স্কুলও তিনি চালাতেন।

ময়মনসিংহ জেলার জয়সিধিতে তাঁর দেশ। পিতামহের নাম পদ্মলোচন, এবং পিতামহী উমাসুন্দরী। অল্পবয়সে তাঁর পিতামহের মৃত্যু হয়, তিনটি পুত্রের তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে পিতামহীর উপর। এই তিন পুত্র হচ্ছেন হরমোহন, আনন্দমোহন ও মোহিনীমোহন। দ্বিতীয় পুত্র আনন্দমোহন বাংলার স্বনামধন্য সন্তান আনন্দমোহন বসু— ইনি সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতে র‍্যাংলার হন, ব্যারিস্টারী পাস ক'রে ইনি দেশে ফিরে এসে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ ক'রে স্মরণীয় হয়েছেন। তৃতীয় পুত্র মোহিনীমোহন দেবেন্দ্রমোহনের পিতা; ইনিই প্রথম ভারতীয় যিনি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন, সেখানে গিয়ে তিনি হোমিয়োপ্যাথি-চিকিৎসা-বিজ্ঞান অধ্যয়ন ক'রে দেশে ফিরে এসে ডাক্তারি করেন।

বললেন, "আমরা থাকতাম ৬৪।১ নম্বর মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের একটা বাড়িতে। ১৮৮৮ সাল, যখন আমার বয়স তিন, সেই থেকে আমার বাল্যের যত স্মৃতি তার সবই এই বাড়িটাকে কেন্দ্র ক'রে। পাঁচ বিঘে জমির উপর খুব বড় একটা একতালা বাড়ি। বাড়ির মধ্যে পুকুর ছিল, খেলার মাঠ ছিল। এখানে আমার বাবা ও জগদীশচন্দ্র একত্রে বাস করতেন।"

তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠল এই বিজ্ঞান-কলোনি। মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বাড়িতে জায়গা সংকুলান না হওয়ায়, জগদীশচন্দ্র কনভেণ্ট রোডে যান, তারপর বিলেত থেকে ফিরে এসে ৮৫ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে ওঠেন। মেছুয়াবাজারের বাড়ি ও এই বাড়ি গায়ে গায়ে লাগা। ক্রমে ক্রমে ৯১, ৯২, ৯২।৩, ৯৩ ও ২৯৪— আপার সার্কুলার রোডের এই কয়টি বাড়ি উঠল— বিজ্ঞানের ও শিক্ষার পীঠস্থান হয়ে উঠল এই এলাকা।

জগদীশচন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র, দেবেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠতাত আনন্দমোহন ও লেডি অবলা বসুর পিতা দুর্গামোহন দাস একত্রে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত নানা কাজে লিপ্ত ছিলেন। তাঁরা দেশে শিল্প-প্রতিষ্ঠা করা, চা-বাগান পরিচালনা ইত্যাদি কাজেও একত্রে উদ্যোগী ছিলেন।

ভগবানচন্দ্রের দুই কন্যা অর্থাৎ জগদীশচন্দ্রের দুই ভগিনী স্বর্ণপ্রভা ও সুবর্ণপ্রভার সঙ্গে দেবেন্দ্রমোহনের জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার বিবাহ হয়। এইভাবে এই দুই পরিবার নিবিড় সম্পর্কে আবদ্ধ হন। কেবল পারিবারিক সম্পর্ক নয়, একটা অকৃত্রিম সৌহার্দ্য তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে।

বললেন, "বাবার কথা আমার খুব স্পষ্ট মনে পড়ে না। ১৯০১ সালের ২৫এ আগস্ট তারিখে তিনি দার্জিলিঙে মারা যান— আমার বয়স তখন পনেরো।"

পিতার মৃত্যুর পর তিনটি পুত্রের লেখাপড়া শেখাবার দায়িত্ব পড়ে তাঁর মাতার উপর। ক্রমে তাঁরা বড় হয়ে উঠলেন, তখন তাঁর মার অখণ্ড অবসর, তিনি সে সময় নিরাশ্রয় বা দুঃস্থদের তত্ত্বাবধানে রত থাকতেন। অনেক আত্মীয় তাঁদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে পাঠিয়ে দিতেন তাঁর মায়ের কাছে। বললেন, "মনে পড়ে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী অসুস্থ হয়ে এসে কয়েকবার ছিলেন চিকিৎসার জন্যে।"

কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে ভগবানচন্দ্র থাকতেন চন্দননগরের হুগলি-নদীর উপরেই পুত্র জগদীশচন্দ্র ও অবিবাহিত কন্যাদের নিয়ে। দেবেন্দ্রমোহন প্রায়ই নৌকায় নদী পার হয়ে সেখানে যেতেন। সে কথা এখনো তাঁর মনে পড়ে। হুগলি নদীতে বান আসত, নোঙর করা খড়-বোঝাই নৌকো সেই বানের ধাক্কায় নদীর পাড়ে দুলে দুলে উঠত।

এর পর মেছুয়াবাজার স্ট্রীটের বাড়িটি দেবেন্দ্রমোহনের পিতা ও জগদীশচন্দ্র একত্রে ভাড়া নিলেন। এই সময়ের একটা ঘটনা খুব মনে পড়ে দেবেন্দ্র-মোহনের। বহুদূর অতীতের সে স্মৃতিটা। এডিনবার্গ থেকে ফিরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এই বাড়িতে কিছুদিন ছিলেন। জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্রের সাক্ষাৎ ও বন্ধুত্ব হয় বিলেতে, সেই সূত্রেই তাঁর এখানে আসা। এর কিছুদিন

পর প্রফুল্লচন্দ্র ৯১ নম্বর আপার সার্কুলার রোডে উঠে যান, এইখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস।

বললেন, "মেছুয়াবাজারের বাড়িতে আমাদের সঙ্গে প্রফুল্লচন্দ্র খেলায় যোগ দিতেন, কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে বাগান তৈরি করতেন আমাদের সঙ্গে। বেঙ্গল কেমিক্যাল করার পরও তিনি সকাল বেলা বেড়াতে বেড়াতে আমাদের বাসায় আসতেন। তখনও তাঁর সেই বিখ্যাত ঘোড়া ও গাড়ি হয়নি— যে গাড়িতে চড়ে ময়দানে তিনি পরে রোজ হাওয়া খেতে যেতেন। বিকেলে আমাদের বাগানে বেড়াবার পর পুকুরের ধারে একটা ইজিচেয়ারে তিনি আরাম করে বসতেন। এই সময় আমাদের অনেক টুকিটাকি ফরমাশ তিনি করতেন। এ-সব কাজের ঘুষ বাবদ তিনি তাঁর বেঙ্গল কেমিক্যালে তৈরি রোজ-সিরাপ দিতেন আমাদের, আমরাও সেই লোভে তাঁর ফরমাশ খাটতাম। জগদীশচন্দ্রও চন্দননগরের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এসেছিলেন। বাইচ খেলার নৌকোটা নিয়ে এসে ছেড়ে দিয়েছিলেন পুকুরটায়। এইভাবে বিজ্ঞানীরা সব দল বাঁধলেন।"

এই সময় জগদীশচন্দ্রের আর-একটা শখ ছিল— ফটো তোলা। কানিং-হামের বই প'ড়ে তাঁর ভারতের বিভিন্ন স্থানের শিল্পকলার প্রতি টান হয়। একটা মস্ত ক্যামেরা তাঁর ছিল। জগদীশচন্দ্র ও লেডি অবলা বসু ফটো তোলার জন্যে হিমালয়ে এবং অজন্তা ইলোরা কুমায়ুন ঘুরে বেড়িয়েছেন। বাড়ির মধ্যে একটা তাঁবু খাটিয়ে জগদীশচন্দ্র ডার্করুম তৈরি করেছিলেন।

বললেন, "অনেকগুলো ছবি নষ্ট হয়ে গেছে। একটা চাকরের বোকামির জন্যে। প্লেটে ধুলো জমেছে ব'লে সেগুলো তাকে পরিষ্কার করতে বলেছেন জগদীশচন্দ্র। ভৃত্যটি বুঝতে না পেরে প্লেটগুলো চেঁছে একেবারে পরিষ্কার সাদা কাঁচ এনে হাজির। যে কয়টা বেঁচেছিল, তা এই বিজ্ঞান-মন্দিরের জানলায় লাগানো আছে।"

তাঁর স্মৃতি মন্থন করতে করতে কত ঘটনার অমৃতই উঠে আসছে, তার শেষ নেই। বললেন, "আর-একটা মজা হচ্ছে সাইকেল চালানো। জগদীশচন্দ্রের মাথায় তখন নতুন একটা প্রেরণা এসেছে— তিনি বিলেতে থাকা

কালেই একটা বড় মনোসাইকেল কিনেছিলেন, দেশে ফিরে তিনি একটা ট্রাইসাইকেল ও একটা বাইসাইকেল কেনেন। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের সকলকেই তিনি সাইকেল চালানো শেখার জন্যে উৎসাহ দিতে লাগলেন। এই দলে ছিলেন লেডি বসু, সার্ ও লেডি নীলরতন সরকার ও প্রফুল্লচন্দ্র। এঁদের সাইকেলচালানো শেখাতেন আমার দুই মামা ও জ্যাঠতুতো দাদা।"

মেছুয়াবাজারের বাড়িতে আর লোক ধরে না। জগদীশচন্দ্র কনভেন্ট রোডে উঠে গেলেন। তার পর বিলেত থেকে ঘুরে এসে ভাড়া নিলেন ৮৫ নম্বর আপার সারকুলার রোডের বাড়ি। পৃথক দুই বাড়ি হলেও পার্থক্য কিছু ছিল না, পাশাপাশি বাড়ি, মাঝের দেওয়াল ভেঙে দু বাড়িতে যাতায়াতের পথ করে নেওয়া হয়েছিল।

"এর কিছুদিন পরে আমার বাবা ও মামা জগদীশচন্দ্র আপার সারকুলার রোডের উপর পাশাপাশি দু প্লট জমি কিনে বাড়ি তুললেন, ৯২।৩ ও ৯৩ নম্বর হচ্ছে এই দুই বাড়ির।"

মেছুয়াবাজারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে জগদীশচন্দ্র কনভেন্ট রোডে উঠে গেলে বাড়ির ভিতরের মাঠে যেখানে তাঁবু খাটিয়ে ডার্করুম করা হয়েছিল, সে জায়গাটা খালি হল। দেবেন্দ্রমোহন ও জনকতক ছেলে মিলে তখন সে মাঠ খেলাধুলার কাজে লাগালেন। সাত জন সদস্য নিয়ে একটা ক্লাব হল, এক-একজন সদস্য যেন এক-একটা গ্রহ— তাঁদের ক্লাব হল সপ্তর্ষিমণ্ডল। ক্লাবের সদস্যসংখ্যা বাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। নববিধান-পল্লী থেকে ও ৭৮/১ নম্বর আপার সারকুলার রোডের কেশবচন্দ্র সেনের বাড়ি থেকে ছেলেরা এসে যোগ দিতে লাগল। আরও-সব ছেলে আসতে আরম্ভ করল ব্রাহ্ম বোর্ডিং থেকে। ফুটবল ক্রিকেট ও হকি খেলা আরম্ভ হল। তাঁর জ্যাঠা-মহাশয়ের বড় ছেলে—যাঁকে তাঁরা ঠাকুরদা ব'লে ডাকতেন, তিনি ছিলেন দলের পাণ্ডা। তাঁদের বল অনেক সময় পাশের বস্তীর চালে গিয়ে পড়ত।

বললেন, "এইজন্যে আমরা এ মাঠ ছেড়ে দিয়ে পাকাপোক্তভাবে একটা ক্লাব গঠন করে মার্কাস স্কোয়ারে খেলার ব্যবস্থা করলাম। এই ক্লাবের নাম দেওয়া হল স্পোর্টিং ইউনিয়ন। এ ঘটনা ১৯০০ সালের।"

তারপর অর্ধ শতাব্দীর উপর গত হয়েছে। তাঁদের গঠিত সে ক্লাব এখনো আছে এবং গড়ের মাঠে এখনো এই ক্লাব সুনামের সঙ্গে খেলা করে চলেছে।

দেবেন্দ্রমোহনের পরিচয় এখন বিজ্ঞানীরূপে। এখন তিনি ল্যাবরেটরির নিভৃত নেপথ্যে ব'সে গবেষণার কাজে লিপ্ত। কিন্তু তাঁর প্রথমজীবন ছিল খেলাধূলার জীবন। বললেন, "১৯০৫-৬ সালে আমি স্পোর্টিং ইউনিয়নের হকি টিমের ক্যাপ্টেন ছিলাম। ক্রিকেট হকি ও সাইক্লিংএ প্রেসিডেন্সি কলেজে দু'বার কাপ পাই। প্রেসিডেন্সি কলেজ যেবার ইলিয়ট শীল্ড পায় আমি সেবার ফরোয়ার্ডের একজন প্লেয়ার ছিলাম।"

বাড়ির মধ্যে যে বড় ছেলে তাকে ঠাকুরদা বলার রীতি পূর্ববঙ্গের। তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা হেমেন্দ্রমোহন বসুকে তাঁরা ঠাকুরদা বলতেন। দেবেন্দ্র-মোহনের জীবনে এই ঠাকুরদার প্রভাব সামান্য নয়। গত শতাব্দীর শেষ দিকের কথা— সেই সময় তাঁর ঠাকুরদা সাবান স্নো সেণ্ট তৈরি করা আরম্ভ করেন। ঠাকুরদা ছিলেন তাঁদের নেতা। প্রথমে ঠাকুরদারা থাকতেন ২৪ নম্বর মুসলমানপাড়া লেনে, পরে উঠে যান ৬ নম্বর শিবনারায়ণ দাস লেনে। এই বাড়িতে যাত্রা হত, শখের দলের থিয়েটার হত। ভাইফোঁটার দিন মহা-ধুমধাম হত। ধান-দূর্বা ও চন্দনের সঙ্গে নতুন ধুতি পেতেন তাঁরা। সেসব দিনের স্মৃতির চেয়েও সে দিনগুলি ছিল মধুরতর। ঠাকুরদা ছিলেন খুব উদ্যোগী পুরুষ। বৈঠকখানা বাজার থেকে লেন্স কিনে এনে পুরনো বাক্স দিয়ে তিনি ক্যামেরা তৈরি করতেন; এমনকি সাদা কাঁচ নিয়ে তার উপর ফটোর মশলা লাগিয়ে ফটোর প্লেট তৈরি করতেন। টেবিল আপাদমস্তক কম্বল দিয়ে ঢেকে নিয়ে তৈরি হত তাঁর ডার্করুম— তাঁর গবেষণার ল্যাবরেটরি ছিল এইটে। তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না। ক্রিকেট-খেলা, বেহালা-বাজানো, সাইকেল-চড়া, মোটরগাড়ি-চালানো, এমনকি ফোনোগ্রাফ ও গ্রামোফোন রেকর্ড তৈরি করার জন্যেও তিনি নানারকম পরীক্ষা করতেন, গবেষণা করতেন।

বললেন, "মেছুয়াবাজারের আমাদের বাড়িটা ছিল শহরের একটা নীচু জায়গায়। খুব বেশি বৃষ্টি হলে পুকুর উপচে জল মাঠে আসত। এই সময়

আমরা মাছ ধরতে লেগে যেতাম। একবার খুব বেশি বৃষ্টি হয়। রাস্তাঘাট ডুবে যায় জলে। শিবনারায়ণ দাস লেন থেকে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নিয়ে একটা নৌকো চেপে ঠাকুরদা এসে হাজির। আমরাও কলাগাছ কেটে ভেলা বানিয়ে মাঠে আর পুকুরের উপর ঘুরে বেড়াতাম।"

এই সময় তাঁদের বাসায় এসেছিলেন একজন বিদেশী অতিথি। সুইডিশ ভদ্রলোক, নাম কার্ল হ্যামারগ্রেন। তিনি রামমোহন রায় ও ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে দেশে থাকতেই কিছু কিছু পড়েন। এতে তাঁর এবিষয় ভালোভাবে জানার উৎসাহ হয়। সেইজন্যে তিনি এদেশে আসেন। ভদ্রলোক খুব ভালো সাঁতার জানতেন। মেছুয়াবাজারের পুকুরে তিনি সাঁতারের নানারকম কসরৎ দেখাতেন। ভদ্রলোক বহুভাষাবিৎ ছিলেন। তিনি ইউরোপীয় ভাষার ক্লাস নিতেন তাঁদের বাড়িতে। এই ক্লাসে অনেকে যোগ দিয়েছেন, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন হরিনাথ দে ও হেরম্বচন্দ্র মৈত্র।

বললেন, "পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এঁকে নিয়ে আসেন আমাদের বাড়িতে। ইনি নরোয়েজিয়ান ড্রামাটিস্ট ইবসেনের খুব ভক্ত ছিলেন। সেসব নাটকের ইংরেজি অনুবাদ পড়ে পড়ে আমার মাকে শোনাতেন। ইবসেন গ্যেটে ও শিলারের তাঁর অনেক বই এখনো আমাদের কাছে আছে। আশপাশের দরিদ্র ব্যক্তিদের তিনি খুব প্রিয় ছিলেন। অনেক সময় তিনি ডাব খাওয়ার জন্যে রাজাবাজার চলে যেতেন, একসঙ্গে চার-পাঁচটা ডাব খেয়ে ফেলতেন। ভদ্রলোক হঠাৎ আমাশা হয়ে মারা যান। তাঁর আর-একটা মজার কাণ্ড মনে পড়ে। কোনোরকম মুখবিকৃত না করে কিভাবে কডলিভার অয়েল খেতে হয়, তিনি আমাদের তার কায়দা দেখাতেন। এক চামচ-ভরতি কডলিভার অয়েল নিয়ে তিনি ধীরে ধীরে চুষে নিতেন এবং প্রত্যেক চুমুকের পর জিভটা শব্দ করে চেটে নিতেন। তারপর আমাদের সেইভাবে খেতে হত।"

এমনি এক পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে উঠেছেন দেবেন্দ্রমোহন। বাংলাদেশের জ্ঞানী ও গুণী যাঁরা, তাঁদেরই গায়ের আঁচ লেগেছে তাঁর গায়ে। তাই জ্ঞান ও বিজ্ঞানই হয়েছে তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন।

বললেন, "আরো দেখেছি অনেককে। জগদীশচন্দ্র যখন ৮৫ নম্বর আপার সারকুলার রোডে, তখন সেখানে এসেছেন রবীন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, সরলা দেবী, চারুচন্দ্র দত্ত, সিস্টার নিবেদিতা।"

তাঁর প্রথম বিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ে, তার পর সিটি স্কুলে। মেছুয়াবাজারের বাড়ি থেকেই তিনি এণ্ট্রান্স পাস করেন। এর পরেই তাঁদের জীবনে আসে বড় রকমের পরিবর্তন। তাঁর পিতা তখন অসুস্থ। তাঁর মা তাঁর পিতাকে নিয়ে দার্জিলিঙে ও অন্যান্য জায়গায় হাওয়া বদলের জন্যে যান। ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে মেছুয়াবাজারের বাড়ি ছেড়ে দিয়ে তাঁরা নিজেদের বাড়ি ৯২।৩ আপার সারকুলার রোডে উঠে আসেন। এর কিছুদিন বাদেই তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। পুরাতন একটা পরিবেশ ভেঙে গিয়ে নূতন পরিবেশের সূচনা হল।

বললেন, "বাবা মারা যাবার পর মামার চিন্তা হল। যাতে তাড়াতাড়ি রোজগারের পথ পেতে পারি সেই রকম শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা হল। তাই গিয়েছিলাম ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে।"

রাস্তার এপারে বসু-বিজ্ঞানমন্দির, ওপারে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, ওখানে আগে ছিল আর. জি. কর মেডিকেল কলেজ। ওটার নম্বর ২৯৪।

সায়েন্স কলেজও গড়ে ওঠে এখানেই, ৯২ আপার সারকুলার রোডে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই বৃহৎ বিজ্ঞানশালা। এই বিজ্ঞানশালা গড়ে ওঠারও ইতিহাস আছে। পার্শিবাগানের গলির উপর একটি বাগানবাড়ি; এই বাড়িটা আপার সারকুলার রোড বরাবর চলে গেছে। অর্থাৎ এই দুটি রাস্তার কোণের এই বাড়িটিতে সার্ তারকনাথ পালিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন পরিচালিত বেঙ্গল টেকনিকাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০৫ সালের কথা। সেই টেকনিকাল স্কুল ক্রমশ বড় হয়ে ওঠে। সার্ নীলরতন এই ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারী ছিলেম, তিনি এরই এক কোণের একটি আস্তাবলে একটা সাবানের কারখানা খোলেন। তখন স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। দেশে স্বাদেশিকতার হাওয়া এসেছে। স্বদেশী শিল্প প্রসারের জন্যে তাই এই উদ্যোগ। সেই টেকনিকাল স্কুলটা শেষে যাদবপুরে উঠে যায় এবং

এখন সেটা বৃহৎ এক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সার্ তারকনাথ এই বাগান-বাড়িটা বিজ্ঞানচর্চার একটা কেন্দ্রে পরিণত করার জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। আজ তা-ই হয়ে উঠেছে এই বিরাট বিজ্ঞান-কলেজ।

বললেন, "এইভাবে গড়ে উঠল এই বিজ্ঞান-কলোনি আমাদের চোখের সামনে। গড়ে উঠল নারীশিক্ষা-সমিতি, ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব্ স্কুল।"

ডক্টর দেবেন্দ্রমোহন বসু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় অতি জটিল। অবৈজ্ঞানিক ভাষায় তা প্রকাশ করাও সহজ নয়। লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে এঁকে এঁকে তিনি তাঁর গবেষণার বিষয় বুঝিয়ে দিলেন। যেটুকু বুঝলাম, তার বেশিই অবোধ্য রয়ে গেল।

তাঁর গবেষণার বিষয় মোটামুটিভাবে চারটি। প্রথম, বৈজ্ঞানিক সার্ চার্লস ডারউইন আঙ্কিক পদ্ধতিতে গবেষণা করে প্রমাণ করেন যে, পরমাণুর কেন্দ্রে যে শাঁস থাকে, যাকে নিউক্লিয়াস বলে, তার সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ক্ষুদে ক্ষুদে অণুকণিকার স্থানচ্যুতি ঘটে। এটা ছিল কাগজে-কলমে হিসেব করা একটা প্রমাণ। দেবেন্দ্রমোহন তার চাক্ষুষ প্রমাণ উপস্থিত করলেন। তিনি হাইড্রোজেন গ্যাস ভরতি একটা কাঁচের নলের (সিলিণ্ডার) মধ্যে দিয়ে দ্রুতগামী আলফা-রশ্মি ছুঁড়ে দিয়ে তার ছবি তুললেন। এই ছবিতে তিনি দেখাতে পারলেন, সেই রশ্মির অণুগুলি হাইড্রোজেন-পরমাণুর অভ্যন্তরের শাঁসের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে কিভাবে বিচ্ছুরিত হয়েছে। তাঁর ফটোপ্লেটে এই বিচ্ছুরণের গতিপথের চিহ্ন আঁকা হয়ে গেল। ১৯১৬ সালে তিনি এই প্রমাণ দাখিল করেন। তাঁর গবেষণার দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে— আসলে চুম্বক নয়, কিন্তু চৌম্বক ধর্ম আছে এমন পদার্থের এবং বিরলমৃত্তিক— যাকে বৈজ্ঞানিকেরা বলেন রেয়ার আর্থ— পদার্থের ধর্ম ও রীতি নিরূপণ করা। ১৯২৫ সাল থেকে তিনি এই কাজে লিপ্ত। আলোক শোষণ করার ফলে এইসব বিরলমৃত্তিক ও চৌম্বক পদার্থের কি পরিবর্তন ঘটে তার পরিমাপ করা ছিল তাঁর গবেষণার অন্তর্গত। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণা করে সিদ্ধান্ত করেন যে, ইলেকট্রনেরা আবর্তিত হয়। এর থেকে একটা কথা উঠল যে, তড়িৎযুক্ত পদার্থের যদি বেগ থাকে তাহলে

তাতে চৌম্বকধর্ম দেখা যায়। ১৯২৫ সালে বৈজ্ঞানিক হুন্ড্ বিভিন্ন পদার্থ বিভিন্ন কক্ষে রেখে তাদের ইলেকট্রনের বেগ হিসেব করে তাদের চৌম্বকশক্তির পরিমাপ করলেন। কিন্তু হুন্ডের এই হিসেব সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হল না— লোহা ও লৌহগোষ্ঠীর পদার্থের চুম্বকশক্তি এতে নির্ণয় করা গেল না। ১৯২৭ সালে দেবেন্দ্রমোহন প্রমাণ করে দেখালেন যে, কোনো মৌলিক পদার্থের বাইরের কক্ষে যে ইলেকট্রনেরা ঘোরে তার জন্যে চৌম্বক ধর্মের উৎপত্তি হয় না, তারা যে পাক খেতে খেতে ঘোরে সেই আবর্তনের জন্যই এই ধর্মের উৎপত্তি হয়। দেবেন্দ্রমোহনের এই সিদ্ধান্তে একটা সমস্যার মীমাংসা হল। এর পরে বৈজ্ঞানিক স্টোনার এইরূপ চৌম্বক ধর্মের উৎপত্তির কারণ নির্দেশ করলেন। এই সিদ্ধান্ত বর্তমানে বসু-স্টোনার সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। তাঁর তৃতীয় গবেষণা কস্‌মিক রে অর্থাৎ নভোরশ্মি নিয়ে। ফটোগ্রাফিক ইমালশনের ভিতর দিয়ে নভোরশ্মির কণিকা গেলে সেই ফটোপ্লেটে তার গতিপথ ধরা পড়ে। ১৯৩৮ সালে দেবেন্দ্রমোহন যখন এই গবেষণা আরম্ভ করেন, তখন সকলের ধারণা ছিল যে, ফটোগ্রাফিক ইমালশনে কেবল দ্রুতগামী আণবিক নিউক্লিয়াসের গতিপথই ধরা পড়ে, প্রোটনের চেয়ে হালকা কণিকার গতিপথ ধরা পড়ে না। দারজিলিঙের নিকটবর্তী বারোহাজার ফুট উচ্চ সান্দাকফুতে দেবেন্দ্রমোহন কতকগুলি ফটোপ্লেট রেখে দেন ছয় মাস। এর পরে সেই প্লেট ডেভলপ করে দেখলেন যে কতকগুলি বক্ররেখা তাতে ধরা পড়েছে। এই রেখা প্রোটন ইত্যাদির জন্য হতে পারে না। এই গতিপথ এঁকে গেছে যে রশ্মির কণা, তিনি তার ভর নির্ধারণ করার এক উপায় উদ্ভাবন করে দেখলেন যে, এই কণিকাগুলির ভর হল ২১৫। কয়েক বছর আগে উইলসন চেম্বারের সাহায্যে মেসনের ভর মাপা হয়েছিল। এই দুই ভর প্রায় কাছাকাছি পাওয়া গেল। এতে সর্বপ্রথম প্রমাণিত হল যে, ফটোগ্রাফিক ইমালশনে মেসনের গতিপথ ধরা পড়ে এবং তার ভর মাপা যায়। দেবেন্দ্রমোহন তাঁর এই গবেষণার জন্য যে ফটোপ্লেট ব্যবহার করেন, তা খুব উচ্চাঙ্গের নয়— সাধারণত বাজারে যে প্লেট পাওয়া যায় তাই তিনি ব্যবহার করেন। যদি তিনি আরো নিখুঁত প্লেট পেতেন তাহলে তাঁর এই গবেষণা আরও অগ্রসর

হত। কেননা, তাঁর গবেষণার এই সূত্র ধরে বৈজ্ঞানিক পাওয়েল নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৪৬ সালে পাওয়েল ইলফোর্ড কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত-গবেষণায় নূতন ফটোগ্রাফিক ইমালশন তৈরি করিয়ে তার দ্বারা এই গবেষণা চালিয়ে যান। এতে তিনি সুফল পান। ভারী ও হাল্কা এই দুই প্রকার মেসনের গতিপথের চিহ্ন তিনি পেয়ে যান তাঁর প্লেটে। দেবেন্দ্রমোহন কেবল হাল্কা মেসনের গতিপথই পেয়েছিলেন এবং তার ভর নির্ধারণ করেছিলেন। দেবেন্দ্রমোহনের চতুর্থ গবেষণার বিষয় উদ্ভিদের শারীরবৃত্ত। বসু-বিজ্ঞান-মন্দিরের পরিচালন-ভার গ্রহণ করার পর থেকে তিনি এই বিজ্ঞানাগারটি উদ্ভিদবিজ্ঞানের একটি উচ্চশ্রেণীর গবেষণাকেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছেন।

মানুষের গায়ে আঘাত করলে যেমন তার প্রতিক্রিয়া হয়, গাছেদেরও তাই হয়— জগদীশচন্দ্র তা প্রমাণ করে গেছেন। সেই কাজ সম্প্রসারিত করে এবং সে বিষয়ে গবেষণার ধারা আরো ব্যাপক করাই বৈজ্ঞানিক দেবেন্দ্রমোহনের বর্তমান কাজ। গাছকে (লজ্জাবতী লতা— Mimosa pudica) আঘাত করলে সে তার সাড়া দেয়, কিন্তু সাড়া দেবার এই শক্তি সে আহরণ করে কোথা থেকে, এবং কোনো কোনো গাছের (বনচাঁড়াল—Desmodium) পাতা কোনো আঘাত না পেয়ে নিজে থেকেই কাঁপে, তারাই-বা কম্পনের এই শক্তি কোথা থেকে পায়, এইসব বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করছেন দেবেন্দ্রমোহন। জগদীশচন্দ্র তাঁর যে বৈজ্ঞানিক উত্তরাধিকারী চেয়েছিলেন, সে উত্তরাধিকারী জগদীশচন্দ্র পেয়েছেন।

লতা-পাতা-গাছ নিয়ে গবেষণা করে তাঁরা লতাগুল্মের সংসারের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছেন বলা যায়। বৃক্ষবংশের খুঁটিনাটি বিষয় এখন তাঁদের নখদর্পণে।

বললেন, "হস্তিনাপুর-নগরীর দরজা-জানালা নাকি পাওয়া গেছে। সে-কাঠ এখন আর কাঠ নেই, তার রকম বদলেছে, ধর্ম বদলেছে। কিন্তু সেই দরজা-জানলা পরীক্ষা করলেই তাদের বয়স বলে দেওয়া যাবে। মহাভারতের কাল নিরূপণে তাহলে আর কষ্ট নেই।"

হস্তিনাপুরের দারুশিল্পীরা তাঁদের শিল্পের নিদর্শন রেখে গেছেন কতদিন আগে তা বর্তমান কালের দারুবৈজ্ঞানিকরা সহজেই হিসেব করে বার করে দেবেন।

দেবেন্দ্রমোহন ১৯২৭ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন। সেই বৎসরই তিনি ইটালীতে ভল্টা শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পদার্থ-বিজ্ঞানসম্মেলনে যোগদান করেন। ১৯৫৩ সালে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। এই সময় তিনি যে অভিভাষণ দেন, তাও এই চেতন ও অচেতন পদার্থের বিবর্তন সম্বন্ধে। তাঁর এই বৈজ্ঞানিক অভিভাষণের ছত্রে ছত্রে তাঁর ঐতিহাসিক জ্ঞান ও সাহিত্যিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীনতা-অর্জনের পর ভারতের বিভিন্ন সমস্যার বিষয় এবং সেই সমস্যা সমাধানে কিভাবে বৈজ্ঞানিকেরা কাজে লাগতে পারেন, সে বিষয়ে উল্লেখ করে তিনি তাঁর স্বদেশচিন্তারও পরিচয় দিয়েছেন।

জগদীশচন্দ্রের দুই ভগিনী স্বর্ণপ্রভা ও সুবর্ণপ্রভার পরিচয় আমরা পেয়েছি। অপর দুই ভগিনীর প্রসঙ্গ উঠতে দেবেন্দ্রমোহন বললেন, "আমার এই দুই মাসিমার কথা মনে পড়ে। হেমপ্রভা বসু বটানিতে এম. এ. পাস করেন— তিনিই এদিকে সর্বপ্রথম মহিলা যিনি এরূপ সম্মান পেয়েছেন। দ্বিতীয় জন লাবণ্যপ্রভা সরকার— তাঁর রচনার সঙ্গে একালের লোকের হয়তো তেমন পরিচয় নেই, কিন্তু সেকালে তাঁর খ্যাতি ছিল; মেয়েদের হাতে এমন সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা বেশি দেখা যায় না।"

বৈজ্ঞানিক দেবেন্দ্রমোহন গবেষণাগারেই কেবল নিজেকে বন্দী রাখেন নি। বিজ্ঞানসাধনার সঙ্গেসঙ্গে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজেকে জড়িত রেখেছেন। সিটি কলেজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, এশিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। তিনি ষোলো বছর বিশ্বভারতীর অবৈতনিক কোষাধ্যক্ষ ছিলেন; ১৯৪৮ সালে তিনি এই পদ ত্যাগ করেন।

বললেন, "বাংলাদেশের অনেক জায়গায় আমি ঘুরেছি। ডক্টর হরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায় যখন ইন্সপেক্টর অব কলেজেস্ আমি তখন টাটকা বিলেত থেকে ফিরেছি। সার্ আশুতোষের নির্দেশে আমি তাঁর সঙ্গেসঙ্গে ঘুরি। চট্টগ্রাম ময়মনসিংহ ঢাকা পাবনা বাঁকুড়া দার্জিলিং দৌলতপুর ইত্যাদি জায়গায় গিয়েছি। বিভিন্ন কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয়েছে।"

দেবেন্দ্রমোহন কেবলমাত্র বিশেষ একটি বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বলেই পরিগণিত নন, তাঁর প্রতিভা কোনো সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ নয়। এই জন্যে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁকে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়। তিনি তাঁর মন ও প্রতিভা প্রয়োগ করে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুফল লাভ করেছেন।

রচিত গ্রন্থ

J. C. Bose's Plant Physiological Investigation in Relation to Modern Biological knowledge.

কাশী। কাশীতেই চলেছি। কিন্তু কাশী স্টেশনে নামলাম না। নামলাম বেনারসে— বারাণসীতে। এক দিকে বরুণা, আর-এক দিকে অসী, এই নিয়েই বারাণসী।

একটু আগে কাশী দেখেছি। ট্রেন তখন ছিল গঙ্গার ব্রিজের উপর। অর্ধবৃত্তাকার গঙ্গার স্বচ্ছ ধারার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে অগণিত মন্দিরের মিছিল। মনে হয়েছিল এ শহর কেবলই হয়তো মন্দিরে গড়া। কিন্তু তা নয়। এখানে আছে মন্দির, আর আছে মানুষ।

এই বারাণসী। পোরবন্দর থেকে ব্রহ্মপুত্র, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা— এই বিরাট ভারতভূমিতে কত বিভিন্ন ভাষা, কত বিভিন্ন অধিবাসী, কত বিভিন্ন ধর্ম ; সর্বসমন্বয়ের মহাতীর্থ এই মহাদেশ—এই ভারতবর্ষ। ভারতের সর্বপ্রান্ত থেকে নিজ ভাষা ও ধর্ম, সমাজ ও সংস্কার নিয়ে এই বারাণসীতে এসে পাশাপাশি বাস করছে বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষ। এ হচ্ছে ভারতেরই সংহত সংক্ষিপ্তসার, এ হচ্ছে ভারতেরই নির্যাস— অণু-ভারতভূমি। ভারতের ধর্মধানী ও পাণ্ডিত্যের মহাদুর্গ বলে কীর্তিত হয়েছে এই পীঠস্থান। যাবনিক অত্যাচারে খর্ব হয় নি এর মহিমা, বিশ্বনাথের মন্দিরের পাশেই স্থান পেয়েছে মসজিদের মিনার। উপকণ্ঠস্থ সারনাথের মৃগদাব কানন একদা ভস্মীভূত হয়েছে, পুনরায় সব ভস্ম সরিয়ে জেগে উঠেছে পুরাতন কীর্তি। যে উন্নত মন্দিরচূড়া অত্যাচারীর আঘাতে চূর্ণ হয়েছে, সে চূড়া পুনরায় আকাশচুম্বী হয়ে ওঠে নি বটে, কিন্তু অনুন্নত চূড়াবলম্বী সেই মন্দির মর্যাদায় আজো অভ্রভেদী। সহিষ্ণুতার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বারাণসী, ভারতের প্রতিনিধিরূপে। এই পীঠস্থানে এসেছি তীর্থে— মনীষী-সন্দর্শনে।

বেনারস স্টেশন থেকে টাঙ্গা নিলাম। শহরের দিকে চলেছি। কিছুক্ষণ যাবার পর ডানে দেখলাম, মন্দির নয়, একটা গীর্জা। আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ল বাঁয়ে একটি গৃহের ফটকের স্তম্ভের গায়ে শ্বেতপাথরের

উপর কালো হরফে লেখা— মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এম. এ.। এইটে তাঁর বাড়ি। টাঙ্গা গড়িয়েই চলল সোনাপুরার দিকে। ওঁর বাড়িটা হঠাৎ চোখে পড়ে গেল, চিনে রাখলাম। স্নানাহার সেরে বিকেলের দিকে দেখা করব, আগে থেকেই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম।

'উত্তরা' মাসিক পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী আমাদের হয়ে আগেই শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে কথা বলেছিলেন, তাই বিকেলের দিকে ভেলুপুরায় গেলাম প্রথমে তাঁর কাছে। তাঁকে সঙ্গে পেয়ে অনেক সুবিধে হল। তিনি উদ্যোগী ও উৎসাহী পুরুষ। এসব কাজে তাঁর উৎসাহ আবার একটু বেশি। গুণীর কদর যে করতে জানে, সেও যে একজন পরম গুণী, এই কথাই মনে হচ্ছিল বার বার।

২১এ ডিসেম্বর ১৯৫২, ৬ই পৌষ ১৩৫৯, রবিবার বিকেল। চারটে প্রায় বাজে। দোতলার একটি নিভৃত ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন গোপীনাথ। প্রস্তুত ছিলেন না তিনি। তাঁর সঙ্গে দেখা করব এই খবরটাই জানানো হয়েছিল ; দিন স্থির করে কিছু বলা ছিল না।

বললেন, "আপনি যা-যা জানতে চান, তা বলতে তো অনেক সময়ের দরকার।"

বললাম, "আজ যতটা হয়, তাই হোক। কাল সকালে বাকিটা—"

কিন্তু পরদিন তাঁর মৌন দিবস। এবং সেই দিনই আমারও লখনউ রওনা হবার কথা। সুতরাং, তিনি একটু চিন্তা করলেন। তারপর কি কি জানতে চাই জিজ্ঞাসা করলেন।

শুনে বললেন, "আমার জন্ম ১৮৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে [বঙ্গাব্দ ১২৯৪ শ্রাবণ] ঢাকা জেলার ধামরাই গ্রামে। ঐ স্থানে আমার মাতুলালয়। আমার পিতৃভূমি ময়মনসিংহ জেলার টাঙাইলের মাইল তিন দূরের দান্যা গ্রামে। আমার পিতার মাতুলালয় ঐ জেলাতেই কাঁঠালিয়া গ্রামে। আমার পিতা তাঁর মাতুলের কাছেই মানুষ। আমারও বাল্যজীবন কাটে পিতার মাতুলালয়েই —কাঁঠালিয়ায়। আমরা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কৌলিক উপাধি বাগচী। 'কবিরাজ' নবাবী আমলের খেতাব।"

তাঁর পিতৃভূমি দাম্ভার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব বেশি না। স্কুল-জীবনের বেশির ভাগ— অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত— কাঁঠালিয়া ও ধামরাইতেই অতিবাহিত হয়। ধামরাইয়ের কথা তাঁর মনে পড়ে আজও। কিশোর-জীবনের উপর যে ছাপ রেখে গেছে ধামরাই, আজ জীবনের এই প্রদোষেও সে ছাপ সামান্যতম অস্পষ্ট হয় নি। এখানকার রথ বিখ্যাত রথ। চৌষট্টি চাকার বিরাট রথ এখানকার। পুরীর জগন্নাথ-ক্ষেত্রের আনন্দবাজারে যেমন ভোগ বিক্রি হয়, এখানেও তেমনি হয়। এ স্থানটি অতি প্রাচীনকালে একটি বৌদ্ধবিহার ছিল, বৌদ্ধদের তীর্থ-স্থান ছিল। এর নাম আগে ছিল ধর্ম-রাজিকা, সেই নাম এখন হয়েছে ধামরাই। এখন এটি পূর্ববঙ্গের একটি বৈষ্ণব তীর্থস্থান। এখানকার প্রধান দেবতা যশোমাধব— চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্তি। গোপীনাথের মাতুলবংশ এরই সেবায়েত। এই তীর্থস্থানে জন্মগ্রহণ করেন গোপীনাথ। দ্বিতীয় আর-এক তীর্থে— বারাণসীতে— এখন তিনি জীবন অতিবাহিত করছেন।

বললেন, "পিতাকে দেখি নি। আমার জন্মের কয়েক মাস আগে আমার পিতা লোকান্তরিত হন। কেবল দেখেছি আর চিনেছি আমার মাকে, তিনিই একাধারে ছিলেন আমার পিতা ও মাতা। মাতার নাম সুখদাসুন্দরী। তিনিও শৈশবে পিতৃমাতৃ-স্নেহ পান নি, জন্মাবার কিছুদিন পর থেকেই তিনিও অন্যগৃহে লালিত-পালিত।"

১৮৮৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স প্রবর্তিত হয়। সেই বছর তাঁর পিতা বৈকুণ্ঠনাথ কবিরাজ প্রথম-বিভাগে প্রথম হয়ে সংস্কৃত অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন। এরই বছর-দুই পরে অকালে তিনি মারা যান। পিতৃহীন গোপীনাথ মাতার স্নেহে ও মমতায় লালিত হতে লাগলেন। পিতার মাতুলালয় কাঁঠালিয়াতে ও নিজের মাতুলালয় ধামরাইয়ে তিনি তাঁর বাল্যের শিক্ষা সমাপ্ত করলেন।

"ধামরাই থাকা কালেই আমি আমার সাহিত্যিক জীবনের একটি জীবন্ত আদর্শ প্রাপ্ত হই। ইনি ধামরাই-নিবাসী শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত। আমি যখন ধামরাই স্কুলে পড়ি, তখন ইনি ঢাকা কলেজে পড়তেন। মাঝে মাঝে

প্রায়ই বাড়ি আসতেন। তখন তাঁর সঙ্গসুখ অনুভব করতাম ও তাঁর কাছ থেকে বহু বিষয়ে জ্ঞানলাভ করতাম। বাংলা ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর প্রবল অনুরাগ ছিল, ব্যুৎপত্তিও ছিল অগাধ। সিদ্ধান্তকৌমুদী তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আমি রবীন্দ্রসাহিত্যের আস্বাদ প্রথমে তাঁর কাছে থেকেই লাভ করি। তিনিই আমাকে সর্বপ্রথম মোহিত সেনের সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের 'কাব্যগ্রন্থ' কিনে দেন। আজ তিনি আমার ধর্মজীবনে গুরুভ্রাতা। তারপর আসি ঢাকায়। সেখানে জুবিলি স্কুলে ভর্তি হই। এখানে আমাদের হেডপণ্ডিত ছিলেন রজনীকান্ত আমিন, ইনি আমার জীবনে সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তির বীজমন্ত্র দেন। এঁর কাছে পড়ি পাণিনি ও সিদ্ধান্তকৌমুদী। আমার নৈতিক জীবনের আদর্শ লাভ বিশেষভাবে যাঁর কাছ থেকে, তিনি ঐ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মথুরাবাবু—ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের অধ্যক্ষ মথুরামোহন চক্রবর্তী। তা ছাড়া, জুবিলি স্কুলের অন্যতম শিক্ষক নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নৈতিক জীবনের প্রভাবও আমার উপর কম পড়ে নি।"

ঢাকার জুবিলি স্কুল থেকে ১৯০৫ সালে তিনি এনট্রান্স পাস করেন। বাল্যজীবনেই সংস্কৃত শিক্ষার আকর্ষণ লাভ করা গিয়েছে এবং নৈতিক জীবনের আদর্শও; এবার প্রয়োজন উচ্চতর শিক্ষার। কিন্তু পিতৃহীন যুবকের জীবনে এবার দেখা দিল কঠিনতর সংকট। উচ্চশিক্ষালাভ করার মত আর্থিক সংগতি নেই। পিতার মাতুল ছিলেন কিছুটা সহায়, তিনিও কিছুদিন পূর্বে পরলোক-গমন করেছেন।

এনট্রান্স পাস করার পর পুনঃপুনঃ ম্যালেরিয়ায় ভুগে তাঁর এক বৎসর সময় নষ্ট হয়। তাই ১৯০৫ সালে কলেজে ভর্তি হতে পারেন নি।

বললেন, "পর বৎসর, ১৯০৬ সালে, কলকাতায় আসি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী আমার পিতৃবন্ধু ছিলেন। কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে কলকাতায় পড়ার পরামর্শ দিলেন।"

কিন্তু তাঁর ভয় হল ম্যালেরিয়ার। বাংলা দেশটাই তখন ম্যালেরিয়ায় ভরা ছিল। তাই তিনি পশ্চিমে যেতে ইচ্ছা করলেন। কাছে-ভিতে কোথাও না, মধুপুর-জসিদি বা সাসারম নয়।

বললেন, "যাই জয়পুরে। হিন্দী জানি নে, কাউকে চিনি নে। জীবনে সে একটা অ্যাডভেঞ্চার। আর, আসলে এই অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁকটাই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল এত দূরে। তা ছাড়া, রাজস্থানের প্রাচীন গৌরবের আকর্ষণ তো ছিলই। তখন যে স্বদেশী-আন্দোলনের যুগ।"

কিন্তু সহায় একটা জুটে যায়ই। উদ্যোগী যে, তার জীবনের কোনো সংকটই সংকট নয়। এখানে এসেও গোপীনাথ সহায় পেয়ে গেলেন।

"রাও বাহাদুর সংসারচন্দ্র সেন তখন জয়পুর-স্টেটের প্রধানমন্ত্রী। সংসার-বাবুর বড় ছেলে অবিনাশবাবুর দুই ছেলের প্রাইভেট টিউটার হয়ে সেখানে থাকি এবং মহারাজা কলেজে ভর্তি হই। এখানে কলেজের পাঠ্য শেষ করি, ফার্স্ট ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত।"

এখানকার কলেজের ভাইসপ্রিন্সিপাল ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মেঘনাথ ভট্টাচার্য। এঁর সঙ্গে যোগাযোগ হল। মেঘনাথবাবু বাংলা সাহিত্যের প্রতি প্রবল অনুরাগী ছিলেন— পুরাতন সাহিত্য-পরিষদ-পত্রিকা অর্চনা প্রভৃতিতে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সেই অনুরাগ গোপীনাথের মধ্যে ক্রমশ সঞ্চারিত হল। আর তা ছাড়া ইতিহাসের প্রতি হল আকর্ষণ।

মেঘনাথবাবু পারস্য-ইতিহাস খুব ভালো জানতেন। তাঁর কাছ থেকে ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হই। আর, তাঁর কাছ থেকে পাই বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য এবং শুনি অনেক ব্যক্তিগত গল্প।

হুগলী নদীর এপারে নৈহাটি, ওপারে চুঁচুড়া। জয়পুর যাওয়ার পূর্বে যখন মেঘনাথবাবু নৈহাটিতে থাকতেন, বঙ্কিম তখন চুঁচুড়ার ডেপুটি। মেঘনাথ-বাবু চুঁচুড়ায় মাস্টারি করতেন, যাতায়াত করতেন নৈহাটির বাড়ি থেকে। নৌকায় নদী পার হয়ে মেঘনাথবাবু বঙ্কিমবাবুর বৈঠকখানায় বসে গল্প করতেন। সাহিত্যিক চর্চাই প্রায় হত। আনন্দমঠ রচনার প্রথম সূচনা নাকি ঐখানেই হয়েছিল। বঙ্কিমবাবু বলে যেতেন, মেঘনাথবাবু লিখতেন। গোপীনাথ সেইসব গল্প মেঘনাথবাবুর কাছ থেকে শুনেছেন।

স্কুলজীবন থেকেই সাহিত্যানুরাগ গোপীনাথের ছিল। তার উপর মেঘনাথবাবুর সংস্পর্শে এসে সে অনুরাগ গভীরতর হয়। বঙ্কিমের ব্যক্তিগত গল্প শুনতে এই কারণেই তাঁর প্রবল আগ্রহ হয়।

বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' বের হয় ১২৭৯ বঙ্গাব্দে কাঁঠালপাড়া থেকে, তার দুই বছর পরে ১২৮১ সনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী পত্রিকা কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' বের হয় ঢাকা থেকে। দুই পত্রিকাই মাঝে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর একই বছরে ১৩০৮ সনে পত্রিকা দুটি নবপর্যায়ে পুনঃপ্রকাশিত হয়, 'বান্ধব' কালীপ্রসন্ন ঘোষেরই সম্পাদনায় এবং 'বঙ্গদর্শন' রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়।

"এই সময় আমি বান্ধবে কবিতা লিখি। তখন আমি ছাত্র। বান্ধব কার্যালয়ের কাছেই আমাদের বাসা ছিল। কালীপ্রসন্নবাবুর দৌহিত্র সুবোধ আমার সমবয়স্ক বন্ধু ছিল। তার সঙ্গে মাঝে মাঝে তার দাদামশায়ের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। তাঁর 'নিশীথ চিন্তা' ও 'নিভৃত চিন্তা'র অনেক প্রবন্ধ আমার কণ্ঠস্থ ছিল। তারপর ধূমকেতুতে কবিতা লিখি। এই পত্রিকা ঢাকা থেকে বের হত। ময়মনসিংহের আরতিতে লিখি কবিতা ও প্রবন্ধ। বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে বিবাহ-উপলক্ষ্যে প্রীতি-উপহার লিখে দিতাম। আসল কথা, সাহিত্যের প্রতি আমার টান প্রায় শিশুকাল থেকেই। জয়পুরে মেঘনাথবাবুর সান্নিধ্যে সেই আকর্ষণ প্রবলতর হয়।"

জয়পুর মহারাজা কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নবকৃষ্ণ রায় গোপীনাথের ইংরেজির প্রতি অনুরাগ দেখে প্রীত হন। একদিন ক্লাসে ওয়ার্ডসওয়ার্থের The world is too much with us কবিতাটির ব্যাখ্যা লিখতে দেন। গোপীনাথ যেভাবে ব্যাখ্যা করেন তাতে নবকৃষ্ণবাবু তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হয়।

এখানে এসেও কবিতা-রচনার প্রতি কোনোরূপ শিথিলতা দেখা দেয় নি। পূর্ণোদ্যমে কবিতা লিখতেন—স্টুডেন্টস ম্যাগাজিনে তার কিছু কিছু প্রকাশিত হত। তখন কবিতা লেখার শখ এমন প্রবল হয়েছিল যে বন্ধুদের সঙ্গে চিঠিও লিখতেন কবিতায়। এই প্রসঙ্গে তিনি কলকাতার তাঁর এক বন্ধুর নাম করলেন — শ্রীমণীন্দ্রনাথ, এঁর সঙ্গেই কবিতা-রচনা প্রসঙ্গে পত্রালাপ বেশি হয়েছে।

গোপীনাথ সংস্কৃতজ্ঞ মহাপণ্ডিত বলে খ্যাত হয়েছেন। সংস্কৃতসাহিত্য-সিন্ধু মন্থন করেছেন তিনি। কিন্তু বাল্যজীবনে তাঁর অনুরাগ ইংবেজি সাহিত্যের প্রতিও কম ছিল না। ছাত্রজীবনে তিনি বিভিন্ন ইংরেজ কবির রচনা পাঠ করতেন। গদ্যের মধ্যে এমারসন তাঁর প্রিয় ছিল।

"শেলি কীটস পড়ি, কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগত ওয়ার্ডসওয়ার্থ। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ নিয়েই মেতে থাকি। সহপাঠীদের পড়ে শোনাই। স্কুল থেকেই বায়রন স্কট শেলি কীটস সংগ্রহ করেছিলাম। চসার থেকে টেনিসন অবধি— সব।"

সংকীর্ণ শক্তির অধিকারী তিনি নন, তাই তাঁর আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা পাখা মেলে দিয়ে উড়তে চাইত। যখনই যেখানে পেতেন একটি আশ্রয়-প্রশাখা, তখনই তার উপর ভর দিয়ে বিশ্রাম করে নিতেন। জয়পুরে মেঘনাথবাবুর সংসর্গে এসে বঙ্গসাহিত্যের উৎসাহী অনুরাগী হয়েছেন, ঠিক তখনই নবকৃষ্ণ-বাবুর সঙ্গে তিনি গভীরভাবে ইংরেজি সাহিত্যের রসাস্বাদনে ব্যস্ত। আবার এই সময়ই তাঁর দৃষ্টি পড়ে অন্যত্রও।

"জয়পুর সাধারণ গ্রন্থাগারে ও ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী কান্তি মুখোপাধ্যায়ের বিশাল গ্রন্থালয়ে বসে বসে পড়তাম। বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে ভারতের প্রত্নতত্ত্বের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে। তখন নিভৃত লাইব্রেরী-কক্ষে বসে আমি প্রত্নতত্ত্বান্বেষণ করতাম। আর করতাম প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলন। কান্তিবাবুর সংগ্রহ এই বিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল।"

জয়পুরে চার বছর কাটিয়ে সেখান থেকে তিনি বি. এ. পাস করলেন। তারপর এলেন কলকাতায়। কলকাতায় এসে ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সঙ্গে দেখা করলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ গোপীনাথকে পালিতে এম. এ. পড়ার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু কলকাতা সম্বন্ধে গোপীনাথের আতঙ্ক আছেই— ম্যালেরিয়াতঙ্ক। কলকাতায় থেকে পড়াশুনা করায় তাই তিনি মনে মনে সায় দিতে পারলেন না।

১৯১০ সালে তিনি প্রথমে কাশীতে আসেন। এই কাশীই তাঁর জীবনের ধারা নিয়মিত করেছে বলা চলে। জীবনে তিনি মনোমত একটা গতি লাভ করলেন এখানে, যে গতি তাঁর জীবনে এখনো অব্যাহত। ঢাকায় জুবিলি

স্কুলের হেডপণ্ডিত মহাশয় তাঁর জীবনে বিদ্যার যে বীজ উপ্ত করেছিলেন সেই বীজ থেকে ইতিমধ্যে অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল, এবার কাশীতে এসে তা সফল মহীরুহে পরিণত হবার উপযুক্ত উর্বরক্ষেত্র লাভ করল।

ডক্টর আর্থার ভেনিস তখন কাশীর কুইন্‌স কলেজের সংস্কৃত ও ইংরেজি শাখার প্রিন্সিপাল। এই কলেজে এম. এ. পড়ার জন্যে গোপীনাথ এলেন। কিন্তু কোন্ বিষয়ে তিনি এম. এ. পড়বেন তা তিনি তখনও স্থির করে উঠতে পারেন নি। তাঁর অনুরাগ তখন ছিল ত্রিধারায় বিভক্ত।

জয়পুরের লাইব্রেরীতে বসে তিনি প্রত্নতত্ত্বের বই ঘেঁটে ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি অনুরক্ত হয়েছেন ; আর ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর টান ছিলই ; সেই সঙ্গে ঢাকা জুবিলি স্কুলের হেডপণ্ডিত মহাশয়ের শিক্ষাটাও তাঁর মনে আছে। দর্শনে অনুরাগ ছিল অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ।

এই তিনটি ধারার মধ্য থেকে একটি ধারা বেছে নেওয়ায় তাঁকে সাহায্য করলেন অধ্যাপক ভেনিস। তাঁর খাস-কামরায় গোপীনাথকে ডেকে নিয়ে তিনি তাঁকে পরামর্শ দিলেন। গোপীনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে তিনি অবশ্যই বুঝতে পেরেছিলেন গোপীনাথের প্রবণতা কোন্ দিকে সবচেয়ে বেশি। ভেবে-চিন্তে ভেনিস বললেন সংস্কৃত নিতে। আরো বললেন, বামাচরণ ন্যায়াচার্য (পরে মহামহোপাধ্যায়) তাঁকে পড়াবেন।

বামাচরণ বিচক্ষণ পণ্ডিত। তাঁর কাছে ন্যায় ও বেদান্তের পাঠ গ্রহণ করবেন জেনে গোপীনাথ উৎসাহিত হলেন এবং ভেনিসের কথায় রাজি হয়ে সংস্কৃত নেওয়াই স্থির করে বসলেন।

যে স্রোত ছিল তিনটি ধারায় বিভক্ত, সেই মুক্তবেণী এবার একত্র এল যুক্তবেণীতে। গোপীনাথ জীবনে নূতন আবেগের সঞ্চার বুঝতে পারলেন এবং সেইদিন থেকেই তিনি সেই বেগে জীবনকে অগ্রসর করে নিয়ে চলেছেন।

ভেনিস তাঁকে আরও পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন যে, এম. এ.র ষষ্ঠ বার্ষিক শ্রেণীতে গবেষণা করতে হবে, সেইজন্যে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করাও দরকার, জার্মান ও ফ্রেঞ্চ পড়াও কর্তব্য। সঙ্গেসঙ্গে প্রাকৃত ও পালি শিক্ষারও ব্যবস্থা

হল। ভেনিসের উপদেশ শিরোধার্য করলেন গোপীনাথ। অধ্যাপক নর্মান এ বিষয়ে তাঁকে বেশি সাহায্য করেছেন।

১৯১৩ সালে প্রথম-বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি নূতন ইতিহাস রচনা করলেন। ইতিপূর্বে কেউ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর কৃতিত্ব অর্জন করে এম. এ. পাস করে নি। এম. এ. পাস করে এক বছর গবেষণাবৃত্তি লাভ করে তিনি কাশীর কুইন্‌স কলেজেই থাকেন।

এই তাঁর ছাত্রজীবন। স্কুল-কলেজের সাধারণ ছাত্রজীবন এইখানেই তাঁর শেষ হল বটে, কিন্তু প্রকৃত ছাত্রজীবন যাকে বলা যায়, তার ইতি হল না। তার ইতি হল না বলেই গোপীনাথ কবিরাজ আজ সুধীমহলে সম্মানের সুউচ্চ আসন লাভ করলেন।

কুইন্‌স কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরস্বতী-ভবন ১৯১৪ সালে গঠিত হয়। সেই সময় গোপীনাথ এখানে গ্রন্থাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হলেন। এই লাইব্রেরীকে রত্নভাণ্ডার বলা যায়। অজস্র গ্রন্থের ভাণ্ডার তো বটেই, তার উপর প্রায় পঞ্চাশ-ষাট হাজার হাতে-লেখা পুঁথি এখানে আছে। এই গ্রন্থের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন গোপীনাথ। এবং এই গ্রন্থ ও পুঁথিপুঞ্জের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে তিনি নিজের পথ কেটে ক্রমশ এগিয়ে চলতে লাগলেন। তাঁর জীবনের প্রকৃত ছাত্রজীবন এই সরস্বতী-ভবনে। বললেন, "এখানে এসে পাঠের অনেক সুবিধা হয়ে গেল।"

বাইরে থেকে তাঁর ডাক আসে, কিন্তু সরস্বতী-ভবন তাঁকে আর-কোথাও যেতে বাধা দেয়। এই বাধাই তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছে সম্পদরূপে। এইখানে বসে বসে জ্ঞানের ও গুণের ঐশ্বর্যে তিনি নিজেকে কুবেরতুল্য করে তুলতে লাগলেন।

কুইন্‌স কলেজের ইংরেজি ও সংস্কৃত বিভাগের প্রিন্সিপাল-পদ থেকে ভেনিস অবসর গ্রহণ করার পর গোপীনাথ সংস্কৃত বিভাগ ও সংস্কৃত গ্রন্থাগারের প্রধানরূপে নিযুক্ত হলেন। ভেনিস রইলেন সংস্কৃত-স্টাডিজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হয়ে।

এর পর ভেনিস হলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। গোপীনাথও সেই সঙ্গে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও পালির রীডার হলেন। প্রায় তিন বছর তিনি এই কাজ করেছেন।

১৯১৮ সালে ভেনিস মারা গেলেন। কুইন্‌স কলেজের সংস্কৃত বিভাগের প্রিন্সিপাল হলেন তখন মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝা।

গোপীনাথের জ্ঞানের সৌরভ তখন চার দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সার্‌ আশুতোষ গোপীনাথকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্যে আহ্বান করে পাঠালেন; কিন্তু কাশী ছেড়ে আসতে তাঁর মন চাইল না। সার্‌ আশুতোষের পরেও কলকাতা থেকে আবার ডাক এসেছে। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও ডেকেছিলেন। বললেন, "কিন্তু কাশীর এই গ্রন্থাগার ত্যাগ করে আমি যেতে চাইলাম না।"

১৯২৩ সালে গঙ্গানাথ ঝা অবসরগ্রহণ করলেন। গোপীনাথ তখন সংস্কৃত বিভাগের প্রিন্সিপাল-পদে নিযুক্ত হলেন এবং সেই সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের সংস্কৃত স্টাডিজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সরকারী সংস্কৃত পরীক্ষাসমূহের রেজিস্ট্রার নিযুক্ত হলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ প্রিন্সিপালের পদে তিনি তেরো বছর একটানা কাজ করেছেন। কিন্তু তেরো বছর একটা সুদীর্ঘ সময় নয়। আরো দীর্ঘকাল তিনি এই পদে বহাল থাকতে পারতেন। কিন্তু মনের গতি তখন তাঁর বদলে গেছে। এতকাল বহু লোক নিয়ে বহু লোকের মধ্যে বসে তিনি অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করে গিয়েছেন। এবার তাঁর জীবনে প্রয়োজন হল নিভৃতির। একাকী বসে নিবিড়ভাবে সাধনা করার অভিপ্রায় হল তাঁর। তিনি তাই এই পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নিলেন ১৯৩৭ সালে। বললেন, "তদবধি সাধনাতেই বিভোর আছি।"

১৯৩৪ সালে ভারত-সরকার তাঁকে মহামহোপাধ্যায় উপাধি দ্বারা ভূষিত করেন, ১৯৪৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট. উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন।

১৯১০ সালে যখন তিনি প্রথম কাশীতে আসেন, তখন ইংরেজি সাহিত্যই তাঁকে মুগ্ধ করে রেখেছে এবং সেই সঙ্গে ইংরেজ কবিকুল। এই সময় তিনি 'প্রবাসী'তে দুটো প্রবন্ধ লেখেন ব্রাউনিং সম্বন্ধে। আর একটি বায়রন সম্বন্ধে— ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায়। এ ছাড়া বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনামূলক প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কন্যা সরযূবালা দাশগুপ্তার ত্রিবেণীসঙ্গম সম্বন্ধে আলোচনা করেন 'প্রবাসজ্যোতি'তে। বর্তমানে কাশী থেকে 'উত্তরা' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। উত্তরার প্রতিষ্ঠার আগে কাশী থেকে প্রকাশিত হত প্রবাসজ্যোতি। এই প্রবাসজ্যোতিতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাগরসঙ্গীত সম্বন্ধেও গোপীনাথ আলোচনা-প্রবন্ধ লিখেছেন। তারপর লিখেছেন রবীন্দ্রনাথের বলাকা সম্বন্ধে 'অলকা'য়। ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'বঙ্গসাহিত্যে' রস ও সৌন্দর্য শিরোনামায় রসতত্ত্ব ও সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে লিখেছেন। আর লিখেছেন কুণ্ডলিনীতত্ত্ব নিয়ে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ ; এই রচনা বহু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর পর লেখেন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ— কাশ্মীর-শৈবাগমমূলক প্রত্যভিজ্ঞাদর্শনের বিস্তারিত আলোচনা। এই প্রবন্ধ বের হয় অলকায়। আর উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে— গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের ভূমিকা ; এই রচনায় রামানুজ নিম্বার্ক মধ্ব বল্লভ ও প্রাচীন পাঞ্চরাত্র মতের বিস্তারিত আলোচনা আছে এবং অপরটি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা। এই দুইটি রচনাই উত্তরাতে প্রকাশিত হয়।

উত্তরাতে আরও যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে কয়েকটির নাম— ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের সমালোচনা, প্রহ্লাদপুর শিলালেখ সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন, ভর্তৃহরি ও ইচিং, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বুদ্ধের উপদেশ, পূর্ণত্বের অভিযান, দত্তাত্রেয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক মত, ভারতীয় সংস্কৃতি, ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও তাহার সাধনজীবনের উদ্দেশ্য, তান্ত্রিক সাধনা সম্বন্ধে গুরুতত্ত্ব ও সদ্‌গুরুরহস্য, শক্তিপাতরহস্য, তান্ত্রিক সাধনার গোড়ার কথা, নাদবিন্দু কলা, পূজার পরম আদর্শ, ভাগবতে ঈশ্বর ও জীবতত্ত্ব ইত্যাদি। বেনারস থেকে প্রকাশিত 'পন্থা' নামক পত্রিকায় বের হয়েছে শক্তি-সাধনা, লিঙ্গরহস্য, অবতার-বিজ্ঞান, যোগ ও যোগবিভূতি প্রভৃতি প্রবন্ধ। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় মৃত্যুবিজ্ঞান

ও পরমপদ কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় অনাদি সুষুপ্তি ও তাহার ভঙ্গ। 'বিশ্ববাণী'তে প্রকাশিত হয় মন্ত্র ও দেবতাতত্ত্ব। 'উৎসবে' প্রকাশিত হয় বাসনা-নিবৃত্তি ও ধর্মের সনাতন আদর্শ। 'দেবযানে' প্রকাশিত হয় রামনামের মহিমা। 'সুদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ধারাবাহিক-ভাবে দীক্ষারহস্য।

'সংস্কৃত রত্নাকর' 'অমরভারতী' প্রভৃতিতে তাঁর সংস্কৃত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে বেদানাং বাস্তবিকং স্বরূপম্, বৈন্ধবো দেহঃ, অস্পর্শ যোগঃ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধচরিত্র সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত নিবন্ধও তিনি লিখেছেন।

কাশী বিদ্যাপীঠ রজত-জয়ন্তী সংখ্যায় ইংরেজি প্রবন্ধ লিখেছেন—Kaivalya and its place in Dualistic Tantric Culture। পুনার Annals of the Bhandarkar Research Institute-এ লিখেছেন প্রতিভা সম্বন্ধে, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ, তিনি বললেন, genius নয়, intuition। এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত গঙ্গানাথ ঝা রিসার্চ ইন্স্টিটিউট জার্নালে, ও মডার্ন রিভিউতেও তাঁর চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১৫ সালে উত্তরপ্রদেশ (ইউ. পি.) হিস্টরিকাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর জার্নালে তিনি অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছেন।

এ ছাড়া হিন্দীতে রচনাও তাঁর আছে। গোরক্ষপুর গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত হিন্দী মাসিক পত্র 'কল্যাণে' বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটা প্রবন্ধ লিখেছেন। এসব প্রবন্ধ এখন পত্রিকার পাতাতেই বিচ্ছিন্নভাবে পড়ে আছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটির নাম— ঈশ্বরমেঁ বিশ্বাস, যোগকা বিষয়-পরিচয়, সূর্যবিজ্ঞান, ইষ্টরহস্য, ভক্তিরহস্য, কাশীমে মৃত্যু ঔর মুক্তি, পরকায়া-প্রবেশ, দীক্ষারহস্য, ভগবদ বিগ্রহ। কল্যাণ ব্যতীত 'অচ্যুত', 'মানবধর্ম' (দিল্লী থেকে প্রকাশিত), 'রাষ্ট্রধর্ম' (লখনউ থেকে প্রকাশিত), 'গীতাধর্ম' 'বিদ্যাপীঠ' 'মানব্' প্রভৃতি হিন্দী পত্রিকাতেও বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছে। 'বিদ্যাপীঠ' পত্রিকায় মধুসূদন সরস্বতী ও সংস্কৃত সাহিত্যকা ইতিহাসমেঁ কাশীকা ভাগ উল্লেখযোগ্য।

ডক্টর ভেনিসের সময়েই তিনি নিজেদের একটি জার্নাল প্রকাশ করার প্রস্তাব করেন। তাঁর পরামর্শ অনুসারে প্রিন্সেস অব ওয়েলস সরস্বতী-ভবন টেকস্‌ট্‌স্‌ ও প্রিন্সেস অব ওয়েলস্‌ সরস্বতী-ভবন স্টাডিজ নাম দিয়ে দুটি জার্নাল বের হয়। টেকস্‌ট্‌স্‌-এ প্রায় বাহাত্তরখানা পুঁথি প্রকাশিত হয়। তার সাধারণ সম্পাদক গোপীনাথ। তা ছাড়া নিজেও তিনি কয়েকখানা গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন। স্টাডিজে ইংরেজিতে তিনি অনেকগুলি মৌলিক প্রবন্ধ লেখেন— যথা, ন্যায়-বৈশেষিক সাহিত্য ও দর্শন, গোরক্ষনাথ, নয়া ভক্তিসূত্র, নির্মাণকায় (বৌদ্ধ দর্শন), শৈব দর্শন, বৈশেষিক সূত্র, নাথপন্থ, সংস্কৃত পাণ্ডুলিপির বিবরণ, বেদের রহস্যবাদ ইত্যাদি। স্টাডিজে প্রকাশিত তাঁর মৌলিক প্রবন্ধগুলির নাম—

(1) The view-point of Nyaya-Vaisesika Philosophy. (2) Nirmana Kaya, (3) The System of Chakras according to Gorakshanatha, (4) A new Bhaktisutra, (5) Gleanings from the History and Bibliography of Nyaya-Vaisesika literature, (6) Mimansa Mss in Government Sanskrit Library : Banaras, (7) Theism in Ancient India, (8) Parasurama Misra *alias* Vani Rasala Raya, (9) Date of Madhusudan Saraswati, (10) Some Variants in the readings of the Vaisesika Sutras, (11) Gleanings from the Tantras, (12) Satkaryyavada : the problem of causality in Sankhya, (13) The philosophy of Tripura Tantra, (14) Some aspects of Vira Saiva Philosophy, (15) Some aspects of the History and Doctrines of the Nathas, (16) Notes on Pasupata Philosophy, (17) Mysticism in Veda, (18) Conception of physical and super-physical organism in Sanskrit Literature ইত্যাদি।

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তের ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে 'হিন্দুস্থান রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক বইটি মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ

ঝাকে সমালোচনার জন্যে দেন। গঙ্গানাথ ঝার অনুরোধে বইটির বিস্তারিত সমালোচনা করেন গোপীনাথ। গঙ্গানাথ ঝার ভূমিকা-সহ ১৯২৩ সালে সমালোচনাটি হিন্দুস্থান রিভিউতে প্রকাশিত হয়। বললেন, "ভারত-সরকার *Philosophy—East and West* নামে যে বিরাট গ্রন্থের আয়োজন করেছেন তাতে আমি শাক্তদর্শন বিষয়ে অধ্যায়টি লিখেছি। গ্রন্থসম্পাদক ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের অনুরোধই ছিল এই রচনার প্রবর্তক।"

১৯১৮ সালে ইনি স্বামী বিশুদ্ধানন্দের কাছে যোগ-দীক্ষা গ্রহণ করেন। "তখন থেকেই মন সাধন-পথে চলে যায়, ১৯৩৭ সালে অবসর নিয়ে সাধনায় পুরোপুরি মগ্ন আছি।"

কেবল অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন নয়, সাধনা ও রচনাতেও তিনি তাঁর জীবন ডুবিয়ে রেখেছিলেন। সেই কারণেই তাঁর এত বিভিন্ন রকমের রচনা বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক কিছু লাভ করার আশা সম্ভবত ছিল—তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় থেকে অনেক মূল্যবান সম্পদ, কিন্তু তিনি তাঁর জীবনের ধারা বদলে নিয়েছেন। অথ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা নয়, তিনি যেন অথ আত্মজিজ্ঞাসা— এই প্রশ্নে নিজেকে বিব্রত রেখেছেন ; আত্মবিশ্লেষণের মাঝখান দিয়েই তো ব্রহ্মলাভ করা যায়। তিনি সেই পরমতম জ্ঞানের অনুসন্ধান করে চলেছেন এখন।

তাঁর জ্ঞানের সঞ্চয় থেকে যেমন আরও অনেক পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থেকে গেছে, তেমনি তাঁর জীবনের কাহিনীও আরও অনেক জানার ছিল, যেন তাও অপূর্ণ রয়ে গেল।

বাইরে অন্ধকার নেমেছে। দোতলার জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি কাশীর আকাশপট থেকে মুছে গেছে বড় বড় বাড়ির গম্বুজ ও মিনার এবং দূরের জলকলের বড় চোঙাটা। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেল। গোপীনাথ তাঁর জীবনালেখ্য এঁকে গেলেন তাঁর কথার তুলি দিয়ে। সেই ছবির ছাপ মনের মধ্যে পুঁজি করে বেরিয়ে এলাম। তবু মনে হল, আরও বুঝি জানার ছিল। কিন্তু আর জানা হবে না— কাল ওঁর মৌন দিবস।

রিকশায় উঠে বসলাম। সোজা গোধূলিয়া অভিমুখে, সেখান থেকে সোনাপুরায়।

সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয় বললেন, "কাশীতে এলেন, তীর্থ করে যান।" বললাম, "তীর্থ মানে? তীর্থ করা কি হল না?" সুরেশবাবু একটু চুপ করে থেকে কি যেন ভাবলেন, বললেন, "তা বটে।"

রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গ। পাঁচ খণ্ড
অখণ্ড মহাযোগ

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

কিরণাবলী ভাস্কর (বৈশেষিক)—পদ্মনাভ-কৃত
কুসুমাঞ্জলি-বোধিনী (ন্যায়)—উদয়ন-কৃত
রসসার (বৈশেষিক)—বাদীন্দ্র-কৃত
যোগিনীহৃদয়দীপিকা (শাক্ত আগম)। দুই খণ্ড—অমৃতানন্দ-কৃত
ত্রিপুরারহস্য—জ্ঞানখণ্ড (শাক্ত আগম দর্শন)। চার খণ্ড—হারিতায়ন-কৃত
ভক্তিচন্দ্রিকা (ভক্তিশাস্ত্র)—নারায়ণতীর্থ-কৃত
সিদ্ধান্তরত্ন (গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন)—বলদেব-কৃত

সংকলিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

A Descriptive Catalogue of Mimansa Mss in Govt. Sanskrit Library, Banaras.
Annual Catalogue of Mss acquired for Sarasvati-Bhavana, Banaras.

অন্যের লিখিত গ্রন্থের ভূমিকা

গঙ্গানাথ ঝা কৃত বাৎস্যায়ন ভাষ্যের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা
গঙ্গানাথ ঝা কৃত তন্ত্রবার্তিকের ইংরেজি অনুবাদের ভূমিকা
দুর্গাচৈতন্য ভারতী কৃত দেবীযুদ্ধে চিন্তনীয় গ্রন্থের ভূমিকা

তারামোহন বেদান্তরত্ন কৃত অগস্ত্যচরিত নামক গ্রন্থের ভূমিকা
পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য কৃত ব্রহ্মচর্য্য-শিক্ষা নামক গ্রন্থের ভূমিকা
বলদেব উপাধ্যায় কৃত বৌদ্ধদর্শন নামক গ্রন্থের ভূমিকা
শ্রীমদ্‌ভাস্করানন্দজীর গুরুদেব রচিত উপেন্দ্রবিজ্ঞান সূত্রের ভূমিকা
মেহের পীঠের সর্ববিদ্যাচার্য সর্বানন্দ রচিত সর্বোল্লাসতন্ত্রের প্রাক্‌কথন
হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী-রচিত কালসিদ্ধান্তদর্শিনী নামক গ্রন্থের ভূমিকা
উমেশমিশ্র রচিত *Conception of Matter* নামক গ্রন্থের ভূমিকা
গুরুপ্রিয়াদেবী রচিত অখণ্ডমহাযজ্ঞের ভূমিকা
রাজবালাদেবী রচিত শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা প্রবন্ধ নামক গ্রন্থের ভূমিকা
নাথমল টাঁটিয়া রচিত *Studies in Jain Philosophy* গ্রন্থের ভূমিকা
হরদত্ত শর্মা সম্পাদিত শ্রীশঙ্করাচার্য কৃত সাংখ্যকারিকার জয়মঙ্গলা-
টীকার ভূমিকা

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী বেদান্ততীর্থ

খাড়া সিঁড়ি উঠে গিয়েছে প্রায় রাস্তার কিনার থেকে একেবারে তেতলা অবধি। মাঝে দু-তিনটি বাঁক। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে অনেকটা উপরে উঠে এলাম, বাঁক নিয়ে আরও উপরে উঠলাম, তার পর তৃতীয় বাঁক নিয়ে আরও কয়েকটা সিঁড়ি ভাঙার পর পেলাম একটা উন্মুক্ত দরজা।

দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম, ঘরের মেঝেয় মাদুর বিছানো —তারই একপাশে বসে আছেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী বেদান্ততীর্থ মহাশয়। ঘরের একপাশে স্তূপ করা কতকগুলো বই আর পুঁথি, তার কাছেই দেয়ালে একটা বড় ছবি টাঙানো। ঘরের আলো খুব উজ্জ্বল ছিল না, মনে হল ছবিটা বুঝি তাঁর নিজেরই।

বললেন, "ও ছবি আমার পিতার। আমার পিতার নাম স্বর্গীয় জগৎচন্দ্র বাগচী।"

সন্ধ্যে গড়িয়ে গিয়েছে কিছুক্ষণ আগে। তাঁর বাড়ির নম্বরটা জানা ছিল না। তাই আমহার্স্ট স্ট্রীট আর পটলডাঙার মোড়ে এসে ফুটপাতের ধারের একটা রঙের দোকানে তাঁর নাম বলতেই দোকানী চিনিয়ে দিলেন বাড়িটা।

১১ই নভেম্বর ১৯৫২, ২৫এ কার্তিক ১৩৫৯, মঙ্গলবার। তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছি। আগে কোনো খবর দেওয়া ছিল না, তাই আমার আগমনের উদ্দেশ্য তাঁকে বলতে হল।

বললাম, জানতে এসেছি তাঁর জীবনের কাহিনী। কিভাবে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজেকে, কিভাবে প্রেরণা লাভ করেছেন, বাধাবিপত্তি ডিঙিয়ে এগিয়ে চলেছেন কিভাবে। জ্ঞানান্বেষণের জন্যে ছোটখাট অভিযান তাঁকে করতেই হয়েছে, সেই অভিযানের গল্প শুনতে এসেছি। —এতে লাভ? লাভ আছে। দুরূহকে আয়ত্ত করতে হলে কঠোর শ্রম ও দীর্ঘ তপস্যা যে আবশ্যক, তা সকলে জেনে প্রেরণা লাভ যদি করে তাহলে সেটা লাভ ছাড়া কী?

ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট তিনি অধ্যয়ন করেছেন। আজ শাস্ত্রী মহাশয় স্বর্গত। তাঁর কথা তাঁর মনে পড়ে গেছে। আবেগ-রুদ্ধ গলায় তিনি বলতে লাগলেন তাঁর কথা, কেবল লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যেই তিনি মুগ্ধ নন—তাঁর হৃদয়ের পরিচয়েও তিনি যে অভিভূত তা স্পষ্ট বোঝা গেল। সম্ভবত এই রকমই ছিল সেকালের গুরুশিষ্যের সম্পর্ক। হৃদয়ে হৃদয়ে এই রকমই ছিল নিবিড় বন্ধন।

১২৯৪ বঙ্গাব্দ, খ্রীস্টীয় ১৮৮৭, সালে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। "ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার সুসঙ্গ-দুর্গাপুরে আমার জন্ম। এই স্থান গারো পাহাড়ের অতি নিকটে। গ্রাম থেকে পাহাড়ের সমুদয় দৃশ্য দেখা যায়। এই পাহাড় থেকে সোমেশ্বরী নদী প্রবাহিত হয়ে আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে গিয়েছে।"

সুসঙ্গের রাজারা সুদীর্ঘ কালের রাজা। এই গ্রাম একটি বন্দর। এখান থেকে নদীপথে বছরে প্রায় দুই লক্ষ মণ চাল বাইরে চালান হত। এটা বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

বললেন, "আমার পিতার আদি নিবাস পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত জামিরতা গ্রামে। সেখান থেকে এসে আমার পিতা সুসঙ্গ-দুর্গাপুরে বাস স্থাপন করেন। তিনি সুসঙ্গ-রাজসরকারে চাকরি করতেন। তিনি অতি নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন।"

তিনি নিজে সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত, কিন্তু তাঁদের বংশে কেউ সংস্কৃতচর্চা করেছেন বলে তাঁর জানা নেই। কিন্তু তাঁর মাতামহ ভুবনেশ্বর বিশারদ সংস্কৃত শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এঁর নিবাস পাবনার সিরাজগঞ্জের ভাঙাবাড়িতে। তাঁর টোল ছিল। টোলে ছাত্র ছিল অসংখ্য। এঁরা বাংশানুক্রমে পণ্ডিত— পণ্ডিতের ধারা।

বললেন, "আমার বাল্যকালেই সংস্কৃতের প্রতি আকর্ষণ বোধ করি এবং এই শাস্ত্রের প্রতি রুচি জন্মে। কেন জানি নে, মনে হয় মাতামহ থেকেই এই প্রবণতা এসেছে।"

বাল্যকালে সুসঙ্গ মাইনর স্কুলে পাঠ সমাপ্ত করে তিনি সংস্কৃত পড়তে

আরম্ভ করেন। মাইনর পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে গ্রাম থেকে ময়মনসিংহ শহরে যেতে হয়। পরীক্ষা দিতে এখানে এসে তিনি ক্রয় করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত উপক্রমণিকা। ময়মনসিংহ থেকে সুসঙ্গ যেতে হত নৌকা-পথে—ছয় দিনের পথ। এই ছয় দিনে নৌকায় বসে তিনি উপক্রমণিক। আদ্যোপান্ত-পাঠ শেষ করেন।

এর পর থেকেই সংস্কৃতের প্রতি তাঁর আগ্রহ প্রকাশ পায়। তিনি তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কিন্তু তাঁর বংশের কেউই যখন সংস্কৃতচর্চা করেন নি, তখন তাঁর এই আগ্রহটা সকলের কাছে অস্বাভাবিক বলে ঠেকে থাকবে। তাই আত্মীয়-স্বজনেরা রীতিমত বিরোধিতা আরম্ভ করলেন। হয়তো তাঁকে পরাভব স্বীকার করতে হত এবং জীবনে সংস্কৃতচর্চা করা সম্ভব হত না, যদি অন্তত একজনও তাঁর সহায় না হতেন।

বললেন, "আমার এই সংকল্পে উৎসাহ পেলাম যাঁর কাছ থেকে, তিনি আমার পিতা।"

তাছাড়া নাম বললেন আর-এক জনের—তিনি সুসঙ্গের মহারাজ কুমুদসিংহ। ইনিও তাঁকে উৎসাহ দান করেন। কেবল মৌখিক উৎসাহ নয়, প্রয়োজনীয় অনেক পুস্তকও তিনি দেন।

"সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে আমার কোনোই ধারণা ছিল না, আরও অসুবিধা এই ছিল যে, আমাদের নিকটবর্তী কেউই এ বিষয়ে রুচিসম্পন্ন ছিলেন না। এ জন্যে প্রথমজীবনে সংস্কৃতশিক্ষায় বিশেষ সহায়তা পাই নি। সুসঙ্গের মহারাজার সভাপণ্ডিত কৃপানাথ তর্করত্ন মহাশয়ের কাছে আমি প্রথম কলাপ-ব্যাকরণ পড়তে আরম্ভ করি।"

বাড়িতে থেকে পাঠে বিঘ্ন ঘটবে মনে হওয়ায় তিনি সিরাজগঞ্জে মাতুলালয়ে চলে যান। তাঁর মামা তারকেশ্বর চক্রবর্তী কবিশিরোমণি অতি প্রসিদ্ধ কবিরাজ ছিলেন এবং নানা শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্যও ছিল অগাধ। বললেন, "আমি তাঁর কাছে কলাপ-ব্যাকরণ পড়তে থাকি। নানা কাজে তিনি ব্যস্ত থাকায় তাঁর কাছে পাঠ উত্তমরূপে হতে পারবে না বিবেচনা করে তিনিই আমাকে তাঁর

খুড়ামশায়ের কাছে ভাঙাবাড়িতে পাঠিয়ে দেন। ইনি রাজনাথ তর্কতীর্থ। এখানে তাঁর টোল ছিল। ইনি অগাধ পণ্ডিত ছিলেন। অতিশয় স্নেহ ও আগ্রহের সঙ্গে ইনি আমাকে কলাপ-ব্যাকরণ পড়ান। আমার ধারণা, সংস্কৃত সাহিত্যে আমার যদি কিছু ব্যুৎপত্তি থেকে থাকে তাহলে তা তাঁরই কৃপায়।"

এর পর তিনি উল্লেখ করলেন তাঁর সতীর্থের কথা। ইনি কলকাতা বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের অধ্যক্ষ ধরণীধর গুপ্ত। তাঁর বহুদিনের সঙ্গী ছিলেন ইনি। বন্ধুবিয়োগের বেদনা আজও তিনি ভুলতে পারেন নি, সতীর্থদের প্রতি প্রীতির কথা তাঁর মনে থাকবে, কণ্ঠস্বর বাষ্পাকুল হয়ে এল, বললেন, "ধরণী আমার বয়ঃকনিষ্ঠ, সংস্কৃত শাস্ত্রের আলোচনাতে সে ছিল আমার চিরসঙ্গী। অল্পদিন হল তার স্বর্গবাস হয়েছে। তাকে হারিয়ে মন ভেঙে গেছে। একলা আছি, আর কেউ নেই।"

কিছুক্ষণ থেমে পুনরায় ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন তাঁর জীবনের কথা।—

ব্যাকরণের পাঠ শেস করে ভাঙাবাড়ি থেকে সিরাজগঞ্জে তিনি ফিরে আসেন। এই সময় তাঁর বয়স আঠারো বৎসর। তাঁর মাতুল তারকেশ্বর কবিরাজ মহাশয় উদ্যোগ করে তাঁকে টাঙাইলের অন্তর্গত হালালিয়া গ্রামে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করবার জন্যে পাঠিয়ে দেন। এখানে এসে তিনি গোপালনাথ তর্কতীর্থের কাছে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন। কিছুদিন পর গোপালনাথ বগুড়ার শেরপুরে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়ে সেখানে যান। "সেইসঙ্গে আমিও বগুড়ায় গিয়ে তাঁর কাছে অধ্যয়নে রত থাকি। মহামহোপাধ্যায় চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয় সেই সময় ছিলেন মুর্শিদাবাদ জুবিলি-টোলের অধ্যাপক। বগুড়া থেকে মুর্শিদাবাদে গিয়ে আমি এঁর কাছে দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করে তর্কতীর্থ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই।"

তর্কতীর্থ-পরীক্ষা পাস করার পর তিনি যান রাজসাহীতে। সেখানে হেমন্তকুমারী কলেজে মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়ের কাছে পক্ষতা প্রভৃতি নব্যন্যায়ের গ্রন্থ অধ্যয়ন করে পুনরায় ফিরে যান মুর্শিদাবাদে এবং চণ্ডীদাস ন্যায়তর্কতীর্থের কাছে পূর্ববৎ অধ্যয়নে রত হন। এখানকার পাঠ সমাপ্ত করে তিনি চলে আসেন কলকাতায়।

বললেন, "এখানে এসে সংস্কৃত কলেজে মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় মহাশয়ের নিকটে ও পূর্ব-অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ মহাশয়ের নিকটে সাংখ্য ও বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করি।"

এর আগেই তিনি মীমাংসাদর্শন ও অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ জুবিলি-টোলের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক দুর্গাসুন্দর স্মৃতিরত্ন এই বিষয়ে তাঁর গুরু। এঁরই কাছে তিনি উক্ত শাস্ত্রদ্বয় পাঠ করেন। বললেন, "ইনি ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক হলেও সমস্ত শাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, আমি যে মীমাংসা ও অলংকার-শাস্ত্র পড়তাম তা তিনি মুখে-মুখেই পড়াতেন, কোনো গ্রন্থ দেখার তাঁর আবশ্যক হত না। এইসব দুরূহ গ্রন্থরাশি তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল। আমার পুস্তকের অশুদ্ধ পাঠও তিনি সংশোধন করে দিতেন। এঁর নিবাস ময়মনসিংহের শেরপুরে।"

কলকাতায় এসে ১০ নম্বর পটলডাঙা নিবাসী কবিরাজ শরৎচন্দ্র সাংখ্যতীর্থের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব জন্মে। এই সময়ে আরও দুজনের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন, তাঁরা হচ্ছেন বিনয়কুমার সরকার ও শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। বিনয়কুমার সরকার তখন মুসলমানপাড়া লেনে থাকতেন, তাঁর গৃহে তিনি কিছুদিন বাস করেন।

বললেন, "আমার পরমসুহৃদ ও আমার গুরু-সদৃশ শ্রীযুত কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থ মহাশয়ের সঙ্গে এই সময় আমার দেখা হয়। আমি হালালিয়াতে যখন অধ্যয়ন করি তখনই কাঁঠালিয়া-নিবাসী কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। তাঁর লোকাতিশায়ী গুণরাশিতে আমি অতিশয় আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হই। কলকাতায় এসেও তাঁর সঙ্গলাভ হওয়ায় আমার বিশেষ উপকার হয়। এককথায় তিনিই আমার জীবনের সমস্ত কল্যাণের মূল। দুরূহ অধ্যাত্ম শাস্ত্রসমূহের রহস্য তিনিই আমাকে শিষ্যের মত পড়িয়ে ও বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেইসমস্ত উপদেশ এখনো আমার হৃদয়ে জাগরূক আছে।"

সাংখ্যতীর্থ মহাশয় এই সময় ন্যাশনাল কলেজের অধ্যাপক ছিলেন।

কারণবশতঃ তাঁকে এই পদ থেকে অবসরগ্রহণ করতে হয়। "তাঁর স্থানে আমাকে তিনি ন্যাশনাল কলেজে কাজ গ্রহণ করিয়েছিলেন।"

এইভাবে কলকাতায় অধ্যয়ন করতে করতে তিনি পণ্ডিত লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর কাছে বেদান্তের ও সাংখ্যের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় যখন কাশী থেকে কলকাতার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হয়ে কলকাতায় আসেন তখনই তাঁর কাছে ইনি পাঠ আরম্ভ করেন। "এই সময় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রী প্রভৃতি লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করেন। এঁরা সকলেই আমার সতীর্থ।"

বেদান্ততীর্থ-পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে তিনি সুকিয়া স্ট্রীটে বিনয়কুমার সরকার ও শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁদের বাসায় অবস্থান করেন এবং তাঁদের সঙ্গেই কিছুদিন পুরীতে ও রাঁচীতে বাস করেন। রাঁচী থাকাকালে তাঁর ডাক আসে হরিদ্বার থেকে।

বললেন, "হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একখানি পত্র পাই। সেই পত্রে উক্ত বিদ্যালয়ের একজন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের কথা বলা হয়। চিঠি পেয়ে আমি গুরুকুল যেতে সম্মত হই। এ ঘটনা ১৯১৪ সালের দুর্গাপূজার কিছু আগের ঘটনা।"

সন-তারিখ তাঁর ঠিক মনে নেই, বললেন, "১৯১৪ই হবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সব বেধেছে।"

কেদারনাথ সাংখ্যতীর্থের সম্বন্ধে তিনি আগেই বলেছেন, তিনিই তাঁর জীবনের সকল কল্যাণের মূল বলে তাঁর উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনও করেছেন। হরিদ্বার থেকে তাঁর যে আহ্বান এল এর মূলেও আছেন কেদারনাথ। কেদারনাথের ভাগিনেয় তখন গুরুকুলে গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। বললেন, "তাঁর পরিচয়েই আমি গুরুকুল যাই। সাত বৎসর নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করি।"

হরিদ্বার গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। এঁর নিবাস পাঞ্জাবের জলন্ধরে। প্রথমে এঁর নাম ছিল লালা মুনশিরাম।

কিছুদিন পরে লক্ষ্মণ শাস্ত্রী মহাশয় কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-পদ পরিত্যাগ করেন। তখন ওই শূন্য পদের জন্য ইনি প্রার্থী হন। তখন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের গবর্নিং বডির অধ্যক্ষ। লক্ষণ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্থানে নিযুক্ত হলেন তাঁরই শিষ্য যোগেন্দ্রনাথ।

এইভাবে তাঁর জীবনে উন্নতি ঘটতে লাগল। তিনি যে জ্ঞান অর্জন করেছেন, তার স্বীকৃতি লাভ ঘটতে লাগল এই ভাবে।

তিনি যখন সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপকরূপে যোগ দেন তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মহামহোপাধ্যায় আশুতোষ শাস্ত্রী, এর পরে অধ্যক্ষ হন শ্রীযুক্ত আদিত্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং তার পরে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত।

"শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের সময়েই আমি মহামহোপাধ্যায় উপাধি প্রাপ্ত হই। এই সময়ে আমি অদ্বৈতসিদ্ধির টীকা ও বঙ্গানুবাদ রচনা করি। ন্যায়ামৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদও আমার এই সময়ের রচনা। স্বর্গত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ আমার অতিশয় অনুরক্ত হন, অতিশয় পরিশ্রম স্বীকার করে অতি উৎসাহের সঙ্গে তিনি প্রতিদিন এই গ্রন্থগুলি লিখে নেন এবং নিজ ব্যয়েই তা মুদ্রিত করেন। দুই খণ্ড অদ্বৈতসিদ্ধি মুদ্রিত হওয়ার পর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে তিনি স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দরূপে পরিচিত হন।"

১৯২১ সালে কলকাতা সংস্কৃত কলেজে ইনি বেদান্তের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি স্বর্গত মহাত্মা রামদয়াল মজুমদার মহাশয়ের সঙ্গে অতিশয় ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হন। বললেন, "আমার প্রতি তাঁর পুত্রাধিক স্নেহ আমার হৃদয়ে চিরজাগরূক রয়েছে।"

১৬২ নম্বর বহুবাজার স্ট্রীটে মজুমদার-মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত উৎসব-সৎসঙ্গ কার্যালয়ে প্রত্যেক শনিবারে ধর্মের আলোচনার জন্যে একটি অধিবেশন হত। এই অধিবেশনে কলকাতা ও কলকাতার নিকটবর্তী স্থানের বহু বিদ্বান গুণী জ্ঞানী জনগণের সমাগম হত। "আমি এই প্রতিষ্ঠানে বিশ বৎসর নিয়মিতভাবে ধর্মোপদেশকের কার্য করেছি। এই সভায় আমার সঙ্গে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিচয় হয়। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ৬।১ নম্বর

উইলিয়মস্ লেন নিবাসী স্বর্গত মহাপ্রাণ ক্ষিতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি আমার অকৃত্রিম বান্ধব, সংরক্ষক ও পরিচালক ছিলেন। তাঁর সর্ববিধ সহায়তা না পেলে আমি কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারতাম না। তাঁর অমায়িক মধুর ব্যবহার ভাষায় প্রকাশ্য নয়। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট কল্যাণীয় শ্রীমান বিনায়কনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে এখনও পর্যন্ত আমার পূর্ববৎ ব্যবহার আছে। মেডিকাল কলেজের প্রফেসর স্বর্গত ডাক্তার টি স্থর মহাশয়ের সঙ্গেও আমার উৎসব সৎসঙ্গেই পরিচয় হয়। এঁর যোগ্য পুত্রগণ পিতার সম্বন্ধ রক্ষা করেন।"

উৎসব-সৎসঙ্গে আরও বহু কৃতিব্যক্তির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। কিন্তু সকলের নাম তিনি বাহুল্য ভয়ে আর উল্লেখ করলেন না। এঁরা সকলেই তাঁর জীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন। এইজন্য তিনি তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। সেই কৃতজ্ঞতা তিনি অকপট ও অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করে যেন পরিতৃপ্তি লাভ করলেন।

তাঁর অধ্যাপনা-জীবনে তাঁর সংসর্গে এসেছেন অনেক ছাত্র। উত্তর-জীবনে তাঁদের মধ্যে অনেকেই কৃতিপুরুষ হয়ে উঠেছেন। এঁদের কৃতিত্বের জন্য তিনি যেন নিজে গৌরব বোধ করেন। তিনি নাম বললেন তাঁদের—পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীধীরেন্দ্রমোহন দত্ত, চুঁচুড়া নন্দলাল চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক শ্রীকামাখ্যানাথ স্মৃতিবেদান্ততীর্থ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনরেন্দ্রনাথ পঞ্চতীর্থ, আসাম নলবাড়ি সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন স্মৃতিমীমাংসাতীর্থ, বাংলা সরকারের টোল-বিভাগের ইন্সপেক্টর শ্রীমান পঞ্চানন শাস্ত্রী তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীভূতনাথ সপ্ততীর্থ, মেদিনীপুর কাঁথি সংস্কৃত কলেজের বেদান্ত অধ্যাপক শ্রীমান শ্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থ, হাওড়া নিম্বার্ক আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীমান বিনোদবিহারী পঞ্চতীর্থ, প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথ ভট্টাচার্য, হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ ডক্টর নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর সদানন্দ

ভাদুড়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়। বললেন, "এ ছাড়া কলকাতা গদাধর আশ্রমের অধ্যাপক শ্রীমান রামছবিলা শাস্ত্রী ও সুদামা শাস্ত্রী প্রভৃতি অবাঙালী ছাত্রেরাও আমার কাছে দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন।"

একটি উৎস থেকে উৎপত্তিলাভ করে যেমন শতধারায় ছড়িয়ে পড়ে জলধারা, এই জ্ঞানধারাও তেমনি ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন দিকে। বিভিন্ন দিকের ভূমি উর্বর করে চলেছে সেই ধারাবলী। তিনি তাঁর ছাত্রদের নাম উল্লেখ করে যেন সেই উর্বরক্ষেত্রসমূহের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করলেন।

১৯৪২ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক-পদ থেকে ইনি অবসর গ্রহণ করেছেন। অবসর গ্রহণের মাস দুই আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করে তাঁকে একটি নিয়োগপত্র দেন। তদনুসারে ১৯৪৩ সালের ২রা জানুয়ারি তিনি ঐ কাজে যোগদান করেন। সেই পদে এতদিন বহাল ছিলেন। বললেন, "দেড বছর পূর্বে পশ্চিম-বাংলা সরকার কর্তৃক কলকাতা সংস্কৃত কলেজে দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা-কার্যের জন্য নিযুক্ত হয়েছি।"

মুর্শিদাবাদে যখন তিনি অধ্যয়ন-রত তখন পরম ভাগবত বৈষ্ণবকবি বিল্ব-মঙ্গল-বিরচিত বিল্বমঙ্গলম্ নামে একখানি খণ্ডকাব্য অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। এইটেই তাঁর জীবনের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ।

এর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় তিনি আর্যদর্শনশাস্ত্র-সমূহের অবিরোধ দেখাবার জন্যে ও আর্যদার্শনিকগণের বিচার-রীতি প্রদর্শনের জন্যে দুইখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এ ছাড়াও তিনি আরও কয়েকখানি বই লিখেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে এঁকে ডি. লিট. উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছেন।

তাঁর জীবনের কাহিনী শুনে এবার বিদায় নেওয়া গেল। দৃষ্টির নেপথ্যে থেকে যাঁরা জ্ঞানচর্চা ও জ্ঞানবিতরণ করে চলেছেন ইনি তাঁদের অন্যতম। বিনয়ে নম্র এবং অতি সরল স্বভাব এইসব কৃতী পুরুষদের সান্নিধ্যলাভ করতে হলে মাটি থেকে অনেক উপরেই উঠে আসতে হয়।

সেই উপর থেকে এবার ধীরে ধীরে নেমে এলাম রাস্তায়—ফুটপাথে। এখানে শহরের কর্মকোলাহল ও কলরব। কিন্তু ঐ উপরে রেখে এলাম একটি শান্ত পরিবেশ। সমুদ্র যেখানে গভীর সেখানে নাকি তরঙ্গের উচ্ছ্বাস কম। জনসমুদ্রের এই উচ্ছলতার মাঝখানে পড়ে এই কথাই মনে হতে লাগল।

রচিত গ্রন্থাবলী

বিল্বমঙ্গলম্

প্রাচীন ভারতের দণ্ডনীতি

জন্মানুসারে বর্ণব্যবস্থা

মহামতি বিদুর

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

বাক্য ও কাব্য— এই দুইটির মধ্যে তফাত কী। কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি দিয়েই তো আসলে কাব্য তৈরি। কিন্তু বাক্য পরপর সাজালেই তা কাব্য হয়ে ওঠে না। কেন? এই জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছেন বিভিন্ন কালের বিভিন্ন আলংকারিক। কিন্তু তবুও জিজ্ঞাসার শেষ হয়নি। মানুষের মনে এমনি অজস্র জিজ্ঞাসা আছে বলেই মানুষ বাক্য সাজিয়ে কাব্য করার চেষ্টায় রত এবং এইজন্যেই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষের অন্তহীন অভিযান।

জীবন থাকলেই তা জীব হতে পারে, কিন্তু মানুষ হতে পারে না; মানুষ হতে হলে জীবন ছাড়াও বাড়তি একটা পদার্থ চাই, সেটি হচ্ছে— মন। কথা থাকলেই তা বাক্য হতে পারে, কিন্তু কাব্য হতে হলে বাড়তি আর-একটা পদার্থ চাই, সেটাও হচ্ছে ওই— মন। যে বাক্যে মন আছে, সেই বাক্যই তাই কাব্য।

কাব্যের মোটামুটি এই সংজ্ঞা হয়তো কেউ মানবেন, কেউ মানবেন না। বস্তুতপক্ষে এ বিষয়ে নানা জনের নানা মত।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'কাব্যজিজ্ঞাসা' গ্রন্থে আলংকারিকদের এইসব মত নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মন কবি-মন, সেইজন্যে তাঁর এই আলোচনার মধ্যেও কবিত্বের ব্যঞ্জনা আছে।

তাঁর এই বইটিকে বলা যায়, অলংকারশাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন করে রত্ন-উদ্ধার। কাব্যের প্রতি অগাধ মমতা ও আকর্ষণ নিয়েই তিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছেন বলা চলে। প্রথমজীবনে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ, রংপুর শহরে অতুলচন্দ্রের জন্ম। পিতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত রংপুরের একজন স্বনামধন্য ও সর্বজনমান্য ব্যক্তি ছিলেন। এঁর নাম অনুসারে রংপুরের একটি পাড়ার নাম হয়েছে— গুপ্তপাড়া।

অতুলচন্দ্রের আদিবাড়ি ময়মনসিংহ জেলার টাঙাইলের অন্তর্গত ছোট-বিন্যাফৈর গ্রামে। অসচ্ছল অবস্থায় তাঁর পিতার দিন এখানে অতিবাহিত

হচ্ছিল। তাই তিনি ছোট-বিস্তাফেরের এক তাঁতির কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ভাগ্য-অন্বেষণে বহির্গত হন, তিনি ময়মনসিংহ শহরে এসে সন্তোষ-জাহ্নবী স্কুলে পড়াশুনা করে এনট্রান্স পাস করেন। তারপর ভাগ্য-অন্বেষণেই তিনি আসেন রংপুরে এবং সেখানেই ওকালতি করতে আরম্ভ করেন। তাঁর এই অভিযানে তিনি সফল হন, ভাগ্য তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রস্থল রংপুরের গুপ্তপাড়ায় উমেশচন্দ্রের বাড়ি। এখানে বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিচেরীর সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী আসতেন। অতুলচন্দ্রের জীবন আরম্ভ হয় এই পরিবেশের মধ্যে।

তারপর যখন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন আরম্ভ হয়, তখন অতুলচন্দ্র সে-আন্দোলনে মন-প্রাণ সমর্পণ করেন বলা যায়। এই আন্দোলনের সময় কার্লাইল সাহেব এক পরোয়ানা জারি করেন। উক্ত পরোয়ানায় বলা হয় যে, 'স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষগণ ছাত্রদিগকে যদি প্রকাশ্যভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান হইতে নিবৃত্ত না করেন কিংবা তথাকথিত স্বদেশী আন্দোলন সংস্পৃষ্ট বিদেশী পণ্য বর্জন, বিদেশী পণ্য ক্রয়-বিক্রয় নিবারণ ইত্যাদি অপকার্য হইতে বিরত না রাখেন, তাহা হইলে উক্ত স্কুল ও কলেজসমূহ গবর্নমেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবে: উহারা আর গবর্নমেণ্টের বৃত্তিলাভার্থ প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে না।' এই পরোয়ানা ১৯০৫ সালের ২২শে অক্টোবরের স্টেটস্‌ম্যান পত্রে প্রকাশিত হয় এবং জানানো হয় যে, কোনো কোনো জেলার ম্যাজিস্ট্রেট পরোয়ানাখানি স্কুল ও কলেজের কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করেছেন। 'শিক্ষা' পত্রিকায় এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হয় এবং রংপুরে ছাত্রনিগ্রহের সংবাদও বের হয়।

অতুলচন্দ্র এ সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র। সে সময়ে 'শিক্ষা'য় (১৩১২ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত একটি সংবাদ এখানে মুদ্রিত হল—

'প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত বি. এ. নিম্নোক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন—

'মফস্বলের ছাত্র ও অভিভাবকগণের অবগতির জন্যে এইসকল প্রস্তাব প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রকাশিত হউক এবং রংপুরের উৎপীড়িত ছাত্রগণের

সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া ও তাহাদিগকে কর্তব্যে দৃঢ় থাকিতে অনুরোধ করিয়া এক টেলিগ্রাম প্রেরিত হউক।

'এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া তিনি বলেন যে, যদিও তিনি বর্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রায় শেষ করিয়াছেন তবুও যাহাকে প্রকৃত শিক্ষা বলে তাহা তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। গবর্নমেণ্ট যে কখনোই আমাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ শিক্ষা আমাদিগকে দিতে পারেন না, তাহা তিনি নিজের দৃষ্টান্ত হইতে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করেন।'

তখন তাঁর মনে কাব্যজিজ্ঞাসা ছিল, কিন্তু এই পরিবেশ তাঁর মনে এনে দেয় আর-একটি বিষয়, সেটি হচ্ছে— স্বদেশচিন্তা। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময় অতুলচন্দ্র তাই তফাতে থাকতে পারেন না, তিনিও জড়িয়ে পড়েন। জীবনে এটা তাঁর যেন দাগ, এইজন্যে ১৯৩১ সালে তাঁকে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি-পদের জন্যে নির্বাচন করেও তদানীন্তন ইংরেজ সরকার শেষবেশ তাঁকে ঐ পদে অধিষ্ঠিত হতে দেন না। ঘরে ঘরে বিভীষণ থাকেই। এও নাকি তদ্রূপ কোনো বিভীষণেরই কীর্তি। তাঁর নির্বাচন বাতিল করে দেবার জন্যে আমাদের দেশেরই লোক ইংরেজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, অতুলচন্দ্রের জীবনে দাগ আছে, তিনি স্বদেশচিন্তা ক'রে থাকেন এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্যে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সময়ে সেই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

বিচারপতি-পদ না পাওয়ার বিচার হয়ে গেল তাঁর এইভাবে। এতে তিনি যেন গৌরবান্বিতই। তিনি দেশের চিন্তা করেছেন, তাঁর উপর আরোপিত এই অপবাদটাই তাঁর গৌরব।

রংপুর জেলা স্কুল থেকে অতুলচন্দ্র এনট্রান্স পাস করে কলেজে পড়ার জন্যে আসেন কলকাতায়। কলকাতার হ্যারিসন রোডের উপর একটি মেস্‌এ তিনি বাস করতে আরম্ভ করেন। তিনি ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে— এখান থেকেই এফ. এ. ও বি. এ. পাস করেন। বি. এ.-তে তাঁর ছিল ইংরেজি ও ফিলজফি— তিনি ফিলজফিতে প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। তারপর

ফিলজফি নিয়ে এম. এ. পাস করেন প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে। তার পর তিনি ল পাস করেন।

ছাত্রজীবন সমাপ্ত ক'রে তিনি কিছুদিন ন্যাশনাল স্কুলে মাস্টারি করেন। এর পর রংপুর আদালতে ওকালতি করা আরম্ভ করেন। বছর তিন এখানে প্রাকটিস করার পর ১৯১৪ সালে অতুলচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টে এসে যোগ দেন।

এর কিছুদিন পর, হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার সঙ্গেসঙ্গে অধ্যাপনার কাজও গ্রহণ করেন। ১৯১৭-১৮ সালে তিনি যোগ দেন ইউনিভারসিটি ল কলেজে, রোমান ল ও জুরিস্‌প্রুডেন্সের অধ্যাপকরূপে। বছর দশ তিনি অধ্যাপনা করে তারপর সে কাজ ত্যাগ করেন।

বলেছি, অতুলচন্দ্রের মন কবি-মন। কাব্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ তাঁকে আকৃষ্ট করে কাব্যবিচারের প্রতি। কলকাতায় কলেজে অধ্যয়নের সময় থেকেই তিনি রংপুরের বিশিষ্ট পণ্ডিতের কাছে ধর্মশাস্ত্র ও অলংকারশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, কলেজের পাঠ শেষ হওয়ার পরেও তাঁর এই অলংকার-শাস্ত্র পাঠ শেষ হয় না। কলেজের পরবর্তী জীবনেও তিনি বিশিষ্ট পণ্ডিতের ছাত্ররূপে তাঁর কাছ থেকে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করেন। তাঁর এই পাঠ ব্যর্থ হয় না। পরবর্তী জীবনে এই অধ্যয়নই তাঁকে উৎসাহ দেয় গ্রন্থ-প্রণয়নে— 'কাব্যজিজ্ঞাসা'-রচনায়।

১৯১৪ সালে অতুলচন্দ্র কলকাতা হাইকোর্টে এসে যোগ দেন। প্রায় সেই সময়েই বঙ্গাব্দের ১৩২১ সালে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে অতুলচন্দ্রের সাহিত্যিক মনের মিল ছিল। কিরণশঙ্কর অতুলচন্দ্রকে প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। অল্প দিনের মধ্যেই প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে অতুলচন্দ্রের সৌহার্দ্য হয় এবং অতুলচন্দ্রও সবুজপত্র-গোষ্ঠীর একজন হয়ে ওঠেন। প্রমথ চৌধুরীর প্রতি অতুলচন্দ্র কৃতজ্ঞ —অকপটে তিনি স্বীকার করেন এ কথা। বলেন, "তাঁর তাড়া না হলে হয়তো আমার লেখা হত না।"

সবুজপত্রে অতুলচন্দ্রের প্রথম প্রবন্ধ হচ্ছে— অন্নচিন্তা। পরে সবুজপত্রে

প্রকাশিত প্রবন্ধ একত্র করে বের হয় অতুলচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'শিক্ষা ও সভ্যতা'। এর পর ১৩৩৩ সালের সবুজপত্রে ধারাবাহিকভাবে অতুলচন্দ্র লেখেন অলংকারশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা-প্রবন্ধ ; এই প্রবন্ধাবলী একত্র করেই বের হয় তাঁর গ্রন্থ 'কাব্যজিজ্ঞাসা'।

'পরিচয়' পত্রিকাতেও অতুলচন্দ্র অলংকারের বই লেখা আরম্ভ করেন, কিন্তু তা শেষ হয় না।

'বিশ্বভারতী পত্রিকা' 'বিচিত্রা' 'উত্তরা' 'প্রবাসী' 'আত্মশক্তি' 'অলকা' 'বিজলী' ইত্যাদি পত্রিকাতে অতুলচন্দ্র অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, এর মধ্যে বিজলীতেই লিখেছেন সবচেয়ে বেশি এবং এই লেখাগুলির প্রায় সবগুলিই রাজনৈতিক প্রবন্ধ।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে অতুলচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা একটা উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তাঁদের হৃদ্যতা এতই নিবিড় ছিল যে, তাঁরা নিয়মিত মিলিত না হয়ে পারতেন না। প্রথম প্রথম শনি ও রবি বার প্রমথ চৌধুরী আসতেন অতুলচন্দ্রের কাছে, তার পর সেই আসা আরম্ভ হয় রোজ। এমনও দেখা গিয়েছে যে, অতুলচন্দ্র হাওয়াবদলের জন্যে বা অন্য কোনো কাজে গেছেন বাইরে, তখনও প্রমথ চৌধুরী একবার এসে ঘণ্টাখানেক এঁর গৃহে বসে তার পর চলে যেতেন। এটা একটা অভ্যাসেই যেন দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আজ প্রমথ চৌধুরী নেই, আজ তাই মনের অনেকটা জায়গাই যেন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে।

কলকাতায় এসে তিনি ছাপানো পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হলেন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই পত্রিকার সঙ্গে সম্বন্ধ তাঁর ঘনিষ্ঠ। রংপুর থেকে তাঁরা 'ফুল' নামে হাতে-লেখা পত্রিকা বার করতেন। যখন তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠ করেন, সেই সময় থেকে কলেজ-জীবন পর্যন্ত সমানে এই কাগজ তাঁরা প্রকাশ করেন। তাঁর বয়স যখন দশ-এগারো তখন তিনি এই কাগজে একটা ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখেন —'মধুপুর-ভ্রমণ'। এ ছাড়াও তিনি এতে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন এবং লিখেছেন কবিতা— সনেট।

১৩০৭ বঙ্গাব্দ। অতুলচন্দ্রের বয়স তখন বারো-তেরো। এই সময়ের লেখা

তাঁর একটি কবিতা 'ফুল' পত্রিকায় পত্রস্থ হয়। এই কাগজগুলি এখনো তিনি সযত্নে রেখেছেন। 'ফুল' কাগজে তাঁর এই লেখাটি বের হয়—

কো কি ল

হে কোকিল, নিতি নিতি শুনি লোকমুখে
শীত নাই বর্ষে তব, দুঃখ নাই সুখে।
মাঝে-মাঝে তিক্ত হাসি, সিক্ত নাহি ক'রে
দেয় তোমার অমৃত নব মধুভারে।
ফুল, ফল, রৌদ্রঢাকা অনন্ত বসন্ত
তব, কভু নাহি ঢাকি দারুণ হেমন্ত
শিশিরের আবরণে, তারে চিরদিন
ক'রে রাখে সুনির্মল অনন্ত নবীন।
আহা, তবে তুমি পৃথিবীর অভিশপ্ত
জীব। দুর্দিনের অবসান কি যে তপ্ত
সুখ, হেমন্তের শেষে কি তীব্র মদিরা
বয়ে যায় বসন্তের শিরা-উপশিরা
ভেদ করি, তার তুমি পাও নি আস্বাদ ;
সুখ তব সুখ নয়, শুধু অবসাদ।

কবিতাটি পাঠ করিলেই বোঝা যায়, ছন্দের দিক থেকে এর উপর মাইকেল মধুসূদনের প্রভাব আছে, এবং ভাষার দিক থেকে আছে রবীন্দ্রনাথের। কৈশোরের কবিতায় এ ধরনের প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক।

ছেলেবেলা থেকেই সভা-সমিতিতে যাওয়া অতুলচন্দ্রের অভ্যাস। আজকাল বেশি কাউকে সভা-সমিতিতে যেতে না দেখে তিনি আশ্চর্য হন। এইসব জায়গায় যোগ দিলে নানা জনের নানা মত যেমন জানা যায়, মনের প্রসারতাও তেমনি বৃদ্ধি হয় বলে তাঁর বিশ্বাস।

খুব বৈঠকী এবং খুব আসরী বলা যায় অতুলচন্দ্রকে। তাঁর মন যে প্রসন্ন মন, তা বোঝা যায় তাঁর অভ্যাস ও শখ দেখে। অভিনয় দেখার তাঁর খুব

শখ বরাবরের। এখনো এই শখ অব্যাহত আছে। এখনো তিনি ভালো ভালো মঞ্চাভিনয় দেখতে যান। মাঝেমাঝে ভালো সিনেমাও দেখেন। বিদেশ থেকে কোনো অভিনয়ের দল এলে তাঁর যাওয়া চাইই। বাক্যকাল থেকেই থিয়েটারের প্রতি তার এই ঝোঁক আছে। অতি বালক-কালে তিনি নিজেদের শখের দলে রংপুরে অভিনয়ও করেছেন। বহুদিন থেকে তিনি হাইকোর্ট ড্রামাটিক ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট।

ছাত্রজীবনের কথা তাঁর মনে পড়ে এখনো। এখনো মনে পড়ে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক পার্সিভ্যালের কথা এবং ফিলজফির ডক্টর পি. কে. রায়ের কথা। এই দুইজন অধ্যাপক তাঁর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন।

এফ. এ. পড়ার সময় সার্ যদুনাথের কাছে অতুলচন্দ্র ইংরেজি পড়েছেন। যদুনাথ কুপার'স লেটারস্ পড়াতেন, খুব নোট দিতেন।

সবুজপত্রের যুগে বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে তাঁর খুব বন্ধুত্ব হয়। তার পর সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবার পর তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। এর পর সত্যেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসার পর আবার সেই বন্ধুত্ব দানা বাঁধে।

দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে অতুলচন্দ্র বরাবর উৎসাহী। বলেন— ছেলেদের মান ও শিক্ষার মান এখন আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। সার্ আশুতোষের প্রতি এজন্যে তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা; কেননা, আশুতোষই দেশের শিক্ষার ধারা পরিবর্তন ক'রে দিয়েছেন এবং তারই ফলে ধীরে ধীরে তার এই উন্নতি ঘটেছে; এবং সম্ভবত ভবিষ্যতে আরও উন্নত হবে।

অতুলচন্দ্র এখনো একজন মনোযোগী পাঠক। বাংলা বই যা প্রকাশিত হয়, তা তিনি সবই পাঠ করে থাকেন। ইংরেজি বই পড়েন বেশির ভাগই পলিটিক্স ও ইতিহাস সম্পর্কিত। গল্প উপন্যাস ও কবিতা পাঠে তাঁর খুব উৎসাহ— ইংরেজি ও বাংলা।

এ ছাড়া আছে ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠের শখ। অবশ্য, কেবল কোনান

ডয়েলের ডিটেকটিভ বই ছাড়া অন্য বই নয়। আর পড়েন জুলিয়ান হাক্সলির পিতামহ টমাস হাক্সলির বই।

মহাভারতের চরিত্রগুলি সম্বন্ধে বলা হয়ে থাকে এর বাইরে মানুষের আর অন্য কোনো চরিত্র নেই। অর্থাৎ নরনারীর যত রকমের চরিত্র সংসারে আছে, মহাভারতে তার সব রকম চরিত্রই চিত্রিত হয়েছে। অতুলচন্দ্রের জীবনের বড় রকমের একটা ইচ্ছে ছিল, মহাভারতের এক-একটি চরিত্র নিয়ে লেখার। বিচিত্রায় তিনি লেখাও আরম্ভ করেছিলেন— 'সাবিত্রী-উপাখ্যান'। কিন্তু নানা কারণে আর লেখা হয়ে ওঠেনি।

প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার ও তাঁর প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত প্রমথ চৌধুরীর 'প্রবন্ধসংগ্রহ' পুস্তকের সুদীর্ঘ ভূমিকা লিখে অতুলচন্দ্র সেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন বলা চলে।

রচিত গ্রন্থাবলী

শিক্ষা ও সভ্যতা
কাব্যজিজ্ঞাসা। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ
নদীপথে। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দ
জমির মালিক। ১৩৫১ বঙ্গাব্দ
সমাজ ও বিবাহ। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ
ইতিহাসের মুক্তি। ১৮৭৯ শকাব্দ : ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

খ্রীস্টজন্মের অনেক আগেই ভারতবর্ষ ছিল একটি সমৃদ্ধ এবং সুসভ্য দেশ। এই দেশের অধিবাসীরা ভারতের পূর্বাঞ্চলের দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং ভারতীয় আধিপত্য বিস্তার করে। ভারতের সেই স্বর্ণযুগের বহু স্বাক্ষর এখনো এইসব দ্বীপাবলীতে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে। ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের দৃষ্টি ভারতের এই স্বর্ণযুগের উপরই বিশেষভাবে নিবদ্ধ। তিনি অতীত মন্থন করে সুসভ্য প্রাচীন ভারতের পুরাতন ইতিহাস উদ্ধারেই বিশেষভাবে লিপ্ত।

মালয় জাভা সুমাত্রা বোর্নিয়ো বলি ইত্যাদি দেশে ও দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব কিভাবে বিস্তার লাভ করেছিল, রমেশচন্দ্র তার আনুপূর্বিক ইতিহাস উদ্ধার করে লিপিবদ্ধ করেছেন। ভারতীয় জনসাধারণ বিশেষ করে এই কারণেই তাঁকে সকৃতজ্ঞ নমস্কার জানায়।

সর্বকালে এবং সর্বদেশে যা ঘটে থাকে ভারতেও তাই ঘটেছিল। ধন-অর্জনের আকাঙ্ক্ষায় অভিযানে বহির্গত হয়েছিল ভারতীয় সন্তানেরা। তার নিজের দেশের সীমানার বাহিরেও কোথায় আছে ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার, সেই অনুসন্ধানে রত হয়েছিল প্রাচীন ভারতের বণিক। তাঁরা জানতে পেরেছিলেন ভারতের পূর্বদিকে ভারত-মহাসাগরে অবস্থিত যে অগণিত দ্বীপ আছে, সেইসব দ্বীপ স্বর্ণ ও মণিমাণিক্যের এবং মহার্ঘ খনিজ পদার্থের আধার। এইজন্যে তাঁরা এইসব দেশের নাম দেন সুবর্ণভূমি বা সুবর্ণদ্বীপ। ধন-অর্জনের স্পৃহা ব্যতীত অন্য কারণেও সেকালের ভারতবাসীর দৃষ্টি এদিকে পড়ে। সে কারণ হচ্ছে ধর্মপ্রচার করা। ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ যাজকেরা ধর্মের বার্তা নিয়েও ক্রমে ক্রমে দূরপ্রাচ্যের এইসব দ্বীপে উপস্থিত হন। এইভাবে ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে প্রাচ্যের এই দ্বীপপুঞ্জে। এসব ঘটনা আজের নয়, খ্রীস্টজন্মেরও আগের। খ্রীস্টীয় অব্দ আরম্ভ হবার বহু পূর্ব থেকে যেসব বৌদ্ধ জাতকের গল্প প্রচলিত আছে, সেইসব গল্পেও ভারতবর্ষ ও এই সুবর্ণ-

ভূমির মধ্যে নৌ-চলাচলের কাহিনী পাওয়া যায়। এইসব গল্প পুরোপুরি ইতিহাস না হলেও এবং নেহাত কিংবদন্তী হলেও এদের ভিত্তি একটা আছে। সে ভিত্তি হচ্ছে ভারতীয় সভ্যতা-বিস্তারেরই ঘটনা। বোর্নিয়ো জাভা মালয় ইত্যাদি স্থানে যেসব সংস্কৃত শিলালিপি উদ্ধার করা হয়েছে তার থেকেই জানা গিয়েছে যে, দূরপ্রাচ্যের এইসব দ্বীপে ভারতীয় ভাষা সাহিত্য ধর্ম রাজনীতি ও সমাজনীতি কি ভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল এবং স্থানীয় আচার-আচরণকে কিভাবে আত্মস্থ করে নিয়েছিল। বোর্নিয়োতে ও মালয়ে ভারতীয় দেবদেবীর বিস্তর মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে— বিষ্ণু ব্রহ্মা শিব গণেশ নন্দী স্কন্দ মহাকাল ইত্যাদি। এই মূর্তির গঠনপদ্ধতিতে ভারতীয় সুকুমার-কলার নিদর্শনও সুস্পষ্ট। কয়েক শতাব্দী ধরে এই প্রভাব ছিল অক্ষুণ্ণ, তার পর ধীরে ধীরে সে প্রভাব তিরোহিত হয়, কিন্তু তার নিদর্শন এখনো আছে মন্দিরগাত্রে, পাষাণ-ফলকে এবং মূর্তিতে মূর্তিতে।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র খাঁটি ভারতীয়, তাই তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বারা এতটা আকৃষ্ট হয়েছেন। যে সুবর্ণভূমির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন পুরাতন ভারতের বাণিকেরা, ভারতের সংস্কৃতির সেই সুবর্ণভূমির প্রতি ঠিক তেমনি আকৃষ্ট হয়েছেন রমেশচন্দ্র। তাই তাঁর এই নূতন ঐতিহাসিক অভিযান দূরপ্রাচ্যের এই দ্বীপাবলীর দেশে।

১৯২৮ সালে তিনি বিলেত যান। সেখান থেকে ফ্রান্স জর্মানি ইটালি মিশর ঘুরে জাভা সুমাত্রা আন্নাম কম্বোডিয়া মালয় শ্যাম ও বর্মা যান।

বললেন, "জাভা ছিল ডচ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। জাভার অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন ডচরা তাদের দেশে নিয়ে গেছে। তাই হল্যাণ্ডে গিয়ে ডচ ভাষা শিখে কার্ন ইনস্টিটিউটে কিছুটা তথ্যাদি ঘেঁটে জাভা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল হয়ে তার পর জাভা যাই। এইভাবে তথ্য জোগাড় করি। তারপর ফিরে এসে বই লিখি।"

আজ তিনি ইতিহাসে আকণ্ঠ ডুবে আছেন। কিন্তু উত্তরজীবনে তিনি যে ঐতিহাসিক হবেন, এ কথা বাল্যকালে তিনি নিজেও জানতেন না। তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের একটি সামান্য ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে তিনি শেষবেশ

ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছেন, বললেন, "আমার মেজদা বিজ্ঞান নিয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন, আমার জ্যেষ্ঠাগ্রজ তাই আমাকে বি. এ.-তে ইতিহাস নিতে বললেন— দু ভাই যাতে একই বিষয় না পড়ি, এইজন্যে। তখন বি. এ.-তে কেবল প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসই অনার্স নেওয়া যেত। তাই নিলাম। আমার মেজদা হয়ে গেলেন ইঞ্জিনীয়ার, আর আমি হলাম ঐতিহাসিক।"

এর আগে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে এফ. এ. পড়েন লজিক ও স্যানিটারি সায়েন্স নিয়ে। প্রথমে ইতিহাস নিয়েছিলেন, কিন্তু পরে ছেড়ে দেন। বললেন, "বরিশালে পড়তে গিয়েছিলাম অশ্বিনীকুমার দত্তের আকর্ষণে, তার পর কলকতায় রিপন কলেজে পড়তে আসি আর-একটি আকর্ষণে— সুরেন্দ্রনাথের কাছে পড়ব, এই ছিল আগ্রহ। তখন বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন নিয়ে দেশে সকলের মুখেই সুরেন্দ্রনাথের নাম। তাই তাঁর প্রতি আকর্ষণটা প্রবল হয়েছিল।"

১২ই এপ্রিল ১৯৫৩, ২রা বৈশাখ ১৩৬০। বালীগঞ্জের বিপিন পাল রোডে তাঁর গৃহে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলছি। ভালো লাগছিল, ভারতের একজন জননায়কের নামে যে-রাস্তা চিহ্নিত তাঁর গৃহটি সেই রাস্তার উপরেই। প্রথমজীবনে তিনি অশ্বিনীকুমার ও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, উত্তরজীবনে সেই আকর্ষণটাই সম্ভবত তাঁকে এনে উপস্থিত করেছে বিপিন পালের স্মৃতির সান্নিধ্যে। মানুষের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা কখনো নাকি বিফলে যায় না।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের (বঙ্গাব্দ ১২৯৫) ডিসেম্বর মাসে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খণ্ডপাড়া গ্রামে রমেশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। বারো বছর বয়স পর্যন্ত স্বগ্রামের মধ্যইংরেজি বিদ্যালয়ে ইনি শিক্ষালাভ করেন। তার পর কলকাতায় এসে ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন স্কুলে পঞ্চম মান শ্রেণীতে ভর্তি হন। এর পর কিছুদিনের জন্যে তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ (বর্তমানের স্কটিশ চার্চ) স্কুলে পড়েন। ১৯০২ সালে তিনি ঢাকা কলিজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন, তার পর হুগলি কলেজিয়েট স্কুলে পাঠ আরম্ভ করেন, এর পর পড়েন কলকাতায় হিন্দু স্কুলে এবং শেষবেশ ১৯০৫ সালে এনট্রান্স পাস করেন কটকের র‍্যাভেন্‌শ

কলেজিয়েট স্কুল থেকে। এনট্রান্স পরীক্ষায় তিনি প্রথম বিভাগে পাস করেন এবং বিভাগীয় বৃত্তি লাভ করেন।

বললেন, "অনবরত স্কুল-পরিবর্তন করার দরুন স্কুলের কোনো শিক্ষকের কথা তেমন মনে পড়ে না, কারও ছাপও আমার মনের উপর পড়েছে বোধ হয় না। কেবল একজনের কথা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, তিনি খণ্ডপাড়ার গ্রাম্য-স্কুলের শিক্ষক ব্রজেন্দ্রকুমার সেন।"

স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে তিনি বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে গিয়ে ভর্তি হন। এখানে মাত্র কিছুদিন পড়েই চলে আসেন কলকাতার রিপন কলেজে। ১৯০৭ সালে রিপন কলেজ থেকে এফ. এ. পাস করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে চতুর্থ স্থান অধিকার ক'রে এবং বৃত্তি লাভ করেন। এর পর বি. এ. ক্লাসে ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে—ইতিহাসে অনার্স নিয়ে। ১৯০৯ সালে পোস্টগ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ পেয়ে অনার্স-সহ বি. এ. পাস করেন। ১৯১১ সালে ইতিহাস নিয়ে এম. এ. প্রথম বিভাগে পাস করেন।

রমেশচন্দ্রের ছাত্রজীবন শেষ হল এখানে। এর পর শুরু হল কর্মজীবন।

১৯১৩ সালে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পান। এবং ঢাকার গবর্নমেণ্ট ট্রেনিং কলেজের লেকচারার নিযুক্ত হন। ১৯১৪ সালে এই পদ ত্যাগ করে তিনি লেকচারার রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এখানে তিনি একটানা সাত বৎসর কাজ করেন। এই সময় তিনি পি. এইচ-ডি. উপাধি পান ও গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর নিযুক্ত হয়ে ঢাকা যান। ঢাকায় তিনি ফ্যাকালটি অব আর্টসের ডীন ও জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট নির্বাচিত হন। এ ছাড়া সেখানকার অনেক প্রতিষ্ঠানের তিনি সদস্য-পদেও বৃত হন। ১৯৩৭ সালে রমেশচন্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন, প্রায় পাঁচ বছর এই সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত থাকার পর ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে অবসর গ্রহণ করেন।

কর্মের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি কর্মের সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছেন বলা যায়। এই সমুদ্রের নীচে যে অসংখ্য ঐতিহাসিক রত্ন লুকানো আছে,

অনুসন্ধানী ডুবারির ঐকান্তিকতা নিয়ে তিনি সেইসব রত্নের সন্ধানে এখন ব্যাপৃত। বিস্তৃতভাবে ভারতের ইতিহাস সংকলনের জন্যে বোম্বাইয়ের ভারতীয় ইতিহাস-সমিতি যে উদ্যোগ আরম্ভ করেছেন, কর্মের জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে রমেশচন্দ্র সেই ইতিহাস-সম্পাদন-কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। দশ খণ্ডে এই সংকলন প্রকাশিত হওয়ার কথা' ইতিমধ্যে তার দুই খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ ভারত-ইতিহাস-সংকলনের যে পরিকল্পনা করেছেন, তার এক খণ্ড এবং ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেস পরিকল্পিত ইতিহাসের দুই খণ্ড সম্পাদনা করেছেন রমেশচন্দ্র।

ইংরেজিতে লিখিত বাংলার ইতিহাসের যে প্রথম খণ্ডটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়, রমেশচন্দ্র সেই বিরাট গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি অধর মুখার্জি বক্তৃতা দেন এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে সার্ উইলিয়ম মেয়ার বক্তৃতা দেন। তাঁর এই দুইটি বক্তৃতাও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে, সে দুটির নাম —মহারাজা রাজবল্লভ ও কম্বোজদেশ।

এইসব ঐতিহাসিক পুঁথি সংকলন ও সম্পাদন ছাড়াও তিনি অন্যান্য কাজও করেছেন। অন্যান্য সহকর্মীদের সহযোগিতায় তিনি দুইটি সংস্কৃত গ্রন্থ সম্পাদন করেছেন— রামচরিত ও রাজা-বিজয়-নাটক।

বিভিন্ন গ্রন্থ সম্পাদন ও সংকলনের কাজ তিনি করে চলেছিলেন। এর মধ্যেই বিবিধ প্রবন্ধ তিনি রচনা করেন। এইসব রচনার সংখ্যা এক শতেরও অধিক। বিভিন্ন পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে।

অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে, তার মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে— অল ইণ্ডিয়া হিস্টরি কংগ্রেস ও অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কন্‌ফারেন্স। এই দুইটিরই তিনি সভাপতি ছিলেন। অল বেঙ্গল টিচার্স কনফারেন্স ও ওয়েস্ট বেঙ্গল টিচার্স কনফারেন্স, এই দুইটিতে রমেশচন্দ্র সভাপতিত্ব করেছেন। রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইনি সহ-সভাপতি। বোম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবনের শিক্ষকদের মধ্যে তিনি একজন অবৈতনিক সভ্য। এ ছাড়া আরও যেসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল

সেগুলি হচ্ছে— সেণ্ট্রাল অ্যাডভাইসরি বোর্ড অব আর্কিয়োলজি, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস কমিশন, ইণ্টার-ইউনিভারসিটি বোর্ড।

১৯৫০ সালে রমেশচন্দ্র কাশী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহুত হয়ে সেখানে যান। সেখানে কলেজ অব ইণ্ডোলজির প্রিন্সিপাল রূপে ইনি ১৯৫২ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ছিলেন।

বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তিনি ১৯৫৩ সালের জন্য সয়াজি রাও গায়কোয়াড় লেকচারার নিযুক্ত হন— বললেন, "ভারতের প্রতিরোধ-ক্ষমতা অত্যন্ত বেশি। এই ক্ষমতার উপর আমার শ্রদ্ধা আছে, আস্থাও আছে। ইতিহাসেও এর প্রমাণের অভাব নেই। মুসলমানেরা তাদের অভিযান আরম্ভ করার পঞ্চাশ বছরের মধ্যে স্পেন পর্যন্ত গিয়ে হাজির হয়, কিন্তু তাদের ভারত-অধিকার অত সহজে হয় নি। এই দেশ অধিকার করতে তাদের লেগেছিল ছয় শ বছর। বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার বক্তৃতার বিষয় এই— ভারতবাসীর প্রতিরোধ-ক্ষমতা।"

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত-সরকার উদ্যোগী হয়েছেন, রমেশচন্দ্র এর সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। বললেন, "ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরেই আমি একটি প্রবন্ধ লিখি। এই প্রবন্ধে আমি এইরূপ অভিমত প্রকাশ করি যে, অনতিবিলম্বে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি ইতিহাস রচনা করা বিশেষ প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গের গভর্নমেণ্টের কাছে আমি একটি বিশেষ প্রস্তাব পেশ করে বলি যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাংলা কতটা অংশ গ্রহণ করেছে তার একটা বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করা দরকার। দুঃখের বিষয়, পশ্চিম-বাংলার গবর্নমেণ্ট আমার এ প্রস্তাবে বিশেষ কোনো কান দেন না। অবশেষে জনকয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তি আমার প্রবন্ধটির নকল ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদের কাছে পাঠান। এর পর এ বিষয়ে সাড়া পাওয়া যায়। ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস কমিশনের কাছেও আমি অনুরূপ প্রস্তাব দাখিল করি। অবশেষে ভারত সরকার এই কাজের জন্য কয়েকটি কমিটি গঠন করেন এবং বর্তমানে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্যে একটি সম্পাদক-মণ্ডলী গঠিত হয়েছে। আমি এই সম্পাদকমণ্ডলীর একজন সদস্য।"

বলেছি, রমেশচন্দ্র খাঁটি ভারতীয়। কেবল ভারতভূমিতে জন্মলাভ করলেই ভারতীয় হওয়া যায় না, ভারতের আত্মার এবং ভারতের মৃত্তিকার প্রতি গভীর আকর্ষণ থাকলেই অকৃত্রিম ভারতসন্তান হওয়া যায়। কৃত্রিমতায় ভরা এই পৃথিবীতে এইরূপ অকৃত্রিম মানুষ পাওয়া কঠিন। রমেশচন্দ্রকে পেয়ে তাই আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। তিনি পুরাতন ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টেই তাঁর জীবনের কর্তব্য শেষ করতে চান না, তিনি তাই নবভারতের ইতিহাসে নূতন পৃষ্ঠা যোজনার জন্য এত ব্যগ্র।

বহু দেশে পর্যটন করেছেন রমেশচন্দ্র। ভারতের বাইরে তিনি গিয়েছেন অনেক স্থানে। কিন্তু সেখানেই তাঁর পর্যটন শেষ হয় নি। তিনি স্বদেশের প্রতিটি ঐতিহাসিক পীঠস্থানেও ভ্রমণ করেছেন। সর্বতীর্থসার ব'লে তিনি নিশ্চয়ই মনে করেছেন এই ভারততীর্থকে, তাই তিনি ভারতের মৃত্তিকা স্পর্শ ক'রে এগিয়ে চলেছেন— লখনউ দিল্লী আগ্রা মথুরা বৃন্দাবন পুনা নাসিক কটক ভুবনেশ্বর সাঁচী উদয়গিরি মাদ্রাজ তাঞ্জোর মাদুরা ত্রিচিনোপলি কুমারিকা ত্রিবাঙ্কুর মহীশূর বাঙ্গালোর কাশ্মীর এবং খাইবার পাস। ভারতের সব জায়গা দেখে বেড়িয়েছেন তিনি, ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছেন, আর গিয়েছেন পুনার নিকটবর্তী ভাজা-গুহায় ঐতিহাসিক গবেষণার উদ্দেশ্যে। এখানে বিস্তর ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে।

১৯২৮ সালেই ভারতের বাইরে থেকে ঘুরে এসেছেন তিনি। পুনরায় ১৯৫০ সালে যান ইটালীর ফ্লোরেন্সে— ভারত-সরকারের প্রতিনিধিরূপে ইউনেস্কোর বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের জন্যে। ১৯৫১ সালে যান ইস্তাম্বুলে— ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েণ্টালিস্ট-এর বাইশতম অধিবেশনে ভারত-সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে যোগদানের জন্য, সেখানে তিনি ইণ্ডোলজি-শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫২ সালে ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ওরিয়েণ্টালিস্টস-এর প্রতিনিধিরূপে যান প্যারিসে—ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফিলজফি অ্যাণ্ড হিউম্যানিস্টিক স্টাডিজের দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে যোগদানের জন্য।

ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েণ্টালিস্টসের কার্যনির্বাহক সমিতির ইনি

সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ইণ্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব ওরিয়েণ্টালিস্টের সংগঠনের জন্যে উক্ত কংগ্রেস যে কমিটি গঠন করেন, রমেশচন্দ্র তার সদস্য ছিলেন।

ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল ফর ফিলজফি অ্যাণ্ড হিউম্যানিস্টিক স্টাডিজের তিনি সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, 'সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড কালচারাল হিস্টরি অব ম্যানকাইন্‌ড' নাম দিয়ে ছয় খণ্ডে যে গ্রন্থ প্রণয়নের ও প্রকাশের জন্য ইউনেস্কো পরিকল্পনা করেছেন, তার আন্তর্জাতিক কমিশনের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন রমেশচন্দ্র এবং এর সম্পাদনা-সমিতির সদস্যও নির্বাচিত হয়েছেন।

ভারত সরকার সম্প্রতি তাঁর উপর একটি কর্তব্যভার ন্যস্ত করেছেন। সুভাষচন্দ্র বসু গত যুদ্ধের সময় যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন এবং তার যে উদ্বৃত্ত অর্থ এখন থাইল্যাণ্ডে জমা আছে, তার দ্বারা সম্প্রতি একটি ট্রাস্ট গঠিত হয়েছে। এই ট্রাস্টের উদ্যোগে ব্যাংককে কয়েকটি বক্তৃতাদানের যে ব্যবস্থা হয়েছে, ভারত সরকার রমেশচন্দ্রকে সেই বক্তৃতা দিবার জন্য নির্বাচন করেছেন।

তাঁর জীবনের কথা হচ্ছিল এবং সেই সঙ্গে ইতিহাসেরও কথা। এর মধ্যে ঐতিহাসিক পুরুষদের কথাও আরম্ভ হল। তিনি বললেন, "ঐতিহাসিক পুরুষদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেন অশোক, তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে আমি অভিভূত হই। এরই প্রভাবে আমি আমার পুত্রের নাম রাখি অশোক।"

একটু থেমে বললেন, "আর-একজন হচ্ছেন শিবাজি। নেপোলিয়নের সঙ্গে তুলনা করে বলা যায় শিবাজি নেপোলিয়নের চেয়েও বড় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। নেপোলিয়ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাহায্য পেয়েছিলেন। কিন্তু শিবাজী? শিবাজীকে নিজের শক্তির দ্বারা পারিপার্শ্বিক অবস্থা সৃষ্টি করে নিতে হয়। মোগল-সাম্রাজ্যের তখন কি প্রবল প্রতাপ, সামান্য একটি জায়গীরদারের ছেলে সেই মোগল-সাম্রাজ্যের চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল।"

বললেন, "আর-একজন হচ্ছেন বুদ্ধ। তাঁর হৃদয়ের কথাটাই বেশি করে মনে হয়। বিশ্বের প্রতি তাঁর যে মমতা, তার তুলনা নেই।"

ভারতের প্রতিরোধ-ক্ষমতার কথা তিনি বলেছেন। এবার বললেন

ভারতের দুর্বলতার কথা। আমাদের দেশের জাতিবৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতার তিনি ঘোরতর বিরোধী। এ ছাড়া হিন্দুসমাজে নারীদের অধিকারও দিনে দিনে সংকুচিত হচ্ছে দেখে তিনি ক্ষুব্ধ। বললেন, "এই দুইটি বিষয়ে আমি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছি, সেইসব প্রবন্ধে দেখাতে চেষ্টা করেছি যে, ভারতের স্বর্ণযুগের যে ইতিহাস আমরা পাই, তাতে দেখা যায় সে-সময়ের ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি এই ব্যবস্থা দুটি কখনো অনুমোদন করে নি। আসল কথা এই, এসব বৈষম্য ভারতীয় সংস্কৃতির ঘোরতর বিরোধী। এর অবসান অচিরে আবশ্যক।"

কেবল দেশের কথা নয়, দশের কথাও চিন্তা করেছেন রমেশচন্দ্র। তাঁর এই উক্তি থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর দৃষ্টি বেশির ভাগই ছিল ভারতের বাইরে প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জের দিকে, এরই মধ্যে তিনি নিজের ঘরের কথা ভুলে যান নি, বাংলার কথা। তাই তিনি বংলাকেও সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলার কোনো ইতিহাস ছিল না, সেই লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করেছেন রমেশচন্দ্র।

নীচে নেমে এলাম। বিপিন পাল রোডে রাত্রি নেমেছে। সামান্য একটু এগিয়ে গেলেই দেশপ্রিয় পার্ক। পার্কের গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম বাসএর প্রতীক্ষায়।

রচিত গ্রন্থাবলী

বাংলার ইতিহাস

Corporate Life in Ancient India

Early History of Bengal

Outline of Ancient Indian History & Civilization

Ancient Indian Colonies in the Far East—3 Vols

Hindu Colonies in the Far East

Greater India

Ancient India

Inscriptions of Kambuja

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

যে গাছের শিকড় মাটির গভীর পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এবং মাটির রস টানবার উপযুক্ত শক্তি রাখে, সেই গাছই হয়ে ওঠে মহীরুহ। অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে গেছে, এমন অনেক গাছের খবর আমরা পাই। বটগাছ থেকে অজস্র ফল ঝরে পড়ে মাটিতে; সব ফলেই যদি গাছ জন্মাত তা হলে পৃথিবী বটের অরণ্যে ছেয়ে যেত। তা হলে বটগাছের মর্যাদা নষ্ট হয়ে যেত, বটের বটত্ব খর্ব হয়ে যেত। কিন্তু সব ফল থেকে অঙ্কুর গজায় না, সব অঙ্কুর বৃক্ষ হয়ে ওঠে না। মাটি থেকে রস টানবার উপযুক্ত বলিষ্ঠ মূল নিয়ে না নামলে মাটির স্নেহ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

বরিশাল জেলার মাহিলাড়া গ্রামের অতি সামান্য একটি বালক উত্তর-জীবনে ঐতিহাসিক সুরেন্দ্রনাথ সেন রূপে যে প্রখ্যাত হলেন, তার মূলে আছে একটি বলিষ্ঠ মূলের কাহিনী। যে-দেশে তাঁর জন্ম সেই ভারতভূমির মাটির গভীরে তিনি তাঁর মননের শিকড় চালনা করতে এবং সার সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, এইজন্যই তিনি আজ পরিপূর্ণ মহীরুহে পরিণত হতে পেরেছেন।

সমন্বয়ের ভূমি এই ভারতবর্ষ। ভারতের এই আত্মার বাণীর সঙ্গে যিনি পরিচিত হতে পেরেছেন, সেই ঐতিহাসিকই সার্থক ঐতিহাসিক। কেবল তথ্যের ও সন-তারিখের স্তূপ রচনা করাই ঐতিহাসিকের কাজ নয়। সুরেন্দ্রনাথ ভারতের আত্মার প্রকৃত পরিচয় লাভ করেছেন। ধর্মবিজয়ী অশোক ভারতের সর্বত্র গুহালেখ গিরিলেখ শিলালেখ ও স্তম্ভলেখ ছড়িয়ে রেখে গেছেন। সেই লেখমালার পাঠোদ্ধার ক'রে যা জানা গেছে, সেই হচ্ছে ভারতের রাষ্ট্রঘোষ। দুই সহস্রাধিক বর্ষ গত হয়েছে, অনেক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তবুও ভারতের এই বাণীর বদল হয় নি। ঐতিহাসিকরূপে সুরেন্দ্রনাথ এই বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাই তিনি হয়ে উঠতে পেরেছেন সার্থক।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার রূপে সুরেন্দ্রনাথ কাজ করেছেন ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত। কয়েক-বছরের প্রবাসজীবন কাটিয়ে তিনি ফিরে এসেছেন। বালীগঞ্জ ফার্ন রোডে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে, বাড়ির নাম রেখেছেন নিজের গ্রামের নাম অনুসারে— মাহিলাড়া। সে বাড়িতে ভাড়াটে। তাই তাঁকে উঠতে হয়েছে রসা রোডে।

৩০এ মার্চ ১৯৫৩, ১৬ই চৈত্র ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, সোমবার। সন্ধ্যের দিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। বললেন, "এখানে আছি। বই-পত্তর সব আনতে পারি নি। জায়গা কম। অর্ধেক বই আমার এক বন্ধুর বাড়িতে রেখেছি।"

মাঝের একটা ঘরে আমরা ব'সে। দু পাশে দুটো দরজা— দুটো ঘর। দেখলাম, ছাত পর্যন্ত উঁচু কাঠের র‍্যাক বইতে বোঝাই। তবু অর্ধেক আনতে পারেন নি। সব বই নিয়ে এলে হয়তো নিজেদের চলাফেরার বা থাকারই জায়গা হবে না।

বললেন, "এখানে তবু তো আছি কোনো রকমে। দিল্লী থেকে প্রথমে এসে যখন পৌঁছই, তখন এর চেয়েও একটা ছোট ঘরে উঠি। ভারি অসুবিধে হয়েছিল। কোনো রকমে ছিলাম। রান্নারই জায়গা ছিল না।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আমার জিজ্ঞাস্য কি কি শুনে বললেন, "বাংলার ১২৯৭ সনের ১৩ই শ্রাবণ, খ্রীস্টীয় ১৮৯০ সালের ২৯এ জুলাই বরিশাল জেলার মাহিলাড়ায় আমার জন্ম। বাল্যজীবন কাটে টাঙাইলে। সেখানে আমার পিতা স্বর্গত মথুরানাথ সেন জমিদারি স্টেটে কাজ করতেন। সন্তোষের ইস্কুলে আমার প্রথম পাঠ আরম্ভ। সেখানে দু বছর পড়ি।"

তার পর ফিরে আসেন দেশে। মাহিলাড়ার কাছেই বাটাজোড় গ্রাম। এখানে অশ্বিনীকুমার দত্তের ইস্কুলে ভর্তি হন— বাটাজোড় হাই ইংলিশ স্কুলে। ১৯০৬ সালে এখান থেকে এনট্রান্স পরীক্ষায় পাস করেন তৃতীয় বিভাগে। ১৯০৮ সালে এফ. এ. পাস করেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে— এ পরীক্ষাও তৃতীয় বিভাগে।

পর পর দুটো পরীক্ষাই তৃতীয় বিভাগে পাস করেন। ছাত্রজীবনে কোনো উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। এদিকে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়াও অসুবিধে।

তাই ছাত্রজীবনে ইস্তফা দিয়ে তিনি কাজ নিলেন— শিক্ষকতার কাজ। ব্রজমোহন স্কুলে মাস্টারি করতে আরম্ভ করলেন। কিছুদিন ব্রজমোহন স্কুলে, কিছুদিন নদীয়ার শিকারপুরে তিনি শিক্ষকতা করেন। কিন্তু শিক্ষকতা করেই জীবন কাটবে কি না হয়তো এ সম্বন্ধে মনে সংশয় ছিল। কেননা শিক্ষকতা করার মত উপযুক্ত শিক্ষায় তিনি শিক্ষিত নন, তৃতীয় বিভাগে পাস করা একজন এফ. এ. মাত্র। এই জন্যে তিনি এই সময় প্লিডারশিপও পড়েন। বছর তিন মাস্টারি করার পর তিনি সে কাজ ত্যাগ করেন। প্লিডারশিপ পরীক্ষাও দেওয়া হয় না।

তিনি এলেন ঢাকায়। ১৯১১ সালের কথা। তিন বছর যে-ছাত্রজীবনের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, পুনরায় গ্রহণ করলেন সেই ছাত্রজীবনই। বললেন, "১৯১৩ সালে ইতিহাস অনার্স নিয়ে বি. এ. পাস করি, এবং ১৯১৫ সালে ইতিহাসে এম. এ. পাস করি— প্রথমশ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান পাই; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হন প্রথম।"

মাটি থেকে রস সংগ্রহের উপযুক্ত শক্তি ছিল না যে শিকড়ের, তিন বছর ছাত্রজীবন থেকে দূরে থেকে সম্ভবত সেই শক্তি সঞ্চয় করে ফিরে এলেন সুরেন্দ্রনাথ। তাই নতুন উদ্যমে আরম্ভ হল তাঁর পাঠ। তাই তৃতীয়শ্রেণীর ছাত্র উন্নীত হলেন প্রথমশ্রেণীতে। যাঁর জীবনে কোনো সম্ভাবনার লক্ষণমাত্র ছিল না, সেই জীবন পুষ্পিত হয়ে উঠল বর্ণময় সম্ভাবনাতে। কিন্তু মনে উৎসাহ এলেও পথ তখনো সম্ভবত প্রস্তুত হয় নি। এম.এ. পাস করেই তিনি তাই জীবনে অগ্রগমনের পথে পা বাড়াতে পারলেন না। নতুন কাজের সন্ধান করলেন। অথচ মনের মত কাজ সহজে সংগ্রহ হয় না। তিনি গতানুগতিক একটি কাজ গ্রহণ করলেন। বলদার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী তখন ঢাকায় থাকতেন; সুরেন্দ্রনাথ তাঁর গার্ডিয়ান টিউটার হলেন।

বছরখানেক এই গৃহশিক্ষকতা করার পর তাঁর অগ্রগতির পথ যেন উন্মুক্ত হল। ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে জব্বলপুর গভর্নমেন্ট কলেজে ইংরেজি ও ইতিহাসের অধ্যাপক হয়ে তিনি সেখানে গেলেন। এক বছরের কিছু বেশি সময় তিনি জব্বলপুরে ছিলেন। পর বৎসর অক্টোবর মাসে তিনি কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের পদ পেয়ে ফিরে এলেন বাংলাদেশে। ১৯১৭ থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত লেকচারার থাকার পর ১৯৩১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ-অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

বললেন, "এর পর যাই দিল্লীতে। ন্যাশনাল আর্কাইবস্‌এ (ইম্পিরিয়াল রেকর্ড ডিপার্টমেণ্টে)। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর পর্যন্ত এখানে থাকি। এই বছরই পাঁচ মাসের জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর হই। ন্যাশনাল আর্কাইবস থেকে রিটায়ার করে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক হই। ১৯৫০এর এপ্রিলে আবার রেক্টর হই; জুলাইতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার হই। ১৯৫৩র ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলাম। সে কাজ ত্যাগ করে বহুদিন বাদে ফিরে এসেছি বাংলাদেশে।"

স্বল্পভাষী লাজুক-প্রকৃতির মানুষ সুরেন্দ্রনাথ। নিজের কথা বলতে তিনি যেন সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত বোধ করতে লাগলেন। বললেন, "আমার সম্বন্ধে যদি কিছু জানতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমার এক বন্ধুর নাম বলতে পারি। তিনি আমার যাবতীয় খুঁটিনাটি জানেন।"

বললাম, "যাঁর কথা বলছেন তাঁকে আমি চিনি, তাঁর কাছ থেকে আপনার কথা অনেক শুনেছি।"

কেবল কর্মজীবনের কথা বললেন এতক্ষণ। তাঁর জীবনের ইতিহাস-প্রবণতা ও গবেষণার বিষয় উল্লেখ ক'রে এবার বললেন, "জব্বলপুর থাকা-কালে মারাঠা ভাষা শিক্ষা করি। তারপর মহারাষ্ট্র ইতিহাস নিয়ে গবেষণা আরম্ভ করি। এই গবেষণার ফলে একটা থিসিস লিখি পেশোয়ারের রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে। এই থিসিসের উপরই ১৯১৭ সালে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পাই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের লেকচারার থাকা-কালে ১৯২২ সালে মহারাষ্ট্রীয়দের রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণার ফলে পি.এইচ-ডি. ডিগ্রি পাই।"

ভারতের ইতিহাস উদ্ধার করায় রত হয়েই তিনি জীবনের ধারার সন্ধান পেয়েছেন। এই ধারা অনুসরণ করে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন বলেই আজ

তিনি বরেণ্য ও বরণীয় হয়ে উঠেছেন। ভারতের মাটির অভ্যন্তরে নিজের জীবনের মূল চালনা করা সম্ভবত একেই বলে। তাঁর ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে কেউই তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা করে নি ; তিনি নিজেও হয়তো নিজের উপর কোনো ভরসাই রাখতে পারেন নি। তাই জীবনে যদি কোনো ধারা পাওয়া যায় তারই চেষ্টায় তিনি প্লিডারশিপ পড়া আরম্ভ করেন। কিন্তু সে পথ তাঁর পথ নয়। তাঁর পথ ইতিহাসের পথ।

কিন্তু, এ পথ তাঁর পথ কেন ?

বললেন, "ছেলেবেলা থেকেই ইতিহাসের প্রতি আমার টান ছিল। তখন আমার বয়স আট। আমি রজনীকান্ত গুপ্তের আর্যকীর্তি পড়ে মুগ্ধ হই। এই কীর্তিকাহিনী আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। এ-বিষয়ে আরো সম্যকভাবে বিস্তারিতভাবে জানবার জন্ম আমার প্রবল আগ্রহ হয়। এরপর আর একটা বই পড়ি— বাংলায় অনূদিত টডের রাজস্থান। সেই থেকে ইতিহাসের দিকে ঝোঁক ছিল।"

বাল্যকালের এই ঝোঁক ছাত্রজীবনের নানারূপ পাঠ্যপুস্তকের চাপে হয়তো সাময়িকভাবে চাপা পড়ে থাকবে। ইতিহাস হয়তো গণিতের দ্বারা পীড়িত হয়ে থাকবে। তাই হয়তো এনট্রান্সে এবং এফ.এ.-তে তাঁর পরীক্ষার ফল তাঁর এবং তাঁর পরিজনদের পক্ষে উৎসাহজনক হয় নি।

অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তিনি বললেন, "ব্রজমোহন কলেজে যখন পড়ি, তখন অশ্বিনীবাবু আমাকে খুব স্নেহ করতেন। এফ.এ. পাস করার পর আমার পড়াশুনা যখন বন্ধ ছিল, তখন অশ্বিনীবাবু আমাকে উৎসাহ দেন ও ইটালীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম সম্বন্ধে বই লিখতে বলেন।"

সুরেন্দ্রনাথের জীবনে অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাব তা হলে নিশ্চয়ই আছে। তৃতীয় বিভাগে পাস করা একটি ছাত্রের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ থেকেই অনুমান করা যায় যে, এই ছাত্রের প্রতিঅশ্বিনীকুমারের আস্থা ছিল। এর দ্বারা যে কাজ হতে পারে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তা না হলে অতি সাধারণ একটি ছাত্রের উপর তাঁর এতটা দাবি হয় কী করে ? কি করে তাঁকে বলা যায়, একটি দূরদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী রচনা করতে ?

সুরেন্দ্রনাথ বললেন, "অশ্বিনীকুমার দত্তের প্রভাব আমার জীবনে আছে। তিনিই আমার জীবনে আত্মপ্রত্যয় এনে দিয়েছেন। একটা কথা তো বোঝেন — আমি যে তৃতীয় বিভাগে এফ. এ. ও এনট্রান্স পাস করি। তার পর আবার নতুন করে পড়াশুনা আরম্ভ করব, তার জন্যে দরকার ছিল কেবল উৎসাহের নয়, আত্মবিশ্বাসের। অশ্বিনীকুমার আমাকে এই বিশ্বাসটি দিয়েছেন।"

এই প্রসঙ্গে নাম করলেন আর-এক জনের— তিনি ঢাকা কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক র‍্যাম্‌স্‌বোথাম। অশ্বিনীকুমার ও র‍্যাম্‌স্‌বোথাম তাঁর জীবনের দুটি নক্ষত্র।

ব্রজমোহন কলেজে পড়ার সময় তিনি বাল্যকালের ইতিহাস-প্রবণতায় নূতনভাবে উৎসাহ পান রজনীকান্ত গুহের কাছে, তার উপর রজনীকান্তের মেগাস্থেনিসের ভারত-বিবরণ পাঠ ক'রে ভারতের ইতিহাসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পায়। আর-এক জন হচ্ছেন বরিশালের স্বনামধন্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়—ইনিও সুরেন্দ্রনাথকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেন।

এইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে একটি সাধারণ জীবন অসাধারণতার পথে যাত্রা শুরু করে। সেই যাত্রা কখনো মন্থর কখনো দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হয়ে এগিয়ে চলল দিনের পর দিন।

বললেন, "ইতিহাসের উপর ঝোঁকের কথা বলেছি। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই শিবাজীর উপর আমার আকর্ষণ। রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাস মহারাষ্ট্রের জীবন-প্রভাত পড়েই এটা হয়েছে।"

গৃহশিক্ষকতা করতে করতে জব্বলপুর কলেজে গিয়ে অধ্যাপক হবার পরই তাই তিনি প্রথমেই আরম্ভ করেন মারাঠা ভাষা শিখতে এবং তাই তাঁর প্রথম গবেষণাই হয় মহারাষ্ট্রের ইতিহাস নিয়ে এবং এই গবেষণার দ্বারাই পি.এইচ-ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। শিবাজী সম্বন্ধে তিনি বললেন, "শিবাজীর আইডিয়ালিজ্‌ম্‌ ও ইমাজিনেশন আমার সবচেয়ে ভালো লাগে।"

কৃতজ্ঞতা জানালেন তিনি সার্‌ আশুতোষের উদ্দেশে। এঁরই চেষ্টায় সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা-কালে অধ্যয়ন ও গবেষণাদি কার্যের বিশেষ সুবিধে পেয়েছেন। বললেন, "ইউনিভারসিটি লাইব্রেরিতে

ইতিহাসের বই ছিল না। যখন আমার যে বই দরকার হত, তাঁকে জানানো মাত্র তিনি সেই বই লাইব্রেরিতে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন, তখনই তিনি পুনায় প্রফেসার লিময়েকে চিঠি লিখেছেন বই পাঠাবার জন্যে। তাঁর কাছ থেকে কিভাবে উৎসাহ ও সাহায্য পেয়েছি আশুতোষ-প্রয়াণের সময় মাসিক বসুমতীতে এক প্রবন্ধে তা বিস্তারিতভাবে বলেছি।"

ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা ও গবেষণা ইত্যাদি করতে একাধিক ভাষা জানা দরকার। এই জন্যে সুরেন্দ্রনাথকে কয়েকটি ভাষা শিক্ষা করতে হয়েছে। তিনি ইংরেজি বাংলা ও ভারতীয় আর দু-একটি ভাষা বাদে ফরাসি ও পোর্তুগীজ জানেন। সংস্কৃতও কিছুটা জানেন।

বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত তাঁর অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থগুলি বহুপ্রচলিত ও বহুসমাদৃত। সুরেন্দ্রনাথের রচনার ভাষায় লালিত্য ও সরলতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশের প্রতি তাঁর যে মমত্ববোধ আছে, তা তাঁর জীবনেই প্রকাশ করেছেন, তাঁর রচনার মধ্যেও তাঁর জীবনের সেই প্রতিফলন পাওয়া যায়।

দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আছে। পুনা ভারত-ইতিহাস-সংশোধকমণ্ডল, ইণ্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেস, ইণ্ডিয়ান হিস্টরিকাল রেকর্ডস কমিশন, অ্যাকলুইড সোসাইটি ইত্যাদির তিনি সদস্য; ইণ্ডিয়ান হিস্টরি কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন একবার। এ ছাড়া ইংলণ্ডের রয়াল হিস্টরিকাল সোসাইটির ফেলো, ফ্রান্সের Ecole Francaise D. Extreme-Orientএর অনারারি সদস্য ও Institute Historique et Heraldique -এর অনারারি করেস্পণ্ডিং মেম্বার।

১৯৫৮ সালে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অনারারি ডক্টরেট উপাধি গ্রহণের জন্য আমেরিকা হয়ে লণ্ডন যাত্রা করেন।

কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে দিল্লী থেকে তিনি চলে এসেছেন। কর্মের জীবন শেষ হয়েছে, কিন্তু জীবনের কর্ম শেষ হয় নি। বললেন, "এখন প্রথম কাজ হচ্ছে— মাদ্রাজের সার্ উইলিয়ম মেয়ার-এর জন্যে প্রবন্ধ রচনা করা। সেখানে বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছি কিছু দিন হল।"

তার পর আপাতত আছে আরও দুটি কাজ—হিস্টরি অব ইণ্ডিয়ার নবম ভলিউম লেখার ভার পড়েছে তাঁর উপর। "এটা হবে ভারত-ইতিহাসের period of transition সম্বন্ধে—১৭১৩ থেকে ১৭৭৮ সালের ইতিহাস।"

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে—মহারাষ্ট্রীয় নৌবাহিনী সম্বন্ধে। বাল্যে শিবাজীর প্রতি যে টান হয়, সেই আকর্ষণ এখন পর্যন্ত শ্লথ হয় নি নিশ্চয়। শিবাজীর দেশের কথা তাই এখনো তিনি ভোলেন নি, বললেন, "মহারাষ্ট্রীয় নৌবাহিনী সম্বন্ধে লিখবার ইচ্ছা আছে।"

দিল্লীর ন্যাশনাল আর্কাইবস্ আগে ছিল রেকর্ড রাখবার একটা গুদাম বিশেষ। এখানে নথিপত্র জমা করা হত, কিন্তু সেসব ব্যবহারের সুবিধা ছাত্ররা বিশেষ পেত না। সুরেন্দ্রনাথের হাতে এর ভার পড়ার পর তিনি এটিকে নতুন ভাবে গঠন করেন। তিনি একে স্টোরের স্তর থেকে ইন্‌স্টিটিউটের স্তরে উন্নীত করেন। বললেন, "ছেলেরা আগে এখানে ঢুকতে পারত না। এখন ওখান থেকে পাবলিকেশনস হয়। তার একটা পরিকল্পনা আমি রচনা করি।"

রুদ্ধদ্বারকে তিনি অবারিত করে দিয়েছেন। তাঁর জীবনের ও চরিত্রের সঙ্গে এই কাজের সামঞ্জস্য যেন আছে। তিনি নিজেও এমনই অবারিত ও উদার।

সেই উদার-জীবনের সান্নিধ্য থেকে এবার বিদায় নিয়ে নেমে এলাম সংকীর্ণ গলি পথে। সেখান থেকে প্রশস্ত রসা রোডে। রসা রোডে তখন রাত্রি নেমেছে। নীচে কালো পীচের পথ, উপরে কালো আকাশ। মাঝে মাঝে নক্ষত্রের মত জ্বলছে ইলেক্‌ট্রিকের আলো।

রচিত গ্রন্থাবলী

অশোক
হিন্দুগৌরবের শেষ অধ্যায়
প্রাচীন বাংলা পত্র-সংকলন
পেশোয়ারদিগের রাষ্ট্রশাসনপদ্ধতি

পাখীর কথা

কয়েকটি পাঠ্য-পুস্তক

ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ। পোর্তুগাল থেকে পাণ্ডুলিপি এনে সম্পাদন

Shiva Chatrapati.

Administrative System of the Mahrattas.

Military System of the Mahrattas.

Foreign Biographies of Shivaji.

Studies in Indian History.

Early Career of Kanhoji Angria and other papers.

Off the Main Track.

Indian Travels of Thevenot and Carery.

Sanskrit Documents in the National Archives of India.

Calender of Persian Correspondence, Vol. VII & XII.

Eighteen Fifty Seven

শ্রীসুশীলকুমার দে

আসলে মানুষের জীবন একটি ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ। কিন্তু এজন্যে আক্ষেপ ক'রে লাভ নেই। জীবনের এই ক্ষণস্থায়িত্বকে উপেক্ষা ক'রে পৃথিবী মন্থন ক'রে চলেছে মানুষই। মাটির পৃথিবীকে সোনার পৃথিবী ক'রে গড়ে তোলার জন্যে মানুষের উদ্যমের শেষ নেই। পৃথিবীর দুর্গমতম সর্বোচ্চ পর্বতশীর্ষে মানুষই তার পদচিহ্ন এঁকে রেখে এল, আবার গভীরতম সমুদ্রের তলদেশ স্পর্শ করার জন্যে চলেছে উদ্যোগ। এই উদ্যোগ আর উদ্যম যদি পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের মধ্যে থাকত, তাহলে হয়তো রাতারাতি পৃথিবীর চেহারা পালটে যেত। কিন্তু এ উদ্যম সকলের মধ্যে থাকে না, যাদের মধ্যে থাকে, প্রকৃতপক্ষে মন আছে তাদেরই এবং হয়তো অকৃত্রিম মানুষও তারাই। এই উদ্যম আর উদ্যোগের, সাধনার আর আরাধনার, নিষ্ঠার ও চেষ্টার উজ্জ্বল আলোকপাতে জীবনের বুদ্বুদ সপ্তরঙের সুষমায় মণ্ডিত ক'রে তোলাই তাই প্রকৃত মানুষের কাজ। যাঁরা এইভাবে নিজেদের জীবনকে এই ইন্দ্রধনুর ছটা দান করতে পারেন, আমরা তাঁদেরই কথা স্মরণ করি; যদি তার দ্বারা আমরা আমাদের জীবনে কোনো প্রেরণা লাভ করতে পারি— এই আমাদের ইচ্ছে। ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর জীবনকে ফুটে উঠেই ফেটে পড়তে দেন নি, নানা সাহিত্যের ও নানা ভাষার আলোক আহরণ ক'রে তিনি তা যেন নিজের জীবনের উপর নিক্ষেপ ক'রে সে-জীবনকে বর্ণচ্ছটায় ভরে তুলেছেন। এইজন্যে কেবল বাংলার বা ভারতের অধিবাসীই নয়, ভারতের সীমানার বাইরেও সুধী-সমাজ তাঁর নাম স্মরণ করে।

সুশীলকুমারের জীবনকে বলা যায় ত্রিভাষার যুক্তবেণী। ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত— এই তিনটি ভাষাই তিনি সমান নিষ্ঠার সঙ্গে অনুশীলন অধ্যয়ন ও অর্জন করেছেন এবং এই তিন ভাষার সাহিত্য তিনি সমান উদ্যমের সঙ্গে মন্থন করেছেন। এইজন্যেই তাঁর খ্যাতি ভারতের সীমানার মধ্যেই বাঁধা নেই, সে খ্যাতি বাইরেও বিস্তৃত। বাংলা বা সংস্কৃত সম্বন্ধে অর্জিত তাঁর

জ্ঞান তিনি আন্তর্জাতিক ভাষার সাহায্যে সর্বজাতির মধ্যে বিতরণ করতে পেরেছেন।

সুশীলকুমার কলকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান লাভ ক'রে প্রথমে কলকাতা ও পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বসমেত পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক-পদ অলংকৃত করে ১৯৪৭ সালে অবসর গ্রহণ করেছেন।

সুশীলকুমারের পিতা ছিলেন ডাক্তার। ডাক্তার সতীশচন্দ্র দে দীর্ঘকালের কর্মজীবনের পর ৫ই নবেম্বর ১৯৪৯ (১৯এ কার্তিক ১৩৫৬) পরলোক-গমন করেন। সতীশচন্দ্র ডাক্তার হিসাবে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে গেছেন, অশেষ সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন; কিন্তু এই সঙ্গে সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল— ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি পারদর্শী ছিলেন। সুশীলকুমার সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ পেয়েছেন পিতারই কাছ থেকে।

বললেন, "বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আমার আকর্ষণ ছেলেবেলা থেকেই। এ আকর্ষণ আমি লাভ করি আমার পিতামহের কাছ থেকে, বিশেষ ক'রে আমার পিতার কাছ থেকে। আমার প্রতিটি রচনা আমার পিতা সযত্নে দেখে এবং সংশোধন ক'রে দিয়েছেন— এ-কথা জানিয়ে আমি বিশেষ গর্ব বোধ করছি। আমার পিতা সারাজীবন ছাত্রের মত অধ্যয়ন করতেন।"

প্রসিদ্ধ দেশনায়ক লেখক ও সমাজ-সংস্কারক কিশোরীচাঁদ মিত্রের নাম বর্তমানে হয়তো সকলের জানা নেই; কিন্তু সেকালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। বহুবিবাহপ্রথার নিরোধ, স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসার প্রভৃতি নানা কল্যাণকর বিষয়ে তৎকালীন হিন্দু কলেজের ছাত্র ও ইণ্ডিয়ান-ফিল্ড পত্রিকার সম্পাদক কিশোরীচাঁদ বিশেষভাবে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন, এবং পরে কলকাতার অন্যতম ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। মাদ্রাজ থেকে প্রত্যাগত নিরাশ্রয় মাইকেল মধুসূদন দত্ত এঁরই ভবনে প্রথমে আশ্রয়লাভ করেন এবং এঁরই আদালতে কিছুদিন ইণ্টারপ্রেটার নিযুক্ত হন। কিশোরীচাঁদের অগ্রজ ডিরোজিয়োর শিষ্য 'আলালের ঘরের দুলালে'র প্যারীচাঁদ মিত্র। বললেন, "আমার পিতামহী কুমুদিনী এই কিশোরীচাঁদের

একমাত্র কন্যা। আমার বয়স যখন সাত, তখন আমার পিতামহী লোকান্তরিতা হন।"

১২ই জুন ১৯৫৩, ২৯এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। শ্যামবাজারের চৌধুরী লেনে বসে সুশীলকুমারের সঙ্গে কথা বলছি। সন্ধ্যে গড়িয়ে গেছে। চারদিক স্তব্ধ। মনে হচ্ছে যেন ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতা উল্টে উনবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে গিয়েছি, যে শতাব্দী বাংলাদেশের ও বাংলাসাহিত্যের সুবর্ণযুগ বলে চিহ্নিত। বললেন, "এক নম্বর দমদম রোডের বাগানবাড়িতে সে-গাছটা আমি দেখেছি, যার নীচে বসে প্যারীচাঁদ আলালের ঘরের দুলাল লিখেছিলেন।"

সুশীলকুমারের পিতা সতীশচন্দ্র ডাক্তারী পাস করার পর কয়েক বছর কলকাতার মেডিকাল কলেজে ও সাউথ সুবার্বন (বর্তমানের শম্ভুনাথ পণ্ডিত) হাসপাতালে রেসিডেন্ট সার্জেনের কাজ ক'রে কটকে বদলি হন। সুশীল-কুমারের ছাত্রজীবন তাই শুরু হয় কটকে।

১৮৯০ সালের ২৯এ জানুয়ারী (বঙ্গাব্দ ১৭ই মাঘ ১২৯৬) বুধবার, সুশীলকুমার কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কটকের র‍্যাভেন্‌শ কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৯০৫ সালে বৃত্তিসহ তিনি প্রথম বিভাগে এনট্রান্স পাস করেন; ১৯০৭ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ফার্স্ট আর্টস পরীক্ষা পাস করেন এবং বৃত্তি পান; ১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে প্রথমশ্রেণীর অনার্স সহ বি এ. পাস করেন এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি পান। সংস্কৃত ও দর্শন ছিল বি. এ তে তাঁর সাবসিডিয়ারী সাবজেক্ট; ১৯১১ সালে ইংরেজিতে প্রথমশ্রেণীতে এম. এ. পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক ও পুরস্কার পান। পর বৎসর পাস করেন বি. এল.।

১৯১২ সাল বি. এল. পাস করার সঙ্গেসঙ্গেই তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন। ১৯১৩ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির লেকচারার ছিলেন, এবং ১৯১৯ সালে ভারতীয় ভাষার এবং ১৯২৩ সালে সংস্কৃতের লেকচারার হন।

তাঁর জীবন যে ত্রিভাষার যুক্তবেণী, তা স্বীকৃত হয়ে গেল যেন এখানেই। একই বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি বিভিন্ন ভাষার অধ্যাপক-পদে বৃত হলেন।

১৯১৫ সালে তিনি গ্রিফিথ মেমোরিয়াল পুরস্কার পান এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থরচনার দরুন ১৯১৭ সালে লাভ করেন প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করার পর তিনি ঐ বছরেই ঢাকায় যান ইংরেজির রীডার নিযুক্ত হয়ে। ক্রমশ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হন। ঢাকায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৩০এ জুন তিনি এই পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

ঢাকায় যাবার আগে তিনি অধ্যয়নার্থে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তিনি জার্মানির বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। লণ্ডনে স্কুল অব ওরিয়েণ্টাল স্টাডিজে অধ্যয়নের পর সংস্কৃত অলংকার-সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি থিসিস লিখে তিনি ডি. লিট. উপাধি পান—থিসিস পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর তিনি ভাষাতত্ত্ব ও প্রাকৃত সম্বন্ধে অধ্যয়ন করেন। এর পর আসেন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে, এখানে ভাষাতত্ত্ব আলোচনার ও সম্পাদনার পুস্তক পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন।

সুশীলকুমারের জীবনে অন্বেষণের ও অনুসন্ধানের স্পৃহা দেখা যায়। এইভাবে তথ্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধান করে ক্রমশ তিনি এগিয়ে চলতে লাগলেন। জ্ঞানও একজাতীয় নেশা। যতই জ্ঞানের সন্ধান লাভ করা যায়, ততই আরও অধিক জ্ঞানের তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকিয়ে ওঠে। সেই পিপাসা নিবৃত্তির জন্যে অন্বেষণ করতে হয় আরো। কিন্তু এ পিপাসার শেষ নেই।

তাঁর এই অন্বেষণের নেশা তাঁকে কিভাবে পেয়ে বসেছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি পুরাতন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের উদ্যোগ করেন। বললেন, "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অবসর গ্রহণ করলে ঢাকায় আমি তাঁর পদে নিযুক্ত হই। সেখানে গিয়ে দেখি, লাইব্রেরিকে বড় করার অনেক সুযোগ আছে। শাস্ত্রীমহাশয়ের উদ্যোগে এ কাজের জন্যে গবর্নমেণ্ট থেকে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু সে টাকা খরচ হয়নি—

জমাই ছিল। আমি আরো কিছু টাকা সংগ্রহ করি গবর্নমেণ্টের কাছ থেকে। তারপর পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে এইসব পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ শুরু করি। এ কাজে উৎসাহী ও উদ্যোগী সহকর্মীরূপে পেয়েছিলাম অনেককে, তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নলিনীকান্ত ভট্টশালী।"

একটু থেমে বললেন, "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের কাছে আমি কখনো পড়িনি। তিনি আমার শিক্ষক না হলেও তিনি আমার গুরু ছিলেন। আমি তাঁর আদর্শ অনুসরণেরই চেষ্টা করেছি।"

পূর্ববঙ্গের গ্রামে গ্রামে অজস্র পুঁথি ছড়ানো আছে। গ্রামের অনেকে এসব পুঁথি রক্ষা করাটা একটা দায় ব'লে মনে করেন; কোথাও কোথাও পুঁথি রোদে-জলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এসব পুঁথির যে কোনো দাম আছে, এ খবরই তারা রাখে না। বললেন, "দশ হাজার টাকা খরচ করে প্রায় বিশ হাজার পুঁথি আমরা সংগ্রহ করি। তাহলে পুঁথি-প্রতি খরচ পড়ল কত? মাত্র আট আনা। কিন্তু পুঁথির দাম টাকা আনায় নয়, অনেক অমূল্য পুঁথি এর মধ্যে আছে। ১৯৪৭ সালে আমি ঢাকা থেকে চলে আসার সময় পর্যন্ত প্রায় পঁচিশ হাজার পুঁথি জোগাড় হয়েছিল। কিন্তু সেসবের এখন কী অবস্থা— বলতে পারিনে।"

১৯২৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি-কমিটি গঠিত হয়। সেই সময় থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কুড়ি-একুশ বছর ধ'রে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে যেসব পুঁথি সংগ্রহের ব্যবস্থা তিনি করেছেন, সেসব পুঁথির উপর তাঁর মমতা থাকা স্বাভাবিক। তাঁর কথায় এই মমতার আঁচই যেন পাওয়া গেল।

পুরাতন পাণ্ডুলিপির প্রসঙ্গ আলোচনা করতে করতে পুরাতন কালের এবং সেকালের কবিদের কথা উঠল। বললেন, "কবি অক্ষয়কুমার বড়ালের ও দেবেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। তাঁদের কাছে প্রায়ই যেতাম। অক্ষয়কুমার তখন বৃদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় একটা পাঠশালা করেন— শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা। পাঠশালা দেখাশুনা করার জন্যে জব্বলপুর থেকে মাঝেমাঝে দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় আসতেন। আমাদের তখন কবিতা লেখার বাতিক ছিল, তাই এঁদের সঙ্গে দেখা করার উৎসাহ ছিল খুব।"

সুশীলকুমার গবেষণা ও অধ্যাপনায় আত্মনিয়োগ করে থাকলেও কবিতা-রচনায় তাঁর শিথিলতা নেই। কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন।

তখন তিনি এম. এ. পাস করে কলেজ থেকে বেরিয়েছেন, এই সময় বীরভূম থেকে প্রকাশিত 'বীরভূমি' কাগজে প্রথম কবিতা লেখেন। তাঁরা তখন জনকয়েক ছিলেন এই কাগজের লেখক— গিরিজাপ্রসাদ রায়চৌধুরী, কুলদাপ্রসাদ মল্লিক, আর মোহিতলাল মজুমদার। প্রথমজীবনের এই শখ ও সুখ উত্তরজীবনেও তিনি বর্জন করতে পারেন নি। প্রকৃত কবি-মন থাকলে সে-মনকে কোনো কাজের বা কোনো কর্তব্যের গুরুভারই বিকল করে দিতে পারে না।

তাঁর এই কাব্যপ্রবণতা এবং অন্বেষণের স্পৃহা একত্রে মিলিত হয়ে দান করেছে আর-একটি সংগ্রহ, সেটি হচ্ছে—বাংলার প্রবাদ। বাংলার হাটে মাঠে ঘাটে, লোকের মুখে মুখে অজস্র প্রবাদ স্রোতের শ্যাওলার মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে বহুকাল থেকে। সুশীলকুমার সেইসব প্রবাদ সংগ্রহের কাজে মন দিলেন। এবং নয় হাজারের উপর প্রবাদ একত্র করে, প্রতি প্রবাদের অর্থ দিয়ে, একটি বৃহৎ গ্রন্থ সংকলন করে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এই গ্রন্থে তিনি যে ভূমিকা দিয়েছেন, তাতে প্রবাদের বিষয় বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে।

বাংলাদেশে সংস্কৃতচর্চা, বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস উদ্ধার ইত্যাদি কাজে ব্যাপৃত থেকে তিনি বাংলার তথা ভারতবাসীর ধন্যবাদভাজন, বাংলার প্রবাদ সংকলন করে তিনি দ্বিগুণ ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন।

১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বাংলা গবেষণার জন্য সরোজিনী সুবর্ণপদক পান। এবং ১৯৫০ সালে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক-ভাষণাবলী দিয়েছেন।

সুশীলকুমারের গুণের সৌরভ ছড়িয়েছে চারদিকে। তাই বিভিন্ন স্থান থেকে তাঁর কাছে সম্মানের উপঢৌকন এসেছে। তিনি বেঙ্গল সংস্কৃত অ্যাসো-সিয়েশনের কেন্দ্রীয় সংগঠন কমিটির সদস্য, কলকাতা সংস্কৃত কলেজের গবর্নিং বডির সদস্য, পশ্চিমবাংলা সরকার সংস্কৃত শিক্ষা সংক্রান্ত অনুসন্ধান সমিতি নামে যে কমিটি গঠন করেছেন তিনি তার সদস্য, সংস্কৃত কলেজে গবেষণা-বিভাগ

গঠনের জন্যে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কমিটি গঠন করেছেন সুশীলকুমার তার চেয়ারম্যান ছিলেন। পরে গবেষণা-বিভাগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯৫০-৫৬)। বর্তমানে (১৯৫৮) তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

এ ছাড়া ভারতের বিভিন্ন স্থানেও তাঁর কর্মকেন্দ্র প্রসারিত। অল্ ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য আছেন ১৯২৪ সাল থেকে। ভারতীয় পণ্ডিতবর্গের ও ইউরোপীয় মনীষীদের সহযোগিতায় মহাভারতের একটি বৃহৎ সংস্করণ প্রকাশের জন্যে পুনার ভাণ্ডারকর রিসার্চ ইনস্টিটিউট যে উদ্যোগ করেছেন, সুশীলকুমারকে সেই কাজে সহায়তার জন্যে ১৯৩৪ সালে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সুশীলকুমার এই মহাভারতের উদ্যোগপর্ব সম্পাদন করেছেন, ১৯৪০ সালে এই সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। পুনরায় ১৯৪৮ সালে অনুরুদ্ধ হয়ে দ্রোণ-পর্ব সম্পাদনের কাজে এখন ব্যাপৃত হয়েছেন।

১৯৩৫ সালে আন্নামালী বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত সাহিত্যের উপর কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়ার জন্য এঁকে আমন্ত্রণ করেন, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ও ঐ কাজের জন্যে ১৯৪৩ ও ১৯৪৭ সালে তাঁকে দুবার আমন্ত্রণ করে নিয়ে যান। ১৯৪৪ সালে সিংহল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদ গ্রহণের জন্য তাঁর কাছে অনুরোধ আসে, কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত কারণে তা গ্রহণ করতে পারেন না।

১৯৪৯ সালে পুনার ডেকান কলেজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঐতিহাসিক ভিত্তিতে একটি সংস্কৃত অভিধান রচনার পরিকল্পনার জন্যে তাঁকে আহ্বান জানান। এই অভিধান এখন সংকলিত হচ্ছে। তিনি এর সম্পাদনা-কমিটির সভাপতি।

এ গেল ভারতের বিভিন্ন স্থানের কথা। ১৯৫০ সালে ভারতের বাইরে থেকে তাঁর আহ্বান আসে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় এক বছরের জন্যে তাঁকে ভিজিটিং লেকচারার করেন।

১৯১৮ সাল থেকে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সে সময়ে

তিনি সাহিত্য-পরিষদের অবৈতনিক গ্রন্থাগারিক ছিলেন। ১৯৫০ সালে এবং পুনরায় ১৯৫৬ সালে পরিষদের সভাপতি হয়েছেন।

১৯৫৪ সালে ফেব্রুয়ারিতে লণ্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে অনারারি ফেলো নির্বাচিত করেছেন। ১৯৫৬ সালে তিনি ভারত-সরকার কর্তৃক গঠিত সংস্কৃত কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হন।

সুশীলকুমার অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া তিনি ভারতীয় ও ইউরোপীয় বিভিন্ন পত্রিকায় শতাধিক মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

জীবনে শ্রদ্ধা ও ভক্তি না থাকলে কর্তব্যে নিষ্ঠা আসে না। সুশীলকুমার যে জীবনে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছেন, তার মূলে আছে তাঁর এই শ্রদ্ধা এবং এই ভক্তি। তাঁর পিতা-মাতার প্রতি এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রতি তাঁর আন্তরিক ভক্তিই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র।

হেসে বললেন, "আমরা সব বুড়োর দলে চলে গিয়েছি দেখছি। বয়সও অবশ্য হয়েছে। কিন্তু সবই যে এখনো মনে হচ্ছে, এই সেদিনের ঘটনা। বাল্যকালটাকে খুব দূর বলে বোধ হচ্ছে না, সব স্পষ্ট চোখে ভাসছে।"

তাঁর কাছে তাঁর পিতামহ ও পিতামহীর গল্প শুনতে শুনতে ঠিক এমনি-ভাবেই স্পষ্ট হয়ে জেগে উঠেছিল উনবিংশ শতাব্দীটা আমার চোখের সামনে। তাঁর পিতামহীর পিত্রালয়ে মাইকেল মধুসূদন উঠেছেন অতিথি হয়ে—যেন চাক্ষুষ দেখতে পেলাম এই চিত্রটা।

চোখ থেকে সব ছবি মুছে ফেলে উঠে পড়লাম। রাত্রি হয়েছে। বিনয়ে নম্র হয়ে উঠে এলেন সুশীলকুমার। বললেন, "আপনার অনেক সময় নষ্ট হল।"

এ কথার কোনো উত্তর দিতে পারলাম না। বারান্দা ও প্যাসেজের আলো জেলে দিতেই লোহার গেট পার হয়ে চলে এলাম রাস্তায়।

রচিত গ্রন্থাবলী

History of Bengali Literature
in the Nineteenth Century. খ্রী ১৯১৯

দীপালি। কাব্যগ্রন্থ। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

প্রাক্তনী। কাব্যগ্রন্থ। ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

লীলায়িতা। কাব্যগ্রন্থ। ১৩৪১ বঙ্গাব্দ

অদ্যতনী। কাব্যগ্রন্থ। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ

বাংলা প্রবাদ। ১৩৫২ ; ২য় সং ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

ক্ষণদীপিকা। কাব্যগ্রন্থ। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ

সায়ন্তনী। কাব্যগ্রন্থ। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ

দীনবন্ধু মিত্র। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ

নানা নিবন্ধ। ১৩৬০ বঙ্গাব্দ

Studies in the History of Sanskrit Poetics.
2 Vols। খ্রী ১৯২৩, ১৯২৫

Treatment of Love in Sanskrit Literature. খ্রী ১৯২৯

Early History of the Vaisnava faith and Movement in Bengal. খ্রী ১৯৪২

History of Sanskrit Literature. খ্রী ১৯৪৭

সম্পাদিত গ্রন্থাবলী

The Vakrokti-Jivita. খ্রী ১৯২৮

The Kicaka-Vadha of Nitivarman. খ্রী ১৯২৯

The Padyavali. খ্রী ১৯৩৪

The Krisna-Karnamrita of Lilasuka Bilvamangala. খ্রী ১৯৩৮

The Jnana-Dipika of Devabodha. খ্রী ১৯৪৪

The Maghaduta. খ্রী ১৯৫৭

The Udyoga and Drona parvan of the Mahabharata.
খ্রী ১৯৪০, ১৯৫৮

An Anthology of Epic and Purana Literature (jointly with Dr. R. C. Hazra). খ্রী ১৯৫৮

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার নায়ক অমিত রায় গেছে শিলং পাহাড়ে: সেখানে সে সময় কাটায় পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার-গাছের ছায়ায় বসে বই পড়ে। সাধারণে যা করে অমিত তা করে না; তাই ছুটিতে গল্পের বই না পড়ে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্যের বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব।"

৪ঠা আশ্বিন ১৩৬০, ২১এ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩। সকালবেলা বালীগঞ্জে তাঁর বাড়িতে বসে ভাষাতত্ত্ববিদ্ ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জীবনকথা শুনছি। বললেন, "রবীন্দ্রনাথ আমাকে ইম্মরট্যালাইজ ক'রে দিয়ে গেছেন। আজ থেকে বহু বর্ষ পরে যখন শেষের কবিতার পাঠকেরা রেফারেন্সের জন্যে খুঁজবে, কে ছিলেন এই সুনীতি চাটুজ্যে, তখন আমার আর-কিছু খুঁজে নাও যদি পায়, তবু এই নামটা সম্বন্ধে তো পাদটীকায় অবশ্যই কিছু লেখা থাকবে।"

১৯২৭ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুনীতিকুমার গিয়েছিলেন মালয়-উপদ্বীপ সুমাত্রা যবদ্বীপ বলিদ্বীপ ও শ্যাম দেশে। এই ভ্রমণের বিবরণ সুনীতিকুমার তাঁর দ্বীপময় ভারত গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণনা করেছেন। আর, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাভা-যাত্রীর পত্রে বর্ণনা দিয়েছেন সুনীতিকুমারের, লিখেছেন, "আমাদের দলের মধ্যে আছেন সুনীতি। আমি তাঁকে নিছক পণ্ডিত বলেই জানতুম। অর্থাৎ আস্ত জিনিসকে টুকরো করা এবং টুকরো জিনিসকে জোড়া দেওয়ার কাজেই তিনি হাত পাকিয়েছেন ব'লে আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এবার দেখলুম, বিশ্ব বলতে যে ছবির স্রোতকে বোঝায়, যা ভিড় ক'রে ছোটে এবং এক মুহূর্ত স্থির থাকে না, তাকে তিনি তাল-ভঙ্গ না করে মনের মধ্যে দ্রুত এবং সম্পূর্ণ ধরতে পারেন, আর কাগজে-কলমে সেটা দ্রুত এবং সম্পূর্ণ তুলে দিতে পারেন। এই শক্তির মূলে আছে বিশ্বব্যাপারের প্রতি তাঁর মনের সজীব আগ্রহ। তাঁর নিজের কাছে তুচ্ছ বলে কিছু নেই, তাই তাঁর কলমে তুচ্ছও এমন-একটি স্থান পায় যাতে তাকে উপেক্ষা করা যায় না। সাধারণত এ কথাটা বলা চলে

যে, শব্দতত্ত্বের মধ্যে যারা তলিয়ে গেছে, শব্দচিত্র তাদের এলাকার সম্পূর্ণ বাইরে, কেননা চিত্রটা একেবারে উপরের তলার। কিন্তু সুনীতির মনের সুগভীর তত্ত্ব ভাসমান চিত্রকে ডুবিয়ে মারে নি— এই বড় অপূর্ব। সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠিগুলি তোমরা যথাসময়ে পড়তে পাবে— দেখবে, এগুলো একেবারেই বাদশাই চিঠি। এতে চিঠির ইম্পিরিয়ালিজম, বর্ণনা-সাম্রাজ্য সর্বগ্রাহী, ছোট-বড় কিছুই তার থেকে বাদ পড়ে নি। সুনীতিকে উপাধি দেওয়া উচিত— লিপি-বাচস্পতি কিংবা লিপি-সার্বভৌম কিংবা লিপি-চক্রবর্তী।"

কিন্তু এ তিনটির কোনোটিই নয়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাংলাভাষা-পরিচয় গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে সুনীতিকুমারকে ভাষাচার্য বলে উল্লেখ করেছেন। বললেন, "আমি এই উপাধিটা আমার নামের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকি। তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। এ হচ্ছে তাঁর স্নেহেরই দান। আমি তা গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য মনে করি।"

১৯৪৮ সালে এলাহাবাদের হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দানের জন্যে তাঁকে সাহিত্যবাচস্পতি উপাধি দিয়েছেন; বারো-তেরো বার তিনি গিয়েছেন ভারতের বাইরে— বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে এসেছেন সম্মানের ডালি, কিন্তু এই শতসহস্র সম্মানের মধ্যে সেরা সম্মান বলে তিনি মনে করেন রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ওই উপাধিটা।

১৮৯০ সালের ২৬এ নভেম্বর, ১১ই অগ্রহায়ণ ১২৯৭ বঙ্গাব্দ, তারিখে হাওড়া জেলার শিবপুরে সুনীতিকুমারের জন্ম। তাঁর জন্ম হয় রাসপূর্ণিমার দিন, ঐ তিথি শিখধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরুনানকের জন্মতিথি। সুনীতিকুমারের জন্মের সঙ্গেসঙ্গে চন্দ্রগ্রহণ লেগে গিয়েছিল। চৈতন্যদেবের জন্ম হয়েছিল ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার দিন, সেদিনও ছিল চন্দ্রগ্রহণ। বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হন বৈশাখী পূর্ণিমার দিন। পূর্ণিমার সন্ধ্যায় জন্ম হয়েছিল বলে এইসব মহাপুরুষের নামের কথা সুনীতিকুমার স্মরণ করেন এবং তার জন্য মার্জনীয় আনন্দ অনুভব করেন।

বাংলার রাঢ়ী ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ-বংশের বলে বাঙালী সমাজে এঁরা পরিচিত। সুনীতিবাবু এই কান্যকুব্জ-সম্পর্ক বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করেন। কান্যকুব্জ-ব্রাহ্মণেরা মাথার গড়নে বেশির ভাগ হচ্ছে 'দীর্ঘকপাল',

আর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা একেবারে পৃথক, তাঁরা হচ্ছেন 'মধ্যকপাল'। এঁদের বংশের ইতিহাস বা কিংবদন্তী মোটামুটি এই— তেত্রিশ পুরুষ আগে একাদশ বা দ্বাদশ শতকে তাঁর পূর্বপুরুষ বীতরাগ পশ্চিম-বাংলায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। তার পর বীতরাগের প্রপৌত্র সুলোচন বল্লাল সেন কর্তৃক সম্মানিত হন এবং পশ্চিমবাংলায় চাটুতি নামক গ্রাম দান-রূপে পান। এই গ্রামের নাম থেকেই তাঁদের বংশের নাম হয় চাটুর্যা বা চাটুর্জ্যে, ইংরেজি বিকারে চাটার্জি, এবং তারই সংস্কৃত রূপ হয় চট্টোপাধ্যায়। ত্রয়োদশ শতকে বাংলাদেশ যখন তুর্কিদের দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন এই চট্টোপাধ্যায়-পরিবার পূর্ববঙ্গে চলে যান। বীতরাগ থেকে কুড়ি পুরুষ পরে হচ্ছেন প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ যাদব সার্বভৌম ; ছাব্বিশ পুরুষ পরে হচ্ছেন ভৈরবচন্দ্র— ইনিই সুনীতিকুমারের প্রপিতামহ। ভৈরবচন্দ্র পূর্ববঙ্গ থেকে এসে হুগলী জেলায় বসবাস আরম্ভ করেন— এঁর পুত্রের নাম ঈশ্বরচন্দ্র, ইনি সুনীতিকুমারের পিতামহ। ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজি ও ফার্সি ভাষা খুব ভালো জানতেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময়ে (১৮৫৭) ইনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী রূপে উত্তরভারতে কাজে নিযুক্ত ছিলেন ; ইনি কলিকাতায় নিজের বাড়ি তৈরি করে সেখানে বসবাস আরম্ভ করেন। সুনীতিকুমারের পিতা হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৪৫) ইংরেজের সদাগরী আপিসে চল্লিশ বছর একটানা কাজ করেন— ইনি একজন কবি ছিলেন এবং খুব ভালো বেহালা বাজাতে পারতেন।

বললেন, "মধ্য-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে আমি। আমার ঠাকুরদা ও বাবা ছিলেন কেরানি। সুকিয়াস্ স্ট্রীটে হচ্ছে আমাদের বাড়ি। সেখান থেকে কলুটোলার কাছে মতি শীলের ফ্রী স্কুলে পড়তে যেতাম। রাস্তাটা খুব লম্বা। খাটো জামা গায়ে খালি পায়ে হেঁটে যেতাম এই পথ।"

তাঁর পিতামহ যখন মারা যান সুনীতিকুমারের বয়স তখন আনুমানিক ষোলো। পিতামহের কথা তাঁর স্পষ্ট মনে আছে, তাঁর মুখ থেকে দু-চারটি ফার্সি বয়েৎ তিনি শুনেছেন, আজও সুনীতিকুমারের তা কণ্ঠস্থ ; তিনি আবৃত্তি করে তা শোনালেন। আর বললেন পিতার কথা— ইনিও সুনীতিকুমারের উপর

কম প্রভাব বিস্তার করেন নি। পিতামহ ও পিতা— এই দুইজনের প্রভাবেই সম্ভবত ভাষার ও সাহিত্যের প্রতি সুনীতিকুমার আকৃষ্ট হন। সেই আকর্ষণ উত্তরোত্তর প্রবল হয়ে তাঁকে উত্তরজীবনে বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতত্ত্বজ্ঞ করে তুলেছে, এবং তিনি রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ পেয়েছেন ভাষাচার্য উপাধি-রূপে।

কুড়ি টাকা বৃত্তি পেয়ে, ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে, সুনীতিকুমার এনট্রান্স পাস করেন। তার পর স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন, এখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে তিনি ইণ্টারমিডিয়েট আর্টস্ পাস করেন, ইতিহাসে প্রথম হন। ১৯১১ সালে ইংরেজিতে প্রথমশ্রেণীর অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. পাস করেন, এবং ১৯১৩ সালে প্রথমশ্রেণীতে প্রথম হয়ে ইংরেজিতে এম. এ. পাস করেন। এম. এ.তে তাঁর বিশেষ বিষয় ছিল প্রাচীন আর মধ্যযুগের ইংরেজি ভাষা আর সাহিত্য, এবং জারমানিক এবং ইংরেজি ভাষাতত্ত্ব। ১৯১৮ সালে ইংরেজির এই ছাত্র পাস করেন সংস্কৃতের পরীক্ষা— বেঙ্গল গভর্নমেণ্ট সংস্কৃত অ্যাসোসিয়েশনের বৈদিক সংস্কৃতের মধ্য-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন সুনীতিকুমার। পর বৎসর তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও জুবিলি গবেষণা পুরস্কার লাভ করেন।

বিদ্যানিকেতনের শিক্ষা এইখানে শেষ হল বটে, কিন্তু বিদ্যা ও জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা যেন প্রবলতর হয়ে উঠল সুনীতিকুমারের। কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর নিরুত্তাপ ও নিস্তেজ অধ্যাপক হয়েই তিনি স্থির থাকিতে পারলেন না। নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্য তিনি সচেষ্ট হলেন। তাঁর পরবর্তী জীবনের ধারা ও গতি লক্ষ্য করলেই এর জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

এম. এ. পাস করার পরই তিনি কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজি অধ্যাপকরূপে যোগ দেন, তার পরের বছরই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেণ্টের ইংরেজির অধ্যাপক হন। এইখানে অধ্যাপনার সময়েই তাঁর অধ্যয়ন ও গবেষণা যুগপৎ চলতে থাকে এবং এরই ফলে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি ও জুবিলি গবেষণা বৃত্তি পান।

১৯১৯ সালে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অধ্যয়নের জন্য ভারত-সরকারের প্রদত্ত বৃত্তি পেয়ে সুনীতিকুমার ইউরোপে গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি লণ্ডন বিশ্ব-

বিশ্বালয়ে পাঠ ক'রে ফোনেটিক্‌সে ডিপ্লোমা পান ও ১৯২১ সালে লণ্ডন বিশ্ব-বিশ্বালয়ের ডি.লিট. উপাধি লাভ করেন— তাঁর ডক্টরেটের থিসিসের বিষয় ছিল ইণ্ডো-আরিয়ান ফিললজি। লণ্ডনে তিনি বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকের নিকট ফোনেটিক্‌স্‌, ইণ্ডো-ইউরোপিয়ান লিঙ্গুইস্টিক্‌স্‌, প্রাকৃত, ফার্সি সাহিত্য, পুরাতন আইরিশ, পুরাতন ইংলিশ, গোথিক ইত্যাদি বিষয় পাঠ করে তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেন। তার পর আসেন প্যারিসে। প্যারিস বিশ্ব-বিশ্বালয়ের ছাত্র হিসাবে এখানে যোগ দেন। এখানে তিনি বিভিন্ন শিক্ষায়তনে বিভিন্ন অধ্যাপকের অধীনে পাঠ ও গবেষণা করেন। এখানে তিনি যেসব বিষয় পাঠ করেন সেগুলি হচ্ছে— স্লাভ ও ইণ্ডো-ইউরোপিয়ান ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন সগডিয়ান ও প্রাচীন খোতানী ভাষা, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার ইতিহাস এবং অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাতত্ত্ব।

তাঁর এই বিদেশগমন সার্থক করে তোলেন তিনি এইরূপ বিভিন্ন ভাষার বিজ্ঞান ও তত্ত্ব অনুসন্ধান করে এবং এরই ফলে তিনি পরবর্তীকালে প্রকৃতই ভাষাচার্য-রূপে প্রখ্যাত হয়ে ওঠেন এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত হন।

১৯২২ সালে তিনি দেশে ফিরে আসেন। ফিরে আসার আগে তিনি ইংলণ্ড ফ্রান্স ইটালী গ্রীস ও জার্মানির বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেন।

ভ্রমণ অধ্যয়ন ও গবেষণা— এই ত্রিধারায় স্নান করে যেন দেশে ফিরে এলেন একজন পরম পুণ্যবান ব্যক্তিরূপে। তাঁর চিত্ত ঐশ্বর্যে কেবল পূর্ণ নয়, বিভিন্ন জ্ঞানব্রতীর সংস্পর্শে এসে তাঁর চিত্ত পূত হয়ে উঠেছে।

দেশে ফিরে আসার আগেই সার্‌ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তাঁকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের 'খয়রা' অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে তিনি অধ্যাপক তারাপুরওয়ালার কাছে আবেস্তা অধ্যয়ন করেন।

এর কয়েক বছর পরে সুনীতিকুমারের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, দুই ভলিউমে ১৩০০ পাতার বৃহৎ গ্রন্থ—'দি অরিজিন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অব দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ'। বিভিন্ন ভাষা ও ভাষা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অধ্যয়ন করার পর তাঁর মন যখন উন্নত বলিষ্ঠ ও ঐশ্বর্যময় হয়েছে তখন তিনি তাঁর মাতৃভাষা বাংলার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে লিখলেন এই গ্রন্থ। ইংরেজিতে

একটা কথা আছে— পরের দেশ না চিনলে নিজের দেশকে ভালো করে জানা যায় না; এও যেন ঠিক তাই। বিভিন্ন দেশের ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করে তিনি নিজের মাতৃভাষা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করেন এবং তার পরই রচনা করেন এই বিরাট গ্রন্থ।

এই বই প্রকাশের সঙ্গেসঙ্গে সুনীতিকুমারের নাম ও প্রতিষ্ঠা স্বদেশে বিদেশে সর্বত্র সম্মানের সঙ্গে স্থাপিত হয়।

এর পর সুনীতিকুমারের আরো কয়েকটি বই বের হয় লণ্ডন থেকে, বই দুটি হচ্ছে— বেঙ্গলি সেল্‌ফ-টট্‌, এ বেঙ্গলি ফোনেটিক রীডার, ইণ্ডো-আরিয়ান অ্যাণ্ড হিন্দী কিরাত-জন-কৃতি, আসাম অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়া, ইত্যাদি। এসব বই ইংরিজিতে লেখা।

১৯২৭ সাল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মালয় সুমাত্রা জাভা বলি ও শ্যাম দেশ পরিভ্রমণে বার হন। সুনীতিকুমার হলেন তাঁর অন্যতম সঙ্গী। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনমাস কাল তিনি দ্বীপময় ভারতের এইসব দ্বীপাবলীর দেশে ঘুরে বেড়ালেন। এই সময়ে তিনি এইসব জায়গায় রবীন্দ্রনাথের আদর্শ এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। রবীন্দ্রনাথের বাণীই ভারতের মর্মবাণী, সুনীতিকুমার তাঁর বক্তৃতায় ভারতের মর্মবাণীই প্রচার করেন বলা চলে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জাভাযাত্রীর পত্রে বলেছেন "সুনীতির নীরন্ধ্র চিঠি-গুলি তোমরা যথাস্থানে পড়তে পাবে", সুনীতিকুমার কাউকে নিরাশ করেন নি, তিনি এই ভ্রমণবৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন তাঁর বৃহৎ গ্রন্থে— দ্বীপময় ভারতে। গ্রন্থাকারে বেরোবার আগে লেখাগুলি ধারাবাহিকভাবে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে জাভা-বলি ইত্যাদির বর্ণনা আছে; নেই শ্যামদেশ সম্বন্ধে। সুনীতিকুমারের তা স্মরণ আছে, তাই তিনি 'রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্যামদেশে' শীর্ষক কাহিনী রচনা আরম্ভ করেছেন, এই রচনার দুই কিস্তি 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয়েছে। জাভা-বলি ইত্যাদি ভ্রমণকালে তিনি প্রাক্‌-আর্য যুগে ভারতীয় সভ্যতার পটভূমিকা সম্বন্ধে ব্যাটেভিয়ায় এক বক্তৃতা দেন, সেটি বাটাভিয়ার বিখ্যাত প্রাচীন বিদ্যাবিষয়ক সভা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

১৯২২ সালে তিনি ইউরোপ-সফর শেষ করে দেশে ফিরে আসেন। তেরো বছর বাদে ১৯৩৫ সালে পুনরায় যান ইউরোপে। এবার তিনি লণ্ডনের ইণ্টার-ন্যাশনাল কনফারেন্স অব ফোনোটিক সায়েন্সের দ্বিতীয় অধিবেশনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি-রূপে তথায় যান। তিনি সেখানে এই কনফারেন্সের ভারতীয় শাখার সভাপতিত্ব করেন। এবারও তিনি ইউরোপের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে আসেন। অস্ট্রিয়া হাঙ্গারি চেকোশ্লোভাকিয়া জার্মানি ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে তিনি পরিভ্রমণ করেন এবং বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরিয়েণ্টাল ইনসটিটিউটে বক্তৃতা দেন। অল্পদিন পরেই তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৬ সালে সুনীতিকুমার কলকাতার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। তার পর রেঙ্গুনের অল-বর্মা বেঙ্গলি লিটারারি কনফারেন্সের সভাপতিপদে বৃত হয়ে রেঙ্গুন যান। সে সময়ে তিনি পেগু টাউংগু পেগান মান্দালয় ইত্যাদি বর্মার বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন।

সুনীতিকুমারের জীবন-অন্বেষণ করে এইটেই লক্ষ্য করা যায় যে, তিনি যখনি বাইরে কোথাও গিয়েছেন, তখনি তিনি সেই সূত্রে তার আশেপাশের দেশ না দেখে ফেরেন নি। এর ফলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসে তিনি জীবনের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে পরিচিত হবার এইটেই হচ্ছে সবচেয়ে প্রশস্ত পথ। তাই সম্ভবত তিনি এই পথই বেছে নিয়েছিলেন। কেবল রুদ্ধদ্বার গ্রন্থাগারে বসে গ্রন্থকীটের ন্যায় জীবনযাপনের প্রণালী তাঁর পছন্দ নয়, তিনি সরাসরি মানুষের সংস্পর্শে এসেই মানুষের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করার অভিলাষী। তাই বিভিন্ন দেশের প্রতি তাঁর এই আকর্ষণ।

১৯৩৮ সালে সুনীতিকুমার পুনরায় যান ইউরোপে। ঘেণ্টে অনুষ্ঠিত ইণ্টার-ন্যাশনাল কংগ্রেস অব ফোনেটিক সায়েন্সের তৃতীয় অধিবেশনে, কোপেনহেগেনে ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব অ্যানথ্রপলজিস্টস এবং ব্রুসেলস্‌এ ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েণ্টালিস্টস—এই তিনটি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্যে এবারও তিনি যান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে। ফেরার পথে তিনি নরওয়ে সুইডেন ফিনল্যাণ্ড পোল্যাণ্ড

জার্মানি বেলজিয়ম ও ইটালী ঘুরে আসেন। ১৯৩৯ সালে তিনি ওয়ারস-র ওরিয়েণ্টাল ইন্‌সটিটিউট অব পোল্যাণ্ডের অনারারি মেম্বার নির্বাচিত হন।

বিদেশে তিনি এইভাবে সম্মানিত হচ্ছেন, ঠিক একই সময়ে তাঁর স্বদেশও তাঁকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য উদ্যোগী হয়। ১৯৩৯ সালে সুনীতিকুমার নিখিল-বঙ্গ বঙ্গসহিত্য-সম্মেলনের কুমিল্লা-অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন।

বিদেশভ্রমণ কিছুদিনের জন্যে যেন স্থগিত থাকে। এবার তিনি ভারতবর্ষের নানা জায়গায় আহূত হয়ে যেতে আরম্ভ করেন। গুজরাট করাচী আসাম ইত্যাদি স্থানে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে গমন করেন। গুজরাটের ভারনাকুলার সোসাইটির পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ও গবেষণা বিভাগে বক্তৃতাদানের জন্যে তিনি ১৯৪০ সালে সেখানে গমন করেন। তাঁর এই বক্তৃতামালা ইণ্ডো-এরিয়ান অ্যাণ্ড হিন্দী নামে পুস্তিকা আকারে ১৯৪২ সালে আমেদাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সালে নিখিলভারত হিন্দিসাহিত্য-সম্মেলনে জাতীয়-ভাষা শাখার সভাপতিত্ব করেন, এবং কয়েক বৎসর পরে আসাম গবর্নমেণ্টের আমন্ত্রণে প্রতিভাদেবী লেকচারার হিসাবে সেখানে যান এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তনে মোঙ্গলয়েড জাতির দান সম্পর্কে বক্তৃতা দেন।

ইতিমধ্যে ১৯৪৩ সালে তিনি ল্যাঙ্গোয়েজেস অ্যাণ্ড দি লিঙ্গুয়িস্টিক প্রব্লেম নাম দিয়ে একটি প্যাম্‌ফ্‌লেট প্রকাশ করেন— এটি হচ্ছে অকস্‌ফোর্ড প্যাম্‌ফ্‌-লেটস অন ইণ্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স সিরিজের একাদশ সংখ্যক প্যাম্‌ফ্‌লেট। ১৯৪৬ আর ১৯৪৭ সালে যথাক্রমে তিনি প্যারিসের সোসিয়েতে আসিয়াতিকের এবং অ্যামেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির অনারারি মেম্বর নির্বাচিত হন।

১৯৪৮ সালে সুনীতিকুমার পুনরায় ইউরোপে যান প্যারিসে ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব লিঙ্গুইস্টস ও ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরেয়িণ্টালিস্টস এবং ব্রাসেলস্‌এ ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব অ্যানথ্‌পলজিস্টস্‌এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতসরকারের প্রতিনিধিরূপে যোগদানের জন্য। ফেরার পথে মিশরের কায়রোয় তিনি এক সপ্তাহ অতিবাহিত করেন।

দেশে ফিরে এসে তিনি নূতন এক উপাধিতে ভূষিত হন— সাহিত্য-বাচস্পতি। এলাহাবাদের হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন তাঁকে এই উপাধি দিয়ে

সম্মান প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া ভাষাচার্য এবং এই সাহিত্য-বাচস্পতি— এই দুইটি উপাধি তিনি তাঁর নামের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকেন।

১৯৪৭ সালে সুনীতিকুমার Ecole Francaise de l' Extreme-Orient, Hanoi, Viet-nam-এর অনারারি মেম্বর নির্বাচিত হন।

এই বছরই তিনি প্যারিসে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক Braille ব্রেইল বা অন্ধদের লিপি কমিটিতে অংশ গ্রহণ করেন, ঐ বছরও তিনি উক্ত কমিটির আর-একটি অধিবেশনে যোগ দেন। এর পরেও আরো দু বার যোগ দিয়েছেন। এবারও তিনি কয়েকটি দেশ ঘুরে আসেন, ইটালী ইংলণ্ড হল্যাণ্ড তুরস্ক। তাঁর এই ভ্রমণের সঙ্গে আর-একটি কাজও যুক্ত ছিল, সেটি হচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেশের শিক্ষাদান-পদ্ধতি সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ।

বললেন, "এইভাবে দেশ দেখেছি, মানুষ দেখেছি। এইটেই জীবনের মস্ত লাভ। তা ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থাকায় কিছু অভিজ্ঞতাও অর্জন করা গেছে।"

১৯৫০ সালে সুনীতিকুমার হল্যাণ্ডের সোসাইটি অব আর্টস্ অ্যাণ্ড সায়েন্সের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর রাজস্থানী ভাষা সম্বন্ধে পুস্তকের জন্য কাশীর নাগরি-প্রচারিণী-সভা তাঁকে রত্নাকর পুরস্কার ও পদক দেন। আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দানের জন্য ভিজিটিং প্রফেসর-রূপে আমন্ত্রণ জানান।

বললেন, "বিদেশে অনেক জায়গায় ঘুরেছি বটে, কিন্তু তবু মনে হয় কিছুই দেখা হল না। আর ঘুরেছি ভারতবর্ষে।"

ঢাকা পাটনা কটক কাশী এলাহাবাদ আগ্রা দিল্লী লাহোর বোম্বাই পুনা নাগপুর ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ; এইসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট ও অন্যান্য পরীক্ষার তিনি পরীক্ষক এবং সিলেকশন কমিটির মেম্বরও। এইসব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তিনি বক্তৃতাদিও দিয়েছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও বিশ্বভারতীর গবর্নিং বডির সদস্যরূপে এই দুই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সুনীতিকুমার যুক্ত ছিলেন। এশিয়াটিক সোসাইটি, নাগরি-প্রচারিণী সভা, পুনার ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট,

বীকানেরের সাদূল রাজস্থানী রিসার্চ ইন্‌সটিটিউট ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘনিষ্ঠ।

১৯৫২ সালে এক মাসের জন্ম সুনীতিকুমার মেক্সিকো যান রকফেলার ফাউণ্ডেশনের বৃত্তিতে। দেশে ফিরে এসে তিনি পশ্চিমবাংলার আইন-সভার নির্বাচনে স্বতন্ত্র সদস্যরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন— তিনি যে বাংলার অধিবাসীদের একজন প্রিয়পাত্র, এই নির্বাচনে তা প্রমাণিত হয়। তার পর তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইনসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন; ১৯৫৬ সালে এই পদে বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন।

১৯৫৫ সালে অস্‌লোর নরওয়েজিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস এঁকে অনারারি মেম্বার নির্বাচিত করেন।

১৯৫৪ সালে তিনি পশ্চিম-আফ্রিকা-পরিভ্রমণে বহির্গত হন— ঘানা নাইজেরিয়া ও লাইবেরিয়া পরিদর্শন করে দেশে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বে তিনি কেমব্রিজে ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ওরিয়েণ্টালিস্টএর ত্রয়োবিংশ অধিবেশনে যোগদান করেন। এই বছরে তিনি পুনার ডেকান কলেজের অনুষ্ঠিত ভাষাতত্ত্ব বিদ্যালয়ে অনারারি প্রফেসার নিযুক্ত হন, এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে উইলসন ফিলসফিকাল বক্তৃতা দান করেন।

১৯৫৫ সালে ভারত-সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

চীন-সরকারের আমন্ত্রণে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের যে প্রতিনিধি-দল ১৯৫৫ সালে চীন-সফরে যান, সুনীতিকুমার সেই দলের সদস্যরূপে চীনে যান।

১৯৫৫-৫৬ সালে তিনি ভারত-সরকারের সরকারি ভাষা-কমিশনের সদস্য এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারত সরকারের সংস্কৃত-কমিশনের চেয়ারম্যান হন।

একটানা আটত্রিশ বৎসর অধ্যাপনার পর ১৯৫২ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খয়রা অধ্যাপক পদ ত্যাগ করেন, এর পর তিনি এমারিটাস অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৫৩ সালে তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন এবং অল ইণ্ডিয়া ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্সের আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত সপ্তদশ অধিবেশনে প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন।

বহুদিন থেকে তিনি নানা বিষয়ে ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় রচনা

দিয়েছেন— তার সংখ্যা অনুমানিক দুই শত। এইসব রচনার বিষয় বিচিত্র— ভাষাতত্ত্ব সাহিত্য ইতিহাস শিল্পকলা ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ক।

তাঁর মাতৃভাষা বাংলা ছাড়াও সুনীতিকুমার ইংরেজি ও হিন্দিতে স্বচ্ছন্দ বক্তৃতা দিতে পারেন। এ ছাড়া ফরাসী ভাষায় তাঁর দখল আছে। জার্মান ও ফার্সি ভাষাও তিনি জানেন।

বললেন, "সংক্ষেপে এই আমার জীবন। কিন্তু জীবন হয়তো এখনো কিছুটা বাকি আছে। আমাদের বংশের সকলের আয়ু আবার একটু বেশি। আমার এক পিসিমা বিরানব্বই বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন। আমার বাবা মারা যান তিরাশি বছর বয়সে, ঠাকুরদা দেহরক্ষা করেন উননব্বই বছর বয়সে, ঠাকুরমা বিরানব্বইয়ে।"

তাঁর বলিষ্ঠ ও কর্মিষ্ঠ চেহারা দেখে তাঁরও দীর্ঘায়ু সম্বন্ধে আশা করা যায়। এবং তাঁর স্বদেশবাসী সকলেই নিশ্চয়ই কামনা করে—তিনি শতায়ু হোন এবং আরো সহস্র দানে সমৃদ্ধ করুন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য।

রচিত গ্রন্থাবলী

ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা

দ্বীপময় ভারত

Origin and Development of the Bengali Language—2 Vols.

Bengali Self-Taught

A Bengali Phonetic Reader

Languages and the Linguistic Problem

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

শীতের নিস্তব্ধ সকাল। এলাহাবাদের রাস্তা দিয়ে চলেছি বাইকাবাগের দিকে। উত্তরভারতের শীতের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। আজ নতুন করে তার সঙ্গে পরিচয় হল। এই অচেনা শীত সম্বন্ধে মনে মনে আতঙ্ক একটা ছিল। কিন্তু সে-শীত গায়ে মেখে দেখা গেল, এতে কষ্ট তো নেইই, বরঞ্চ আরাম আছে। সেই আরাম ভোগ করতে করতে চলেছি বাইকাবাগের দিকে। কয়েক বছর হল চিত্রশিল্পী শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার এখানে আছেন। তাঁকে চাক্ষুষ দেখি নি, অনেক দিন আগের ছবি মাত্র দেখা আছে তাঁর। তিনি দেখতে কেমন, মানুষটা ঠিক কেমন— এইসব ভাবতে ভাবতে চলেছি।

বাইকাবাগের চওড়া রাস্তায় সকালবেলার রোদ এসে পড়েছে। মনে হচ্ছে, দু পাশের গেটওলা বড় বড় বাড়িগুলো যেন আরামে রোদ পোয়াচ্ছে।

বাড়িটা পেলাম। ফটক দিয়ে ঢুকে গেলাম ভিতরে। পিছনের দিকে খাড়া সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সোজা উঠে গিয়েই মুখোমুখি দাঁড়ালাম শিল্পী ক্ষিতীন্দ্র-নাথের। কা'র কাছে যেন শুনেছিলাম, প্রবাসী বাঙালিদের চটক বেশি। কিন্তু সে ধারণা যে ভুল, তার প্রমাণরূপেই যেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়ালেন সম্মুখে।

অতি নিরীহ নম্র বিনয়ী, অতি সহজ আর অতি সরল।—আচারে আর আচরণে, বেশে ও ভূষায়।

ভিতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। সেখানে বসে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আরম্ভ করলাম।

বাল্যকালে ছবি-আঁকা আরম্ভ করেছেন, এখনো তুলি চলেছে সমানে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্ট গ্যালারির জন্যে তাঁরা এসে প্রায়ই ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে যান।

বললাম, "আপনার এখানে আসার পথে কাশীতে নেমেছিলাম। সেখানে ইউনিভার্সিটি-গ্যালারিতে আপনার অনেকগুলি ছবি দেখে এলাম। নতুন কিছু আঁকেন নি এর মধ্যে ?"

নতুন ছবি এঁকেছেন। দুটি ছবি মেলে ধরলেন মেঝের উপর। বাংলার মাটি ছেড়ে অনেকদূরে চলে এসেও ক্ষিতীন্দ্রনাথক দেখে যেন মনে হল বাংলার মাটির প্রলেপ দিয়ে তিনি নিজেকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছেন, তাঁর ছবি দেখেও যেন সেই বাংলার মাটিরই স্বাদ পেলাম। শ্রীচৈতন্যের অন্তর্ধানের দৃশ্যটি তিনি রঙে-রেখায় ধ'রে এনেছেন—পরিত্যক্ত নূপুর ও উত্তরীয়ের দিকে সাশ্রু চোখে চেয়ে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া ; এটা বিচ্ছেদের ও বেদনার একটা সজল আলেখ্য। তার পাশেই তিনি মেলে ধরলেন দ্বিতীয় ছবিটা, সুভদ্রা ও অর্জুনের প্রথম মিলন। বর্ষার সজলকালো মেঘের কিনার দিয়ে যেমন রুপালি আলোর বিভা দেখা যায়— এও যেন অনেকটা তেমনি। বিষণ্ণ বিষ্ণুপ্রিয়ার করুণ আলেখ্যের পাশে সুভদ্রার সুশুভ্র মিলনানন্দের দৃশ্য। মনোযোগ দিয়ে ছবি দুটো দেখছিলাম, আর মনে হচ্ছিল, যিনি এই ছবি এঁকেছেন, তাঁর মনের মধ্যে এ দুটো আঁকা হয়ে আছে কী ভাবে। অনেকক্ষণ ছবি দুটো দেখে তাঁর সঙ্গে কথা বলা আরম্ভ করলাম।

বললেন, "আমার বাল্যজীবন ধর্মকথা কীর্তনগান ও কালোয়াতি গানের ভিতর দিয়েই অতিবাহিত হয়। কিন্তু কীর্তনগানের সুললিত ভাষা এবং তার সুর-মাধুর্যে কীর্তনই আমাকে মুগ্ধ করে বেশি। কীর্তনের উপর আমার আসক্তি জন্মে এবং সেই আসক্তি আমাকে ছবি-আঁকার পথে নিয়ে যায়। পদাবলীর ভাষা ও সুর শুনে কেবলই মনে হত, আহা, এই বিষয় যদি ছবি আঁকতে পারতাম, তবে বোধ হয় আমার জীবনে একটা কাজ হত।"

৯ই পৌষ ১৩৫৯, ২৪এ ডিসেম্বর ১৯৫২। শিল্পী ক্ষিতীন্দ্রনাথের জীবনের কাহিনী শুনছি।

মুর্শিদাবাদ জেলার নিমতিতায় ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৫ই শ্রাবণ, ১৮৯১ সালের ৩০এ জুলাই তাঁর জন্ম। পিতা কেদারনাথ সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। ক্ষিতীন্দ্র-নাথের বয়স যখন মাত্র এক বৎসর তখন তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। "আমার পিতা একাধারে পিতা ও মাতা এই দুইটি স্নেহ দিয়ে আমাকে লালন-পালন করেন।"

তাঁর পিতা অতিশয় ধর্মভাবাপন্ন ও সংগীতপ্রিয় ছিলেন। তিনি অতিথি-সেবায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কোনোদিন হয়তো অনেক রাত্রেই তাঁদের

৩০৫

গৃহে অতিথি-সৎকারের জন্যে সংসারের সকলকে ব্যস্ত ক'রে তুলতেন। এই অতিথির মধ্যে বেশির ভাগই আসতেন সাধু-সন্ত। তাঁরা তাঁদের বাড়িতে কীর্তন-গান গাইতেন। এই পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাল্যকাল থেকেই কীর্তনের প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠেন। সেই আসক্তি তাঁকে চিত্রাঙ্কনের দিকে চালিত ক'রে আজ এত দূরে এনে পৌঁছে দিয়েছে।

বললেন, "আমার বয়স যখন ষোল, তখন সাঁওতালপরগনার পাকুড় উচ্চইংরেজি বিদ্যালয় থেকে কলকাতার গবর্নমেণ্ট আর্টস্কুলে গিয়ে ভর্তি হই।"

নিমতিতায় উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় তখন ছিল না; সেইজন্যে নিমতিতা থেকে মাইনর পাস করে তিনি আসেন পাকুড়ে। পাকুড়ে দু-বছর পড়েন। "থার্ড ক্লাস থেকে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেই চিত্রাঙ্কন-শেখার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠল। উপায় কী? কী করে আর্টস্কুলে যাওয়া যায়? এ সময়ে লেখা-পড়া ছেড়ে দিলে পিতা রাগ করবেন, কিন্তু পড়াও আর ভালো লাগে না।"

তিনি তাঁর পিতাকে নিজের মনোভাব জানিয়ে চিঠি লিখলেন। সেই পত্রের উত্তরে তাঁর পিতা তাঁকে চিঠি লিখলেন বাড়ি আসার জন্যে। পিতার মনোভাবও ক্ষিতীন্দ্রনাথের অজানা ছিল না। কোনোরকমে ম্যাট্রিক পাস করতে পারলেই তাঁর পিতা তাঁকে সাব-রেজিস্ট্রার ক'রে দিতে পারবেন। কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার সে স্বপ্ন চূর্ণ করে দিয়ে এক অসম্ভব প্রস্তাব করে পঠিয়েছেন যে, তিনি চিত্রাঙ্কন শিখবেন।

জীবনে সংকল্পের পথে বাধাও যেমন আসে, সেই সংকল্পের সহায়ও আসে তেমনি— কালো মেঘের কিনারে রুপালি রেখার মত। ক্ষিতীন্দ্রনাথের সহায় হয়ে দেখা দিলেন নিমতিতার জমিদার মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। থিয়েটরের উপর এর খুব ঝোঁক ছিল, তাই ইনি ভাবলেন যে, তাঁর গ্রামের এই ছেলেটি যদি আর্টস্কুলে গিয়ে ছবি আঁকা শিখে আসে তা হলে তাঁর থিয়েটরের সিন্ আঁকার জন্যে বাইরে থেকে আর লোক ভাড়া ক'রে আনার ঝামেলা পোয়াতে হবে না।

বললেন, "একে তিনি আমাদের আত্মীয়, তার উপর গ্রামের জমিদার, তাই বাবা আর আপত্তি করতে পারলেন না। বাবা ছিলেন আবার অদৃষ্টবাদী। আমার জন্মপত্রিকায় নাকি লেখা ছিল যে, আমার লেখা-পড়া বিশেষ হবে না।

তবে, এমন-একটা দিকে যাব যে, যার দরুন দেশ-বিদেশে নাম ছড়িয়ে পড়বে। যাই হোক, মহেন্দ্রনারায়ণ যে উদ্দেশ্যেই আমার সহায় হোন, এতে আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে আমি আর্টস্কুলে ভর্তি হলাম। তখন আমার বয়স ষোল বৎসর।"

সে সময়ে পার্সি ব্রাউন ছিলেন গবর্নমেণ্ট আর্টস্কুলের প্রিন্সিপাল। এখানে এক বছর পর পরীক্ষা দিতে হল, পরীক্ষা দিয়ে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ। পরীক্ষার ভয়ে পাকুড় ছেড়ে এখানে এলেন, কিন্তু দেখলেন এখানেও পরীক্ষার দায় আছে। কিভাবে পরীক্ষার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, এই হল তাঁর চিন্তা। তিনি শুনেছিলেন যে ইণ্ডিয়ান পেন্টিং ক্লাসে পরীক্ষার কোনো ঝামেলা নেই। সেখানে ভালো ক'রে শিখতে তিন-চার বছর সময় লাগে। মনে মনে ঠিক করলেন, ঐ ক্লাসেই তাঁকে যেতে হবে। কিন্তু উপায় কী? কিভাবে সেখানে যাওয়া যায়? কিভাবে দু-এক মাসের মধ্যে যাওয়া যায় অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্লাসে?

বললেন, "মনে মনে স্থির করলাম শ্রীযুক্ত ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত একখানা ছবি কপি ক'রে তাঁকে দেখাব। যদি তিনি আমার কাজ দেখে খুশি হন, তা হলেই সহজে আমার মনের ইচ্ছা পূরণ হবে। অর্থাৎ নিদারুণ ভীতিপ্রদ এগজামিনের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।"

দশ-বারো দিন খেটে তিনি অবনীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত শ্রীরামচন্দ্রের মায়ামৃগবধ ছবিখানা কপি করলেন। কিন্তু এর পর এল অন্য ভয়। তিনি পল্লীগ্রামের ছেলে, সর্বদাই ভয়ে আর শঙ্কায় থাকেন। এই ছবি নিয়ে কিভাবে অবনীন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত হবেন, এইটেই হল নতুন সংকট। কিন্তু যেমন করেই হোক, তাঁকে এ-কাজ করতেই হবে। অবনীন্দ্রনাথ যে ঘরে বসতেন, একদিন টিফিনের ছুটির সময় তিনি সেই ঘরে দরজার কাছে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। দরজার কাছে একজন যে দাঁড়িয়ে আছে তা জানাবার জন্যে বালক ক্ষিতীন্দ্রনাথ জুতোর শব্দ করতে লাগলেন।

এই শব্দে আকৃষ্ট হলেন অবনীন্দ্রনাথ এবং ঘরে প্রবেশাধিকার পেলেন ক্ষিতীন্দ্র।

কেবল শব্দে নয়, ক্ষিতীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র দেখেও আকৃষ্ট হলেন অবনীন্দ্র : এবং ক্ষিতীন্দ্রনাথ প্রবেশাধিকার পেলেন ইণ্ডিয়ান আর্ট ক্লাসে।

কিন্তু সব কাজেই বাধা আছে। জীবনে সহজ-সিদ্ধি জিনিসটা সুখের হতে পারে কিন্তু তার স্থায়িত্ব নেই। তার মূল্য তাই বেশি না। ক্ষিতীন্দ্রনাথ বাধা পেতে পেতে এগিয়ে চললেন।

অবনীন্দ্রনাথ ক্ষিতীন্দ্রকে নিজের ক্লাসে ভর্তি করে নিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন, কিন্তু বাধা হয়ে এল স্কুলের নিয়মতন্ত্র। আর্টস্কুলের নিয়ম তখন ছিল যে, সেকেণ্ড ইয়ার থেকে পাস না ক'রে কেউ অন্য বিভাগে যেতে পারবে না। অবনীন্দ্রনাথের অনুরোধে হেডমাস্টার হরিনারায়ণ বসু মহাশয় কিছু করতে না পারায় অগত্যা অবনীন্দ্রনাথ সরাসরি প্রিন্সিপাল পার্সি ব্রাউনকে এ বিষয়ে বললেন। এতে কাজ হল। অন্য বিভাগে যাবার অনুমতি পেলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ।

বললেন, "অনুমতি পেলাম। আমার মন যে দিকে পড়ে আছে, বাল্যের কীর্তন-গান আমার কানের মধ্যে যে আগ্রহ সঞ্চার করেছে, সেই পথে এবার পা বাড়িয়েছি। হেডমাস্টার হরিনারায়ণবাবু বললেন, বাপু, ও ক্লাসে গিয়ে কি হবে? তোমার ইহকাল-পরকাল দুইই যাবে। কারণ, ওখানে কিছু শেখানো হয় না। ওদের অঙ্কন-পদ্ধতি কেমন, জান? একটা কুকুর এঁকে তাঁর নীচে লিখতে হয়—ঘোড়া। কারণ ওদের ছবি দেখে কুকুর কি ঘোড়া বুঝবার উপায় নেই। আর কি জান, ও-আর্ট শিখলে ভাত মিলবে না।"

সব শুনেও বালক ক্ষিতীন্দ্রনাথ অটল। তিনি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। "যাই হোক। আমি তো গিয়ে অবনীন্দ্রনাথের ক্লাসে হাজির হলাম, এবং খুব আনন্দের সঙ্গে তাঁর উপদেশমত কাজ করতে আরম্ভ করলাম।"

বছর দুই-তিন কেটে গেছে। অবনীন্দ্র-শিষ্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কন করে চলেছেন। ইতিমধ্যে অনেকগুলি ছবি এঁকেছেন তিনি। কিন্তু সর্বসমক্ষে সে ছবি হাজির করা হয় নি।

বললেন, "সালটা বোধ হয় ১৯১১, অর্থাৎ যে বৎসর ইংলণ্ডের সম্রাট

পঞ্চম জর্জ ভারতে এসেছিলেন, সেই বছর আমি আমার অঙ্কিত ছবি ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের এগজিবিশনে দিলাম।"

যেদিন প্রদর্শনী খুলবে তার আগের দিন অবনীন্দ্রনাথ তাঁকে বললেন, বিকেলের দিকে গিয়ে তাঁরা দেখে আসবেন কি-ভাবে প্রদর্শনী সাজানো হল। তাঁরা গেলেন। গিয়ে তাঁরা ঘুরে ঘুরে প্রদর্শনী দেখলেন। "আমার সাতখানা ছবি যে জায়গায় ছিল শ্রীযুত অবনীন্দ্রনাথ সেখানে এসে বললেন, এ জায়গাটা একটু অন্ধকার, আমি বলি আমার ছবিগুলি যেখানে আছে সেখানে তোমারগুলি দাও, আর তোমার ছবির জায়গায় আমারগুলি।"

গুরুর মহত্ত্বে মোহিত হলেন শিষ্য, কিন্তু গুরুর কথা অনুযায়ী কাজ করতে স্বীকৃত হলেন না। যেখানে ছিল তাঁর ছবি, সে-ছবি সেখানেই রইল।

তখন লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতের বড়লাট। তিনি এগজিবিশনের উদ্বোধন করলেন। "আমার ভাগ্যবশত লেডি হার্ডিঞ্জ আমার আঁকা একখানা ছবি কিনলেন; ছবিটি পর্বতকন্যা পার্বতী। ছবিখানি কিনে তিনি একবার আর্টিস্টকে দেখতে চাইলেন।''

লেডি হার্ডিঞ্জের এই কথা শুনে অবনীন্দ্রনাথ বললেন যে, আর্টিস্ট অত্যন্ত ছেলেমানুষ, সে শিয়ালদা স্টেশনের কাছে হ্যারিসন রোডের একটি হোটেলে থাকে, তাকে এখন এখানে নিয়ে আসার অসুবিধে আছে।

কিন্তু ইংরেজ রমণী ছাড়বার পাত্রী নন। তিনি তাঁর গাড়ি পাঠিয়ে আনবার ব্যবস্থা করতে বলে দিলেন। সুতরাং এগজিবিশনের একজন কর্মীকে পথ-প্রদর্শকরূপে নিয়ে গাড়ি রওনা হল।

হ্যারিসন রোডের হোটেলের সামনে হঠাৎ এসে দাঁড়াল লাটের গাড়ি। তরুণ বয়সের গ্রাম্যবালক ক্ষিতীন্দ্রনাথ হঠাৎ এই গাড়ির আবির্ভাবে চমকিত হলেন; পুলকিত হবার অবকাশ সম্ভবত পেলেন না।

বললেন, "আমি পার্ক স্ট্রীটের এগজিবিশনে এসে হাজির হলাম। লেডি হার্ডিঞ্জ আমার মাথায় হাত দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন। পরদিন সকালের কাগজে দেখি আমার নামে বড় বড় হরফে খুব সুখ্যাতি বেরিয়েছে। আর যায় কোথায়, বাকি ছয়খানা ছবি সেইদিনই বিক্রী হয়ে গেল।''

পর বৎসরের এগজিবিশনে লেডি হার্ডিঞ্জ আবার আসেন। ক্ষিতীন্দ্রনাথের আঁকা শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা ছবিখানা ক্রয় করে নিয়ে যান। এর পর তাঁর তিন-চারখানা ছবি কেনেন লর্ড কারমাইকেল। লর্ড রোনাল্ডজে পাঁচ বছর বাংলার লাট ছিলেন। এই পাঁচ বছরে তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথের কুড়ি-বাইশ খানা ছবি কিনে নিয়ে গেছেন। বললেন, "লর্ড রোনাল্ডজে শ্রীচৈতন্য ও রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক ছবি খুব পছন্দ করতেন। আমিও এই রকমের ছবি আঁকতাম বেশি। তাই তিনি আমারই ছবি নিয়েছেন অনেকগুলি। তিনি আমাকে বৈষ্ণব আর্টিস্ট ব'লে ডাকতেন ও খুব স্নেহ করতেন। এর পর ইতালীর মুসোলিনীর কন্যা এগজিবিশনে এসে আমার চারখানা ছবি কিনে নিয়ে যান। আমার আরও অনেক ছবি বিদেশে চলে গেছে, তার সংখ্যা কত সে হিসেব ঠিক জানা নেই।"

তিনি যখন আর্টস্কুলের ছাত্র তখন বিলাতের রয়াল আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ রদেনস্টাইন কলকতায় এসেছিলেন। তিনি ইণ্ডিয়ান পেন্টিং ক্লাসে এসে অবনীন্দ্রনাথকে বলেন যে, তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথের পাঁচ-ছয় খানা স্কেচ করতে চান, এজন্যে বালকটিকে রোজ দু-ঘণ্টা করে সিটিং দিতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ তাতে রাজি হন এবং বলেন যে, শুধু ক্ষিতীন্দ্রনাথ কেন, অন্য কোনো বালকের স্কেচ যদি তিনি নিতে চান তাতেও অসুবিধে হবে না। রদেনস্টাইন তার উত্তরে বলেন যে, অন্য কোনো বালকের স্কেচ নেবার তাঁর ইচ্ছে নেই ; তিনি ক্ষিতীন্দ্রনাথেরই নিতে চান, কেননা এই চেহারার মধ্যে খাঁটি ইণ্ডিয়ান ভাব বর্তমান আছে।

বললেন, "তিনি পাঁচ-ছয় দিনে আমার পাঁচ-ছয় খানা স্কেচ এঁকে নেন ; এবং আমার কাজ দেখে খুশি হয়ে আমার শ্রীরাধার অভিসার ছবিখানা কিনে নিয়ে যান।"

আর্টস্কুলের ছাত্রজীবন শেষ হল। ১১।১ নম্বর হ্যারিসন রোডের ভিক্টোরিয়া হোটেলে তাঁর দিন কেটে যাচ্ছে। এই হোটেলে তিনি সুদীর্ঘ ছাব্বিশটি বছর অতিবাহিত করেছেন। এই হোটেলের মালিক কুঞ্জবিহারী দত্ত তাঁকে খুব স্নেহ করতেন। এই কারণে হোটেলটির প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল খুব বেশি। এখানে ব'সে তিনি অনেক ছবি এঁকেছেন।

১৯১৮ কিংবা ১৯১৯ সালে লর্ড রোনাল্ডজে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টকে সমবায় ম্যানশনে ভালো ফ্ল্যাটে নিয়ে এসে সেখানে স্কুল খোলেন। শ্রীনন্দলাল বসু ও শৈলেন্দ্রনাথ দে প্রথম এখানে শিক্ষক হন। অল্প কিছুদিন পরেই নন্দবাবু চলে যান। ক্ষিতীন্দ্রনাথকে সেই কাজে নিযুক্ত করেন অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ। বললেন, "এখানে আঠারো-উনিশ বছর প্রধানশিক্ষক-রূপে কাজ করি। বোধ হয় ১৯৩৯-৪০ সাল পর্যন্ত। নানা প্রকার আনন্দ ও জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে সুখে-দুঃখেই দিন কেটেছে।"

এখানে থাকাকালে অবনীন্দ্রনাথের সহৃদয়তায় অনেক ছবি তিনি এঁকেছেন ও নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে কীর্তন-গান শেখার সুবিধে পেয়েছেন। বললেন, "অবনীন্দ্রনাথ আমাকে সর্বদাই বলতেন, ছেলেদের দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত অঙ্কন শেখানোর জন্যেই যে তোমাকে এখানে বেতন দেওয়া হয়, তা মনে কোরো না; আমরা তোমার উন্নতি দেখতে চাই। তাঁর নির্দেশমত আমি রোজ সাড়ে তিনটার সময় সোসাইটি থেকে ছুটি পেতাম কীর্তন-গান শেখার জন্যে। তিনি আমার এই অনুরাগের বিষয় জানতেন এবং মধ্যে মধ্যে আমার পদাবলী গান শুনতেন।"

সোসাইটিতে যখন তিনি কার্যরত তখন জাপানের চিত্র-সমালোচক ওকাকুরা এসেছিলেন। তিনি অনেকগুলি ছবির মধ্য থেকে ক্ষিতীন্দ্রনাথের শকুন্তলা ছবি দেখে খুব প্রশংসা করে যান এর রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাঁর গুরুকুল আশ্রমের শিল্প-শাখার শিক্ষকরূপে ক্ষিতীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাবার জন্যে অবনীন্দ্রনাথের কাছে এসেছিলেন। কিন্তু নানা কারণে সেখানে যাওয়া হয়ে ওঠে নি। এর পরের বছর স্বামীজীর দেহান্ত হয়, তাই গুরুকুলে যাবার কথা চাপা পড়ে যায়।

একবার এক ঘণ্টার নোটিশে নেপালের রাজা সোসাইটিতে আসেন। তাঁর আগমনবার্তা শুনে অবনীন্দ্রনাথ গগনেন্দ্রনাথ অমরেন্দ্রনাথ অর্ধেন্দ্রকুমার ও ও যতীন্দ্রনাথ বসু আসেন। অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছবির উপরে যে বই লিখেছেন তার মলাটে ক্ষিতীন্দ্রনাথের একটি আলোকচিত্র আছে। সেই ছবি নেপালের রাজার দেখা ছিল, তাই তিনি এখানে এসে

ক্ষিতীন্দ্রনাথকে চিনতে পারেন। বললেন, "তিনি আমাকে মহালক্ষ্মী মহাকালী ও মহাসরস্বতীর ছবি আঁকতে বলে গেলেন। তাঁর নির্দেশমত চব্বিশ-পঁচিশ খানা ছবি তাঁকে এঁকে দিয়েছি।"

নেপালে ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্রের একটি ভালো সংগ্রহ আছে, আর আছে বোম্বাইতে বি. এন. ট্রেজুয়ারিওয়ালা নামে এক ভদ্রলোকের কাছে। আর কার কাছে কত ছবি আছে তা তিনি বলতে পারেন না। অবনীন্দ্রনাথ পাঁচ-ছয় খানা ও অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় আট-দশ খানা ছবি নিয়েছেন বলে তাঁর মনে পড়ে। লাহোর জাদুশালায় অনেক ছবি ছিল, কলকাতার জাদুঘরেও সম্ভবত একখানা আছে, এলাহাবাদ জাদুঘরে আছে অনেকগুলি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে একখানা আছে। বললেন, "বেশি ছবি রইল কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে; তাঁরা এখনো আমার ছবি কিনছেন। তাঁদের ইচ্ছে, আমার আঁকা অন্তত এক শ খানা ছবি রাখবেন।"

কলকাতার সোসাইটির কাজ ছাড়ার পর এক বছর বাড়িতে বসে ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ। ১৯৪২ সালে শ্রীঅমরনাথ ঝা তাঁকে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসেন। বললেন, "এখানে বেশ সুখেই কাটছে।"

তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে, তাঁর স্নেহ পেয়ে তিনি ধন্য হয়েছেন; ধন্য হয়েছেন অবনীন্দ্রনাথের প্রীতি স্নেহ ও শিক্ষা পেয়ে। আজ এঁদের কথা কেবলই তাঁর মনে হয়। জীবনে যদি এঁদের না পেতেন তাহলে তাঁর জীবন কোন্ পথে গড়িয়ে যেত তা বলা শক্ত।

একটু থেমে বললেন, "একটা কথা। আজকাল ছবি আঁকার একটা পদ্ধতি বের হয়েছে দেখছি। এতে মনে হয় চিত্রবিদ্যার ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকার। ইউরোপের অনুকরণ করে লাভ? আসলে অনুকরণ জিনিসটাই খারাপ। ইউরোপ কেবল প্রকৃতি নকল করে হাঁপিয়ে উঠেছে, তাই নূতন পথের সন্ধান করছে। কিন্তু ভারতীয় পদ্ধতি তো কেবল প্রকৃতি নকল করে ক্ষান্ত হয় না, এ পদ্ধতিতে কল্পনার আসর প্রকাণ্ড। তবে কেন আমরা ইউরোপের দেখাদেখি নিজেদের সর্বনাশ করতে উদ্যত হব। জাপানি চিত্র ও চীনা চিত্রও আর আগের মত নেই, ওই একই কারণে। আমাদের দেশের তরুণ শিল্পীদের

এ কথা মনে রাখা দরকার। তুলি ঘষে যা আঁকা যাবে, তা-ই যদি আর্ট হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তো সর্বনাশ।"

কথাটা সত্যি। রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা দেখে অনেক তথাকথিত কবি উৎসাহিত হয়ে গদ্যপথে পা বাড়িয়ে কবি হবার চেষ্টা করেছিলেন, আমরা দেখেছি। পদ্যছন্দে হাত না পাকলে দুরূহতর গদ্যছন্দ রপ্ত যে হয় না এ হুঁশ তাঁদের নেই। চিত্রশিল্প-ক্ষেত্রে এই ধরনের গদ্যশিল্পীর আবির্ভাবও ঘটেছে। প্রকৃত শিল্পীকে তাই আক্ষেপ করে বলতে হয়—

ওরা তো বোঝে না তুলি আর রং
কী কঠিন বশ করা,
আমাদের কাজ ওরা ভাবে মস্করা।

ঠিক এই আক্ষেপই যেন শুনলাম ক্ষিতীন্দ্রনাথের মুখে। শিল্পপ্রাণ তিনি, তাই শিল্পের বিনাশ-সম্ভাবনায় তিনি আতঙ্কিত।

সেই আতঙ্কের ছোঁয়াচ যেন লেগে গেল গায়ে। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে এলাম বাইকাবাগের রাস্তায়। শীতের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। রাস্তার ধার থেকে টাঙ্গা ভাড়া করে রওনা হলাম ত্রিধারা উদ্দেশে—ত্রিবেণীসঙ্গমে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে পড়ে মাইকেল মধুসূদনের সেই কবিতাটি, অতি তুঙ্গ শৃঙ্গশিরে সেই সুবর্ণ-দেউলের কথা।

সমতল প্রান্তরে, অতি সহজ নাগালের এলাকায়, কখনো প্রতিষ্ঠিত হয় না যশের মন্দির। দুরারোহ দুর্লঙ্ঘ্য কঠোর দুস্তর কঠিন— যত দুরূহ বিশেষণ আছে, তারই পরপারে এর অবস্থিতি। সুবর্ণ-দেউলের অধিষ্ঠান এমনি এক দুর্গম পর্বতের উত্তুঙ্গ চূড়ায়। যুগযুগান্ত ধরে কত যাত্রী পরিক্রমা করে চলেছে পথ— কত ক্লেশ, কত শ্রম, কত অধ্যবসায়, কত অনাহার, কত নিশিজাগরণ; কিন্তু এত যত্ন সত্ত্বেও কৃতার্থ হয় না সকলে—

বহু প্রাণী কাঁদিছে বিকলে
না পারি লভিতে যত্নে সে রত্নভবনে।

তীর্থপথ সর্বদাই দীর্ঘপথ। এ পথের দু ধারে থাকে কত চটি, কত ছত্র, কত সদাগরের বেচাকেনার হাট। এইসব পল্লীর গা ঘেঁষে ক্লান্ত পদক্ষেপে ধীরে ধীরে চলে যায় যাত্রীরা, তাদের দৃষ্টি ঐ দুর্গম ঊর্ধ্বে— ঐ সুবর্ণ-দেউলের দিকে। কিন্তু কেনাবেচা নিয়ে এখানে বসে যারা জীবন অতিবাহিত করতে থাকে এই সদাগরী বিপণীতে, তাদের মনে বুঝি ঐ দুর্গম পথে যাত্রার আকাঙ্ক্ষা থাকে না।

কিন্তু ব্যতিক্রম এর আছে। এই হাটের দোকানে বসে জীবনের যৌবনাংশ নিঃশেষ ক'রেও অবশেষে নূতন উদ্যমে দুরূহ পথে যাত্রা আরম্ভ ক'রে অনেক পূর্বগামীকে অতিক্রম ক'রে এই মন্দিরে উপস্থিত হতে পারার দৃষ্টান্ত আছে।

সে দৃষ্টান্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অন্তহীন দূরের যে সুবর্ণ-দেউলটি নীল আকাশের গায়ের সন্ধ্যাতারাটির মত মনে হত, সেই তারাই হয়ে উঠল জীবনের শুকতারা। প্রত্যেক প্রত্যূষে সেই দিতে লাগল প্রথম পথনির্দেশ।

জীবনের যৌবনাংশ শেষ হলেও জীবনটি ছিল তাঁর জিম্মায়। নূতন পথনির্দেশে তাই বুঝি কঠিন সংকল্পে সমর্পিত হল সেই জীবন। যৌবনের উপর নির্ভর না করে কেবল উদ্যমের উপর ভরসা রেখে তাই অধিক বয়সে তাঁর নূতন পথে এই যাত্রা। কেবল উদ্যমের উপরেই ভরসা বলা যায়; কেননা. খুঁজে দেখলে দেখা যায় এ ছাড়া পুঁজি ছিল না তাঁর আর-কিছু।

বেশি দূর লেখাপড়া করতে পারেন নি ব্রজেন্দ্রনাথ। অল্পবয়সেই তিনি এক সদাগরী আপিসে চাকরিতে ঢোকেন। কুড়ি বছর তিনি কাজ করেন এখানে। জীবনের এই সারাংশ শেষ হবার পর তিনি নূতন পথের যাত্রী হন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছেন তাঁর অভীষ্ট গন্তব্যস্থলে।

ব্রজেন্দ্রনাথের জীবন এমনি-এক অধ্যবসায়ের জীবন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে অনেকবার। কিন্তু তার মধ্যেই মনে পড়ে একদিনের কথা। খ্রীস্টীয় ১৯৫০, বঙ্গাব্দ ১৩৫৭, ভাদ্র মাসের দুপুর। একটা বইয়ের খোঁজে গিয়েছি পরিষদে, লাইব্রেরি-ঘর থেকে গলা শুনতে পাচ্ছি ব্রজেন্দ্রনাথের, খুব উত্তেজিত গলা। তিনি পরিষদের সম্পাদক, হয়তো পরিষদের কোনো কর্মীর কোনো কাজে অসন্তুষ্ট হয়ে রুষ্ট হয়েছেন, এই কথা ভেবে উঠে তাঁর কাছে গেলাম না। কিছুক্ষণ পরে, তাঁর গলার শব্দ না পেয়ে উঠে তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর সম্মুখে বসতেই তিনি বললেন, "কি কাণ্ড দেখুন, আমাকে ঠকাতে চায়!"

ব্যাপার সবটা শুনলাম। বিদ্যাসাগরের জীবন নিয়ে একটা চলচ্চিত্র তোলার উদ্যোগ নাকি চলেছে, তাদেরই কে-একজন বিদ্যাসাগরের জীবনের উপকরণ সংগ্রহের জন্যে এসেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথের কাছে। উপকরণ দিতে রাজি হয়েছিলেন তিনি, কিন্তু, বললেন, "আমি ভদ্রলোকটিকে বললাম, আপনি পরিষদকে পঞ্চাশটি টাকা দিন, উপকরণ আমি দেব। কিন্তু, কী লোক দেখুন, টাকা দিতে রাজি না, কিন্তু উপকরণ নাকি আমাকে দিতেই হবে। এতে টেম্পার ঠিক থাকে?"

চোখ থেকে চশমা খুলে কেস্‌এ রাখলেন, দ্বিতীয় কেস্ থেকে আর-একটি চশমা বের করে চোখে দিলেন— এ-চশমাটির কাঁচ প্রায় দ্বিগুণ পুরু। সেই

পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে তাঁর চোখ-দুটি দ্বিগুণ বড় দেখাতে লাগল। আগের চশমাটি পথ-চলার, আর এইটি হচ্ছে বই-পড়ার। চোখের কাজ করে-করে চশমার পাওয়ার কেবল বাড়িয়ে যেতে হয়েছে।

মাত্র পঞ্চাশটি টাকা চেয়েছিলেন তিনি পরিষদের জন্যে, বোধ হয় ভুল করেছিলেন। যারা লক্ষ-লক্ষ টাকা ব্যয় করে একটা চলচ্চিত্র-নির্মাণে, তাদের কাছে পঞ্চাশ টাকা বুঝি হাতের ময়লা। ঐ সামান্য চাহিদা দেখে তারা বুঝি এই মানুষটিকেও সামান্য জ্ঞান করেছিল, এইজন্যেই বিনামূল্যে উপকরণ আদায়ের জন্যে চাপ দিয়েছিল।

বললেন, "হবে হয়তো। পাঁচ হাজার চাইলেই বুঝি চাহিদার মানে বুঝত, উপকরণের দাম বুঝত। কে যেন বলেছিল একদিন— যারা ছায়াচিত্র করে তাদের ছায়া মাড়াতে নেই। কথাটার মানে সেদিন বুঝতে পারি নি।"

সাহিত্য-পরিষদ্ আর ব্রজেন্দ্রনাথ বুঝি পৃথক দুটি সত্তা নয়— এক ও অভিন্ন। পরিষদের উন্নতিই যেন আত্মোন্নতি, পরিষদের লাভ যেন তাঁর নিজের লাভ। এইজন্যে তিনি উপকরণ-সরবরাহ করে কিছু মূল্য চেয়েছিলেন, নিজের জন্যে নয়, পরিষদের জন্যে।

ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনে কোনো উপকরণ নেই, তাঁর জীবন পরিশ্রমের জীবন, অধ্যবসায়ের জীবন, ও ধৈর্যের জীবন।

২১এ সেপ্টেম্বর ১৮৯১, ৫ই আশ্বিন ১২৯৮, তারিখে হুগলী, বালি, কাটগড়া লেনস্থ পৈতৃক বাটীতে ব্রজেন্দ্রনাথের জন্ম। পিতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন পণ্ডিত ছিলেন, তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। এক বৎসর বয়সে ব্রজেন্দ্রনাথ পিতৃহীন হন, এবং এগারো-বারো বৎসর বয়সে তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে।

"আমি আগাগোড়াই মিশনারীদের স্কুলে বিদ্যাশিক্ষা করি। হুগলী ব্যাণ্ডেল কনভেণ্টের সংলগ্ন একটি ইংরেজি-বাংলা স্কুল ছিল, সেখানে মাইনর পর্যন্ত পড়ি। তার পর চুঁচুড়া ইউনাইটেড ফ্রী চার্চ ইনসটিটিউশনের চতুর্থ শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হই; এখানে এনট্রান্স স্ট্যাণ্ডার্ডের দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়ি।"

ইউনাইটেড ফ্রী চার্চ ইনসটিটিউশনে তাঁকে বেতন দিতে হত না।

রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভ্রাতা হুগলীর খ্যাতনামা উকিল তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এই অসহায় বালকের প্রতি দয়াপরাবশ হয়ে ইনসটিটিউশনের কর্তৃপক্ষকে বলে-কয়ে তাঁকে বিনা বেতনে পড়ার সুবিধা করে দেন। বেতন দিতে হত না বটে, কিন্তু বেতন ব্যতীতও অন্য প্রয়োজন থাকে, তার কোনো সংগতি ছিল না তাঁর, তাই "প্রতিকূল অবস্থা শীঘ্রই আমাকে স্কুল ছাড়তে বাধ্য করল।"

অর্থাৎ ছাত্রজীবন তাঁর শেষ হয়ে গেল এখানেই। উপায়ান্তর না দেখে তিনি হুগলী ত্যাগ করে কলকাতায় এসে তাঁর সেজদিদির কাছে থেকে টাইপরাইটিং শেখার জন্যে বৌবাজারে Cann's Fonetik Skool -এ ভর্তি হলেন।

ছয় মাস যেতে না যেতেই তাঁর একটা চাকরি জুটে গেল। বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটের সংলগ্ন সুটারকিন লেনে E. Cowan নামক একজন ইহুদী চুরুট-ব্যবসায়ীর কাছে; মাসিক বারো টাকা মাইনেয় তিনি এখানে টাইপিস্টের কাজ আরম্ভ করেন। এ-ঘটনা ১৯০৮ সালের, ব্রজেন্দ্রনাথের বয়স তখন সতেরো বৎসর।

চাকরিতে তখন তিনি সবে ঢুকেছেন, থাকেন চুনাপুকুর লেনের মেস্‌এ, কিন্তু কেবল টাইপরাইটিং শিখেই জীবন কাটানো সম্ভব হবে কি না এ সন্দেহ অবশ্যই তাঁর ছিল, এইজন্যে তাঁর মাতুলপুত্র সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের চাঁপাতলর বাসায় গিয়ে তাঁর কাছে শর্টহ্যাণ্ড শিখতে আরম্ভ করেন। এইখানে একদিন 'জাহ্নবী' পত্রিকার সম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এ-পরিচয় ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনে একটি স্মরণীয় ঘটনা; কেননা, এই পরিচয়ের সূত্রেই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর প্রথম উপস্থিতি। নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের 'জাহ্নবী' পত্রে (আষাঢ় ১৩১৬) ব্রজেন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম রচনা প্রকাশিত হয়, রচনাটির নাম স্বপ্নপ্রসঙ্গ।

নলিনীরঞ্জনের সঙ্গে পরিচয় কেবল পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল, তার দৃষ্টান্ত ব্রজেন্দ্রনাথের বিবাহ-উপলক্ষ্যে লিখিত তাঁর উপহার-কবিতা।

বৎসর-খানেক হল চাকুরি-জীবন আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু থাকা-খাওয়ার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, এইজন্যে তাঁকে তখন বিবাহ করতে হয়। ১৯০৯ সালের ৯ই ডিসেম্বর, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৩১৬ বঙ্গাব্দ, চুঁচুড়া ষণ্ডেশ্বরীতলা-নিবাসী মহেন্দ্রনাথ হালদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা বীণাপাণি দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

এই উপলক্ষ্যে কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত এই উপহার-পত্র প্রকাশ করেন—

বেজে ওঠ, বেজে ওঠ, হে 'বীণা'সুন্দরী,
যেমতি বাজিয়াছিলে মধুর স্বননে—
একদিন যমুনার স্নিগ্ধ-শ্যাম তীরে,
ব্রজেন্দ্রের কর শোভি' অয়ি সুলোচনে।
আজি এ ব্রজেন্দ্র-করে অয়ি সুশোভনে
শোভি' তুমি মধুস্বরে ওঠ গো ঝঙ্কারি;
ক্ষীরোদ-মন্থন-সুধা কলসে কলসে
ঢেলে দাও, ঢেলে দাও, সারা বিশ্ব ভরি'।

—নলিনী

হে ব্রজেন্দ্র, যে মাতার স্বর্ণক্ষেত্রে খেলি'
লভিয়াছ মহাপ্রাণ, দোঁহে আঁখি মেলি'
নেহার নয়নে তাঁর কি অপার স্নেহ,
বক্ষে তাঁর ক্ষীরধারা কি অপরিমেয়।
লবণজলধি যাঁর চরণে মুখর,
তুষার কুন্দের মালা অলক শিখর,
অন্নপূর্ণা আমাদের এই জননীর
পদতলে, হে দম্পতি, নত কর শির।

—করুণা

সামান্য একটি আপিসের সামান্য বেতনের সতেরো-আঠারো বৎসর বয়সের এক টাইপিস্টের বিবাহ-উপলক্ষ্যে লিখিত এই কবিতা। সেই বালক উত্তর-

জীবনে বাগ্‌দেবীর তপস্যায় মগ্ন হয়ে যশের মন্দিরে প্রবেশের ছাড়পত্র লাভ করবেন কিনা, কে তা জানত।

কিছুদিন যায়। এর পর নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত তাঁকে ৬৬ নম্বর মানিকতলা স্ট্রীটে এডওয়ার্ড ইনসটিটিউশনে অধ্যাপক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও তাঁর বন্ধু চারুচন্দ্র মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন। বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে ব্রজেন্দ্রনাথ নবাবী আমলের ইতিহাস অবলম্বন করে রচনা করেন একটি গ্রন্থ— বাঙ্গলার বেগম। এই বইই ব্রজেন্দ্রনাথের রচিত ও প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ (ফাল্গুন ১৩১৯ বঙ্গাব্দ)।

যদুনাথ সরকার তখন পাটনা কলেজের অধ্যাপক। ব্রজেন্দ্রনাথের এই বইয়ের এক খণ্ড যদুনাথের অভিমত জানতে চেয়ে তাঁর কাছে নলিনীরঞ্জন পাঠিয়ে দেন। উত্তরে যদুনাথ সংক্ষেপে জানান, 'বইখানি পড়িয়া দেখিলাম, উহা উপন্যাস মাত্র— ইতিহাস নহে।'

প্রথম রচনা সম্বন্ধে এরূপ কঠোর মন্তব্য শুনলে নিরুৎসাহ হওয়ার কথা। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ নিরুৎসাহ হবার জন্য প্রস্তুত নন। বললেন, "দমলাম না। যদুনাথের কাছে ইতিহাস-রচনার প্রণালী জানার জন্য মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।"

এর কিছু দিন আগে জলধর সেনের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছে। বললেন, "সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে যে উৎসাহ লাভ করেছি তা ভুলবার নয়। তিনিও আমাকে যদুনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।"

যদুনাথ তাঁর পিতৃবিয়োগের পর তখন কলকাতায় এসেছেন। এই সময়ে জলধর সেন ব্রজেন্দ্রনাথকে নিয়ে তাঁর কাছে যান। এবং সেই সময়ে ইতিহাস-রচনার প্রণালী সম্বন্ধে তিনি যদুনাথের কাছে প্রথম পাঠ গ্রহণ করেন।

"তিনি আমাকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত জর্জের Historical Evidence পুস্তকখানি সযত্নে পাঠ করতে বলেন। ১৩২১ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে বর্ধমানে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে ইতিহাস-শাখার সভাপতি রূপে যদুনাথ যে অভিভাষণ পাঠ করেন তা থেকেও ইতিহাস রচনার প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি। তদবধি তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি।"

ইতিহাসের প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের অনুরাগ দেখে যদুনাথ নানাভাবে তাঁকে উৎসাহিত করেছেন ও পথনির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরই তত্ত্বাবধানে ব্রজেন্দ্রনাথ মোগলযুগের ইতিহাস আলোচনা আরম্ভ করেন। "তৎপরে তাঁর সাহায্য লাভ করে ১৩৩১ বঙ্গাব্দ (খ্রী ১৯২৪) থেকে আমি বাংলা ও ভারত সরকারের দপ্তরখানায় পুরাতন সরকারি পুথিপত্রের অনুসন্ধান-কার্যে ব্রতী হই।"

এ-সময়েও ব্রজেন্দ্রনাথ সওদাগরী আপিসের চাকুরিয়া। বারো টাকা বেতনের টাইপিস্টের আর্থিক উন্নতি হয়েছে কিছুটা। তিনি জেম্‌স্ ফিন্‌লে অ্যাণ্ড কোম্পানির আপিসে বেতন পাচ্ছেন দেড় শত টাকা। ইতিমধ্যে কেটে গিয়েছে কুড়িটি বৎসর, তাঁর জীবনের যৌবনাংশ নিঃশেষিত হয়েছে।

অবশেষে ১৯২৯ সালের জানুয়ারি মাসে (১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) তাঁর জীবনের ধারা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হল। 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকাদ্বয়ের সহকারী-সম্পাদকরূপে তিনি কাজ আরম্ভ করলেন। "আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) সঙ্গে পরামর্শ করে এই পদে আমাকে নির্বাচিত করেন। এখনও এই পদে কাজ করছি।"

মাইকেল মধুসূদনের কবিতা দিয়েই আরম্ভ হয়েছে এই জীবনকথা; পুনরায় মনে পড়ছে মাইকেলেরই কবিতা—

কেলিনু শৈবালে ভুলি' কমলকানন

ব্রজেন্দ্রনাথও এতদিন সদাগরী-আপিসের শৈবালে ক্রীড়া করে বেরিয়েছেন, এবার তিনি যেন এসে পৌঁছেছেন তাঁর অভীপ্সিত নিকেতনে, তিনি এসেছেন কমলকাননে।

এখানে আসার পূর্ব থেকেই তিনি নিজেকে নির্মাণকার্যে আত্মনিয়োগ করেন, এবং নিজেকে প্রস্তুত করেও তোলেন। এবার পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ হল তাঁর কাজ। অনুসন্ধানের চোখ তৈরি হয়েছে তাঁর, 'সদাগরী আপিসের কনিষ্ঠ কেরানি'টি এবার সেই শিক্ষিত চোখ দিয়ে খোঁজ আরম্ভ করলেন নূতন তথ্যের।

"পুরাতন বাংলা সংবাদপত্রের প্রতি আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে আমি শোভাবাজার-রাজবাড়িতে প্রাচীনতম বাংলা সংবাদপত্র

সমাচার দর্পণে'র বহু সংখ্যা আবিষ্কার করি। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সুষ্ঠুভাবে রচনা করতে হলে পুরাতন সংবাদপত্র অপরিহার্য।"

সাহিতক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন ও সাহায্য করেছেন অনেকে। কিন্তু সবচেয়ে বড় সাহায্য তিনি পেয়েছেন যাঁর কাছ থেকে তিনি নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত। সামান্য লেখাপড়া-জানা একটি টাইপিস্ট বালককে উৎসাহ দেবার আকাঙ্ক্ষা জাগে কয় জন মানুষের।

বললেন, "রচনাকার্যে আমার হাতে খড়ি হয় আলীপুর কোর্টের উকিল পরলোকগত চারুচন্দ্র মিত্রের নিকট। গত কয়েক বৎসর যাবৎ 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস আমাকে সাহিত্যসেবায় অকাতরে সাহায্য করে আসছেন। সর্বপ্রকারে তিনি সাহায্য না করলে, এবং অকৃত্রিম সুহৃদ্ ডক্টর গিরীন্দ্রশেখর বসুর কাছ থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ না করলে, গবেষণাকার্যে রত থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হত না।"

বিভিন্ন গ্রন্থ তিনি রচনা সম্পাদন ও সংকলন করেছেন। সাহিত্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা আছে বলেই এসকল কাজ করা তাঁর কক্ষে সম্ভব হয়েছে। বঙ্গসাহিত্যে যাঁদের বিশিষ্ট দান আছে সেইসব সাহিত্যিক-পূর্বসূরীবৃন্দের জীবনী ও রচনাবলীর কথা স্বল্পপরিসরে সংকলন করে 'সাহিত্যসাধক চরিত-মালা'য় প্রকাশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বৃহৎ কীর্তি সম্ভবত 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'।

ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর যে-জীবনের সারাংশ ব্যয় করে এসেছেন অন্যত্র, তারই শেষাংশ নিয়োগ করে অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা যে-দুরূহ কাজ সম্পন্ন করেছেন, জীবনের সম্পূর্ণাংশ ব্যয় করেও অতটা কাজ করা অন্যের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি কি করেছেন তার প্রমাণ পেতে হলে তাঁর কৃত কার্যের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়, পরিচিত হলে বিস্মিত হতে হয়। ভবিষ্যৎকালের গবেষকদের জন্যে তিনি উপকরণ আহরণ করে তা সুসজ্জিত করে রেখে গেছেন।

আরও কাজ হয়তো করার ছিল। কিন্তু সব কাজ কে শেষ করতে পারে সংসারে? রোগশয্যায় শুয়ে শুয়েই তিনি 'বাংলা সাময়িক-পত্রে'র প্রথম ও

দ্বিতীয় খণ্ডের "সংশোধন ও সংযোজন" প্রস্তুত করছিলেন, এই কাজ যে দিন তিনি সমাপ্ত করলেন, তার পর দিনই, ১৭ আশ্বিন ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ, ৩রা অকটোবর ১৯৫২, তিনি লোকান্তরিত হলেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। পরিষদের চরম দুর্দিনের দিনে তিনি এর সংস্পর্শে আসেন, এবং নিজের চেষ্টায় পরিষদের উন্নতি সাধন করেন। সে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে-ইতিহাস পৃথক্ ভাবে হয়তো ভবিষ্যতে লিখিত হবে। ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে পরিষদের সাধারণ-সদস্য রূপে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সংস্পর্শে আসেন. ১৩৪১ বঙ্গাব্দে 'আজীবন-সদস্য' পদ গ্রহণ করেন; এবং ১৩৩৯এ কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য, তারপর গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩৪০-৪১), সহকারী সম্পাদক (১৩৪১-৪২), কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য (১৩৪৩-৪৪), পরিষৎ-পত্রিকার সম্পাদক (১৩৪৫-৪৬), সম্পাদক (১৩৪৭-৫১), গ্রন্থাধ্যক্ষ (১৩৫২-৫৫), সম্পাদক (১৩৫৬-৫৭)।

১৯২৮ সালে ক্যালকাটা হিস্টরিকাল সোসাইটি ব্রজেন্দ্রনাথকে অনারারি মেম্বর মনোনীত করে সম্মান প্রদর্শন করেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ এঁকে রামপ্রাণ গুপ্ত স্বর্ণপদক দান করেন 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' ও 'বঙ্গীয়-নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থের জন্য।

সাহিত্য ও ইতিহাস সংক্রান্ত তাঁর কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫১-৫২ সালে তাঁকে রবীন্দ্রস্মৃতি-পুরস্কার দান করেন।

যে-জীবন নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সদাগরী আপিসের কর্মের মধ্যে, সেই জীবনধারা তিনি নূতন খাতে প্রবাহিত করে বাংলাসাহিত্যের ভূমি উর্বর করে দিয়েছেন। বর্তমান কালের বঙ্গদেশ যদি তাঁর সম্যক্ পরিচয় পেয়ে না থাকে সে-দোষ বঙ্গদেশের; অদূর ভবিষ্যতের বঙ্গদেশ তার ক্ষতিপূরণ করবে দ্বিগুণ ভাবে। যে-সম্পদ্ তিনি আহরণ করে রেখে গেলেন, দ্বিগুণ উৎসাহে তার সদ্ব্যবহার করার জন্যে ব্যগ্র হবে বিদ্যোৎসাহীরা— তারা তাঁকে নমস্কার জানাবার সৌভাগ্য লাভ করেনি, তাই তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাবে।

ব্রজেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন, চোখের পুরু কাঁচের চশমা খুলে কেস্এ রেখে হাল্কা কাঁচের চশমা চোখে দিয়ে বললেন, "বড় শুকনো, যাকে বলে ড্রাই—

এই আমার জীবন। কিন্তু যে-কাজ আমি করেছি, তাতে বড় রস পেয়েছি আমি।"

তাঁকে নমস্কার জানালাম। নমস্কার জানিয়ে পরিষদের সিঁড়িতে এসে দাঁড়াতেই বৃষ্টি নামল। শুকনো সারকুলার রোড ভিজে গেল সেই জলধারায়।

রচিত ও সংকলিত গ্রন্থাবলী

বাঙ্গালার বেগম। ১৩১৯ বঙ্গাব্দ

Begams of Bengal। খ্রী ১৯১৫

নূরজাহান্। ১৩২৩ বঙ্গাব্দ

বেগম সমরু। ১৩২৪ বঙ্গাব্দ

মোগল যুগে স্ত্রীশিক্ষা। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

মোগল-বিদুষী। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ

জহান্-আরা। ১৩২৭ বঙ্গাব্দ

রাজা-বাদ্শা। ১৩২৮ বঙ্গাব্দ

রণডঙ্কা। ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

দিল্লীশ্বরী। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ

কেল্লাফতে। ১৩৩১ বঙ্গাব্দ

Begam Samaru। খ্রী ১৯২৫

Rajah Rammohun Roy's Mission to England। খ্রী ১৯২৬

Dawn of New India। খ্রী ১৯২৭

শিবাজী মহারাজ। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ

বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গ। ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ

সংবাদপত্রে সেকালের কথা। তিন খণ্ড। ১৩৩৯-'৪০-'৪২ বঙ্গাব্দ

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। ১৩৪০ বঙ্গাব্দ

দেশীয় সাময়িক পত্রের ইতিহাস। ১৩৪২ বঙ্গাব্দ

বাংলা সাময়িক-পত্র। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

সাহিত্যসাধক-চরিতমালা। ৯৫ খণ্ড : ১৩৪৬-১৩৫৮ বঙ্গাব্দ
Begams of Bengal। পুনর্লিখিত। খ্রী ১৯৪২
রবীন্দ্র-গ্রন্থ-পরিচয়। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ
Bengali Stage : 1795-1873। খ্রী ১৯৪৩
মহারাণা প্রতাপসিংহ। ১৩৪৯ বঙ্গাব্দ
বঙ্গীয় নাট্যশালা : ১৭৯৫-১৮৭৩। ১৩৫০ বঙ্গাব্দ
বাংলা সাময়িক সাহিত্য : ১৮১৮-৬৭। ১৩৫১ বঙ্গাব্দ
শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস ১৮২৪-৫৮। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ
আচার্য শ্রীযদুনাথ সরকার। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ
পরিষৎ-পরিচয় ১৩০০-১৩৫৬। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ
সাময়িকপত্র সম্পাদনে বঙ্গনারী। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ
বঙ্গসাহিত্যে নারী। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ
মোগল-পাঠান। আষাঢ় ১৩৫৯

সম্পাদিত গ্রন্থ

দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা। ১১ খণ্ড : ১৩৪৩-'৪৬ বঙ্গাব্দ
মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী। ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

যুগ্ম-সম্পাদনা ॥ শ্রীসজনীকান্ত দাস-সহ

বিদ্যাসার-গ্রন্থবলী। তিন খণ্ড। ১২৪৪-১৩৪৬ বঙ্গাব্দ
বঙ্কিম-রচনাবলী। নয় খণ্ড। ১৩৪৫-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ
আলালের ঘরের দুলাল। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ
রবীন্দ্র-রচনাবলী। অচলিত : দুই খণ্ড। ১৩৪৭-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ
মধুসূদন-গ্রন্থাবলী। দুই খণ্ড। ১৩৪৭-১৩৪৮ বঙ্গাব্দ
ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী। দুই খণ্ড। ১৩৪৯-১৩৫০ বঙ্গাব্দ
বাংলার কবি ও কাব্যগ্রন্থমালা। তিন খণ্ড। ১৩৪৯,-'৫০,-'৫১ বঙ্গাব্দ
দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী। দুই খণ্ড। ১৩৫০-১৩৫১ বঙ্গাব্দ

পালামৌ। ১৩৫১ বঙ্গাব্দ
রামমোহন-গ্রন্থাবলী। দুই খণ্ড। ১৩৫১-১৩৫২ বঙ্গাব্দ
শকুন্তলা। ১৩৫২ বঙ্গাব্দ
দ্বিজেন্দ্রলাল-গ্রন্থাবলী। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ
হুতোম প্যাঁচার নকশা। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ
সীতার বনবাস। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ
সারদামঙ্গল। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ
রামেন্দ্র-রচনবলী। পাঁচ খণ্ড। ১৩৫৬-১৩৫৭ বঙ্গাব্দ
মহিলা। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ
শরৎকুমারী চৌধুরাণীর রচনাবলী। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ
শরৎ-পরিচয়। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ
পাঁচকড়ি-রচনাবলী। দুই খণ্ড। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ
স্বর্ণলতা। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (ব্রজেন্দ্র-সজনীকান্ত)। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ
পদ্মিনী-উপাখ্যান
শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী
বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ

শ্রীনীলরতন ধর

মাটির মানুষ। মাটি নিয়ে গবেষণাই বৈজ্ঞানিক নীলরতন ধরের প্রধান কাজ। তিনি মাটিকে পরীক্ষা করে করে মাটি থেকে সংগ্রহ করেছেন সার। মাটির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তার দরুন তিনি নিজেও হয়ে উঠেছেন মাটির মানুষ।

বর্তমানের এই লোহা-লক্কড় আর ইঁট-পাথরের সংসারে এই রকম দু-এক জন মাটির মানুষ আছেন বলেই এখনো সংসারে কিছুটা সার আছে।

আসলে আমাদের সকলের ভিতরেই মাটির প্রতি টান আছে, কিন্তু গায়ে মাটি মাখতে আমাদের অভিজাত্যে হয়তো বাধে। নীলরতন তাঁর গা থেকে আভিজাত্যের আবরণ ফেলে দিয়ে মাটি নিয়েই মশগুল আছেন। রসায়নের মধ্যে তিনি রসের সন্ধান পেয়েছেন বলা যায়। তাই মাটিকেই করেছেন তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের তিনি ছাত্র। গুরুর কাছ থেকে তিনি কেবল রসায়নের মন্ত্রই গ্রহণ করেন নি, গুরুর কাছ থেকে সাদাসিধে জীবনধারণের এবং গভীরভাবে মননের মন্ত্রও গ্রহণ করেছেন। তাঁর এইরূপ অনাড়ম্বর জীবনযাপনের প্রণালী দেখে তাঁকে বলা হয়েছে যে, তিনি হচ্ছেন a sannyasi among scientists। বস্তুতপক্ষে তাঁকে এখন সন্ন্যাসীই যেন বলা যায়। পোশাকে-আশাকে কোনো চাকচিক্য নেই, সরল ও সহজ প্রকৃতি, এবং সবচেয়ে যা বড় কথা, আত্মসচেতনতা নেই বিন্দুবিসর্গ। তিনি যে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এ সংবাদ যেন তাঁর সম্পূর্ণ অজানা। তাঁর নিরহংকার প্রকৃতি দেখলে এমনিই মনে হয়। তাঁর গৃহ সব সময় অবারিতদ্বার, যখন খুশি তাঁর সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হতে বাধা নেই এতটুকু।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কৃতি ছাত্র তিনি। পোশাক-পরিচ্ছদ সাধারণ-গোছের। তাঁর গুরুদেব আচার্য রায়ের মত plain living ও high thinking তাঁর আদর্শ।

এলাহাবাদ শহরের এক প্রান্তে বেলী রোডের উপর ডক্টর নীলরতন ধরের নিজস্ব বাড়ি। শহরের কোলাহল থেকে মুক্ত এই জায়গাটি। শীলাধর ইনস্‌টিটিউট অব সয়েল সায়ান্স ডক্টর ধরের বাড়ির সংলগ্ন। ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়ান্সের নূতন গৃহ শীলাধর ইন্‌সটিটিউটের সম্মুখস্থ ভূমিখণ্ডে। উক্ত ভূমিখণ্ড দান করেছেন ডক্টর নীলরতন। ২২এ জানুয়ারি ১৯৫২ অ্যাকাডেমির নবগৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছেন উত্তরপ্রদেশের অন্যতম মন্ত্রী ডক্টর সম্পূর্ণানন্দ। অ্যাকাডেমির সম্পাদক ডক্টর রামকুমার শাকসেনা বার্ষিক কার্যবিবরণীতে নীলরতন ধরকে বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করেছেন।

শীলাধর ইনস্‌টিটিউট নীলরতনের গবেষণাগার। তাঁর মৃতা পত্নীর নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে। নীলরতন এই প্রতিষ্ঠানটি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের আজীবন ডিরেক্টর। উক্ত গবেষণাগারে নীলরতনের পরিচালনায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত গবেষক-ছাত্র কৃষি-বিষয়ক গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। গবেষকগণ সরকার থেকে বৃত্তি পান। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গবেষকগণ ডি. ফিল. ও ডি. এস্‌সি উপাধি লাভ করেন।

এলাহাবাদ-প্রতাপগড় রেললাইনে গঙ্গানদীর উপর সেতু ডক্টর ধরের বাড়ি থেকে আড়াই মাইল দূরে। প্রতি রবিবার বিকেল বেলা তিনি উক্ত সেতুতে বেড়াতে যান। তাঁর বাড়ি থেকে মুর সেণ্ট্রাল কলেজও এক মাইলের মত দূর। এই কলেজে প্রতিদিন সকালবেলা তিনি ক্লাস নেন। সেখানেও তিনি পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করেন। বললেন, "আমি প্রতিদিন পাঁচ মাইল পথ হাঁটি।"

গ্রীষ্মকালে নীলরতন ধর কিছু দিনের জন্য মুশৌরি উতকামণ্ড বা অন্য কোনো শৈলাবাসে বেড়াতে যান। মুশৌরিতে তাঁর নিজস্ব বাড়ি আছে বার্লুগঞ্জে। পিতার নাম অনুসারে এই বাড়ির নাম দিয়েছেন 'প্রসন্ন কুটির'।

খ্রীস্টীয় ১৮৯২ সনের ২রা জানুয়ারি, ১২৯৮ বঙ্গাব্দের ১৯এ পৌষ যশোহর শহরে নীলরতনের জন্ম হয়। "আমাদের বাড়ি যশোহর জেলার

ঘোলখাদা গ্রামে। যশোহর শহরেই বরাবর আমাদের বাস ছিল। আমার পিতার নাম স্বর্গত প্রসন্নকুমার ধর। তিনি যশোহরে উকিল ছিলেন। ১৯৩০ সনে তাঁর মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন ছিল ৩৮ বৎসর। আমরা ছয় ভাই ও তিন বোন।"

তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা যশোহর শহরেই সম্পন্ন হয়। ১৯০৭ সালে যশোহর জেলাস্কুল থেকে প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করে এনট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের পনর টাকা বৃত্তি পান। তারপর তিনি কলকাতায় রিপন কলেজে প্রবেশ করেন। রিপন কলেজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইংরেজি ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেন। ১৯০৯ সালে তিনি প্রথম বিভাগে উচ্চস্থান অধিকার করে বিজ্ঞানে ইণ্টারমিডিয়েট পাস করেন ও কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। এর পর বি. এস্-সি. ও এম. এস্-সি. পড়েন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বি. এস-সি অধ্যয়নকালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীঅমিয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কৃষ্ণনগর কলেজের ভূতপূর্ব প্রিন্সিপাল শ্রীজিতেন্দ্রমোহন সেন নীলরতনের সতীর্থ ছিলেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা, সার্ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও ঐ সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যয়ন করতেন। এঁরা নীলরতনের দুই ক্লাস নীচে পড়তেন। এঁরা সকলে হিন্দু হস্টেলে থাকতেন। তখন তাঁদের মধ্যে সহৃদয়তা জন্মে। সে সম্পর্ক এখনো অটুট আছে।

১৯১১ সালে নীলরতন প্রথমশ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে অনার্স সহ বি. এস্-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ও মাসিক বত্রিশ টাকা বৃত্তি পান। ১৯১৩ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে তিনি এম. এস্-সি. ডিগ্রি লাভ করেন। পদার্থ-রসায়নে (Physical Chemistry) তিনি গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। সে বছর এম. এ. ও এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সকল ছাত্রের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় নীলরতন দশটি স্বুবর্ণ পদক ও পাঁচ শত টাকা নগদ পুরস্কার পান। এম. এস্-সি. ডিগ্রি লাভের পরও ডক্টর ধর দুই বৎসর প্রেসিডেন্সি কলেজে

গবেষণা করেন। শেষ চার বৎসর তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সঙ্গে তাঁর বাসায় থাকতেন।

১৯১৩ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ওই বছর থেকেই তিনি কলিকাতা ও ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমিডিয়েট, বি. এস-সি., পি. এইচ-ডি., ডি. এস-সি. এবং পি আর. এস. পরীক্ষায় রসায়ন-শাস্ত্রের পরীক্ষক হন।

১৯১৪ সালে তিনি নয় শত টাকার গ্রীফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ, ইলিয়ট প্রাইজ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের পদক লাভ করেন।

১৯১৫ সালে ভারত সরকারের কাছ থেকে মাসিক তিন শত টাকা বৃত্তি পেয়ে তিনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে চার বৎসর অধ্যয়ন করতে যান।

১৯১৭ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থ-রসায়নে নীলরতন ডি. এস্-সি. উপাধি পান।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় কোনো বিদেশীকে পদার্থ-রসায়নে স্টেট ডক্টর অব্ সায়ান্স উপাধি সচরাচর দেন না। নীলরতন ১৯১৯ সালে উক্ত উপাধি লাভ করে ভারতবাসীর মুখোজ্জ্বল করেন।

১৯১৯ সালে ডক্টর ধর লণ্ডনের এফ. আর. আই. সি. হন। তিনি লণ্ডনের কেমিকাল সোসাইটির ফেলো। ভারতবর্ষের ন্যাশনাল ইনসটিটিউট অব সায়ান্স, ন্যাশনাল অ্যাকেডেমি অব সায়ান্স এবং ইণ্ডিয়ান কেমিকাল সোসাইটির গোড়াপত্তন থেকেই নীলরতন উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ফেলো।

নীলরতনই প্রথম এবং একমাত্র ভারতীয় রাসায়নিক, যিনি লণ্ডনের বোর্ড অব এডুকেশনের বিশেষ সুপারিশে ইণ্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস পান। ১৯১৯ সালের মে মাসে তিনি এই পদ লাভ করেন। তিনি ভেবেছিলেন, তাঁকে বাংলা দেশেই প্রেসিডেন্সি বা অন্য কোনো কলেজে কাজ দেওয়া হবে। কিন্তু তাঁকে পাঠানো হল এলাহাবাদে।

১৯১৯এর জুলাই মাসে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মুর সেণ্ট্রাল কলেজে পদার্থ-রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐ বৎসর থেকে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়েরও পদার্থ-রসায়নশাস্ত্রের অবৈতনিক অধ্যাপক।

কুড়ি-বাইশ বৎসর নীলরতন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের কাজ করছেন। প্রায় চার বৎসর তিনি এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডীন অব দি ফ্যাকাল্টি অব সায়ান্স ছিলেন।

বহু বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির সদস্যরূপে কাজ করেছেন নীলরতন।

তিনি ১৯৩৫-৩৭ সালে ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়ান্সের সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে উত্তম বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য উক্ত অ্যাকাডেমি থেকে স্বর্ণপদক পান।

তিনি উত্তরপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর (১৯৩৮-৩৯), ডেপুটি ডিরেক্টর (১৯৩৯-৪৪), ডিরেক্টর (১৯৪৪), ডেপুটি ডিরেক্টর (১৯৪৪-৪৬) হিসাবেও কাজ করেছেন। উত্তরপ্রদেশের শিক্ষাবিভাগ থেকে অবসর গ্রহণ করে আবার তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও লণ্ডন প্যারিস এডিনবার্গ কেম্ব্রিজ আপসালা জুরিক ও অয়াজেনিনজেন (হলাণ্ড) প্রভৃতি ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহুত হয়ে রসায়ন ও কৃষি বিষয়ক তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে উক্ত বশ্বিবিদ্যালয়সমূহে বহু বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। ১৯২৬ ১৯৩১ ১৯৩৭ ও ১৯৫১ পঁচিশ বছর ধরে তিনি এই বক্তৃতাগুলি দিয়েছেন। এই কাজের আর শেষ নেই যেন, তাই তিনি আবার চলেছেন ইউরোপ অভিমুখে। বঙ্গের বাহিরে বাঙালি তিনি। মোট সাত বার তাঁকে ইউরোপ যেতে হয়েছে।

বিজ্ঞানের প্রতি প্রবণতার হেতু সম্পর্কে ডক্টর ধর বলেন, বাল্যকালে তিনি গবেষণামূলক জিনিসই পড়তে ভালোবাসতেন। রিপন কলেজে পড়বার সময়েই তিনি বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বললেন, "বৈজ্ঞানিকের চাই বুদ্ধি সততা পরিশ্রম ও কর্মশক্তি। ছাত্রজীবনের এই গুণাবলীর অধিকারী হবার জন্যে চেষ্টা করেছি। আর কিছু না।"

একটু থেমে আমায় বললেন, "বিজ্ঞানের সেবা, মানুষের উপকার করা ও সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করাই বৈজ্ঞানিকের ধর্ম।"

বাস্তবিকই নীলরতন বিজ্ঞানের প্রচার করেছেন খুবই। তাঁর ডি. ফিল. ও ডি. এস্-সি. উপাধিধারী বহু গবেষকছাত্র আছেন। তাঁরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সরকারী কার্যে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

নীলরতন তাঁর অর্জিত বহু অর্থ শিক্ষা ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে দান করে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

শীলাচর রিসার্চ ইনস্টিটিউটে রিসার্চ ফেলোশিপ সৃষ্টির জন্য প্রতি মাসে তাঁর মাহিনার সকল টাকা ও ফণ্ডের টাকা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেছেন। দানের অঙ্ক সাত বৎসর পরে এক লক্ষ টাকার উপর উঠবে। শীলাধর গবেষণাগারটি তাঁরই অর্থে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এই সমগ্র প্রতিষ্ঠানটিই তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে তিনি দান করেছেন। যথা— ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— সার্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়-অধ্যাপক পদের জন্য, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়ান্স, যশোহরে মাইকেল মধুস্থদন দত্ত কলেজ। এইসব প্রতিষ্ঠানে তাঁর মোট দানের পরিমাণ সামান্য নয়।

এই বদান্যতা ছাড়াও আত্মীয়স্বজনদের শিক্ষা ও প্রতিষ্ঠার জন্যও অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন তিনি। সে এক দীর্ঘ তালিকা।

ফটো-রসায়ন কলয়েড-রসায়ন ও কৃষি-রসায়ন শাস্ত্রে নীলরতনকে একজন অথরিটি বলে গণ্য করা হয়।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মজীবনীতে ও সার্ শান্তিস্বরূপ ভাটনগর ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতিরূপে তাঁর ভাষণে বলেছেন যে, ডক্টর নীলরতন ধরই ভারতবর্ষে ফিসিকো-কেমিক্যাল গবেষণার প্রবর্তক। তিনি ভারতবর্ষের অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ও বিশিষ্ঠ রাসায়নিকগণের অনেক পূর্বেই ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি ও ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের রসায়নশাখার সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে ১৯৩২-৩৪ ও ১৯২২ সালে।

খাদ্য কৃষি ও নাইট্রোজেন সম্পর্কে নীলরতন অনেক গবেষণা করেছেন। রসায়নশাস্ত্রে নোবেল প্রাইজ দেবার জন্য যে আন্তর্জাতিক দক্ষ কমিটি

আছে, নাইট্রোজেন সম্পর্কে তাঁর আবিষ্কারগুলির প্রতি তার কতিপয় সদস্যের দৃষ্টি নাকি আকৃষ্ট হয়েছে। ১৯৩৮ ও ১৯৪৮ সালে ডক্টর ধরও উক্ত কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৮ সালে রোমে যে আন্তর্জাতিক সার-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নীলরতন তার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। ১৯৩৭ থেকে তিনি বাঙ্গালোরের সায়ান্স ইনসটিটিউটের গবর্নিং কাউন্সিলের সদস্য।

ভারতবাসীর খাদ্যের মান অত্যন্ত নিম্ন, এই সম্পর্কে নীলরতনের অভিমত হচ্ছে, "প্রায় দ্বিশতাধিক বৎসরব্যাপী পরাধীনতার নাগপাশে পিষ্ট জর্জরিত ভারতবাসী আজ আবার স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু কষ্টার্জিত এই স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করতে হলে চাই শক্তি, পূর্ণ স্বাস্থ্য, অদম্য বীর্য। এর জন্য সর্বাধিক প্রয়োজন আপামর দেশবাসীর জন্য সুলভে উত্তম ও পুষ্টিকর খাদ্য ও আহার্যের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত ফরাসী চিন্তানায়ক এ ব্রিঁলা সাঁভেরা র (১৭৫৫-১৮২৬) উক্তি স্মরণ ক'রে আমরাও বলিতে পারি—Tell me what you eat I will tell you what you are. The destiny of a people depends on its diet।"

আহার্যে কেবলমাত্র চাল ব্যবহার সম্পর্কে নীলরতন বলেন, "চালে আবশ্যকীয় অ্যামিনো থাকার দরুন চাল খেলে বুদ্ধিবৃত্তি হয়তো বাড়তে পারে তবে দেহের পুষ্টি ও শক্তির জন্য গম খাওয়া প্রয়োজন এবং সেইজন্য অর্ধেক গম খাওয়া প্রকৃষ্ট। ভারতবর্ষে কাশ্মীরীরা (নেহরু, সাপ্রু, কুঞ্জরু, কাটজুরা সব কাশ্মীরী পণ্ডিত) সাধারণত অর্ধেক চাল ও অর্ধেক গম খেয়ে থাকেন। সেই রকম গান্ধীজীর দেশবাসীরা, অর্থাৎ গুজরাটীরা, অথবা তিলকের দেশবাসীরা, অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয়রা, অর্ধেক গম এবং অর্ধেক চাল আহার করে থাকেন। হয়তো এই কারণেই বর্তমানে ভারতবর্ষে এঁরা কর্মজীবনে শীর্ষস্থান অধিকার করে আছেন। বাংলা আসাম উড়িষ্যা অন্ধ্র তামিলনাদ মালয়ালম প্রভৃতি প্রদেশের অধিবাসীরা কেবমাত্র চাল খেয়ে থাকেন। গম ব্যবহারে এঁরা অনিচ্ছুক। যখন দেশে লোকসংখ্যা

কম ছিল, খাদ্যদ্রব্য প্রচুর পাওয়া যেত এবং দেশ শস্যশ্যামলা ছিল, তখন বাংলা ও আসামে মাছ ও দুধের প্রাচুর্য ছিল। তখন গম থেকে প্রোটিন ও খাদ্যপ্রাণ না গ্রহণ করেও মাছ দুধ তরকারি থেকেই এইসব আবশ্যকীয় পদার্থ পাওয়া যেত। অন্ধ্র তামিলনাদ ও মালয়ালমের অব্রাহ্মণরা সমুদ্রজাত মাছ খেতেন এবং এখনও খেয়ে থাকেন। অন্ধ্র ও তামিলনাদের ব্রাহ্মণরা ঘি দুধ দৈ এবং ডাল প্রচুর পরিমাণে খেতেন এবং সেইজন্য চাল খেলেও তাঁদের স্বাস্থ্যহানি হত না। আজকাল সকল খাদ্যদ্রব্যের দাম বেড়েছে প্রায় চারগুণ, অনেক সময় দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় দুধ দৈ ঘি ছানা ইত্যাদি খাওয়াই অনেকের পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য এখন খাদ্যসমস্যাটি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। এবং আমূল খাদ্যসংস্কারে যত্নবান হতে হবে। মুখরোচক বা পুরুষানুক্রমে এতদিন যা খাওয়া হয়েছে তা খেলেই চলবে না। বাঙালি আসামী ও অন্যান্য যাঁরা এতদিন ভাত খেয়েই বেঁচেছেন, তাঁদের গুজরাটী ও মারাঠী কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মত অর্ধেক চাল ও অর্ধেক গম খেতে হবে।”

খাদ্য কৃষি ও নাইট্রোজেন— এই বিষয়গুলি নিয়েই তাঁর গবেষণা। তাঁর কৃষি ও নাইট্রোজেন সংক্রান্ত আবিষ্কারগুলি বিদেশে খুব সমাদৃত হয়েছে। পঁচিশ বছর ধরে এই গবেষণায় তিনি রত। তাঁর মতে ট্র্যাক্টর দ্বারা কর্ষণের ফলে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়। ইউরোপে এইজন্যে এখন ট্র্যাক্টরের ব্যবহার কমে যাচ্ছে।

১৯৩৭ সালে নীলরতন আন্তর্জাতিক কৃষি-কংগ্রেসের সদস্য নির্বাচিত হন।

পাটনা কলকাতা আগ্রা নাগপুর লখনউ আলিগড় মহীশূর মাদ্রাজ বোম্বাই হায়দরাবাদ লাহোর কাশী ত্রিবাঙ্কুর ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি বিশেষ লেকচারার-রূপে বক্তৃতা দিয়েছেন।

তাঁর জীবন কেবল জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে জড়িত নয়; তাই তিনি নিজেকে কেবল গবেষণাগারের কৃত্রিম আলোর মধ্যেই আবদ্ধ রাখেন নি। তাঁর জীবন মাটি দিয়ে ও মানুষ দিয়ে মাখা। তাই মাটির প্রতি তাঁর টান এবং মানুষের প্রতি তাঁর আকর্ষণ, মানুষের দুঃখে তাই তিনি দুঃখিত। এইজন্যই

তিনি অকৃপণ হাতে তাঁর অর্জিত অর্থ দান করতে পেরেছেন। এবং এইজন্যই বৈজ্ঞানিক নীলরতনকে আখ্যা দেওয়া যায় মাটির মানুষ বলে।

রচিত গ্রন্থাবলী

আমাদের খাদ্য

Chemical Action of Light

New Conception of Biochemistry

Influence of Light on Biochemical Processes

নীরবে মহাযজ্ঞ চলেছে। জ্ঞানের যেমন শেষ নেই, বিজ্ঞানের আকাঙ্ক্ষারও তেমনি শেষ নেই। পৃথিবীর মাটি পরিত্যাগ ক'রে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণকে উপেক্ষা করে বিজ্ঞান এখন গ্রহান্তরে যাবার জন্যে হাত বাড়িয়েছে। চাঁদকে ধরে এনে দেবার কথাটা এর আগে ছিল অলীক কল্পনা মাত্র; কল্পনার হাত থেকে সে-কথাটা এখন কেড়ে নিয়েছে বিজ্ঞান। সে বলছে, 'চাঁদকে ধরে এনে কাজ কি, এবার চল, দল বেঁধে চাঁদের দেশে যাই।' আমাদের মত বামনদের আর উদ্বাহু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্ বলে সংকোচে সংকুচিতও আর হতে হবে না। আমরা ছিলাম লিলিপুট, এবার হব বোধ হয় ব্রবডিংন্যাগ। কল্পনা আর কল্পনার রাজ্যেই বাঁধা থাকবে না, বিজ্ঞান তাকে টেনে নেবে নিজের জিম্মায়। হাত বাড়িয়ে চাঁদ ধরব আমরা। বিজ্ঞানের ইচ্ছেটা এই রকমই লম্বা।

কলকাতার বিজ্ঞান-কলেজের সুবৃহৎ দালানের নিভৃত গবেষণা-কক্ষে বসে সাধকেরা এইসবেরই ষড়যন্ত্র করছেন।

৭ই জানুয়ারি ১৯৫৩, ২৩এ পৌষ ১৩৫৯। দুপুর। ধীরে ধীরে বিজ্ঞান-কলেজের ভিতরে প্রবেশ করলাম। এত বড় বাড়ি, এরই অভ্যন্তরে কত রকমের গবেষণা চলেছে। কিন্তু এতটুকু সাড়া নেই, এতটুকু শব্দ পর্যন্ত নেই। সাধনার ধারাই বুঝি এমনি, এমনি শব্দহীন স্তব্ধতা।

আগে বিজ্ঞান আমাদের বলেছে যে, অণুই ক্ষুদ্রতম; তার পর শুনলাম তার চেয়েও ক্ষুদ্র পরমাণুর নাম। আবার জানা গেছে, এই পরমাণুকেও নাকি ভাঙা যায়, ভেঙে ভেঙে হয় ইলেকট্রন প্রোটন ইত্যাদি। বিজ্ঞান গবেষণা করে চলেছে; আজ বিজ্ঞান বলেছে পরমাণুর অভ্যন্তরে আছে একটি শাঁস, সেই শাঁসের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অণুর ক্ষুদে ক্ষুদে ভগ্নাংশরা। সূর্যের চারদিকে যেমন গ্রহ-নক্ষত্র পাক খাচ্ছে, অনেকটা

সেইভাবে। পদার্থবিজ্ঞানের এটা নূতন উদ্ভাবনা। এরজন্যে বিজ্ঞান-কলেজে নতুন গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— নিউক্লিয়ার ফিজিক্স।

এই গবেষণাগারের পরিচালক হচ্ছেন ডক্টর মেঘনাদ সাহা। দোতলার ঘরে ছাত্র-পরিবেষ্টিত হয়ে ছিলেন। টেবিলে স্তূপাকার বই। আমার সঙ্গে দেখা হবার সময় নির্দিষ্ট ছিল। তাই তিনি এবার আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে তৈরি হলেন। পৃথিবী-জোড়া এঁর নাম, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে এঁর জন্যে সম্মানের আসন নির্ধারিত হয়ে আছে, আইনস্টাইনের ন্যায় বৈজ্ঞানিক বলেছেন, Dr. M. N. Saha has won an honoured name in the whole scientific world।

কিন্তু এত সহজ ও সাধারণ মানুষ ব'লে এঁকে ঠেকল যে, মনে হল নিজের জ্ঞান ও গরিমা সম্বন্ধে ইনি যেন পরম উদাসীন।

পূর্ববাংলায় বাড়ি। দেশের ভাষা এখনো তাঁর জিভের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অন্তরঙ্গ ভাবে তিনি তার স্বদেশীর ভাষায় নিজের জীবনকথা বলতে লাগলেন।

খ্রীস্টীয় ১৮৯৩ (বঙ্গাব্দ ১৩০০) ঢাকা জেলার সেওড়াতলী গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগন্নাথ সাহা গ্রামে সামান্য ব্যবসা করতেন। মাতার নাম ভুবনেশ্বরী। বিরাট একটি সংসার-পালনের ভার ছিল তাঁর পিতার উপর, কিন্তু তাঁর আয় ছিল সামান্য। এই কারণে অনটনের মধ্যে মানুষ হতে হয়েছে মেঘনাদকে। শৈশবে লেখা-পড়া শিক্ষা করতে হয়েছে তাই খুবই অসুবিধের মধ্যে।

তাঁদের গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনো স্কুল ছিল না। সেইজন্যে গ্রাম থেকে মাইল সাতেক দূরের শিমুলিয়া গ্রামের মধ্য-ইংরেজি স্কুলে তাঁকে পাঠ করতে হয়। কিন্তু পিতার সংসারের অবস্থা এমন নয় যে, অন্য কোথাও ছেলেকে খরচ দিয়ে রেখে পড়াতে পারেন। শিমুলিয়ায় গিয়ে মেঘনাদ এইটি আশ্রয় পেলেন। ডাক্তার অনন্তকুমার দাস তাঁর বাড়িতে মেঘনাদকে বিনা-খরচে থাকার ও খাওয়ার সুযোগ দিলেন। এখান থেকে পড়াশুনা ক'রে মধ্য-ইংরেজি পরীক্ষায় মেঘনাদ ঢাকা-বিভাগের মধ্যে প্রথম-স্থান অধিকার করলেন।

এর পর, ১৯০৫ সালে, ঢাকায় এসে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হলেন।

পর বৎসর স্বদেশী আন্দোলন শুরু হল। মেঘনাদ তখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। প্রতিবাদ-সভায় যোগদানের অভিযোগে কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের পাইকারি হারে স্কুল থেকে বিতাড়িত করা আরম্ভ হল। তিনি গিয়ে ভর্তি হলেন ঢাকার জুবিলি স্কুলে। এখানে বিনা মাইনের পড়ার সুযোগ পেয়ে এবং তার সঙ্গে বৃত্তি লাভ করে তাঁর পড়াশুনা করার অনেকটা সুবিধে হল। এইসব সুবিধে না পেলে লেখাপড়ায় আরো বাধা হত, কেননা, তাঁর পিতা তাঁকে কোনো খরচই দিতে পারতেন না। এই সময় তিনি ব্যাপটিস্ট মিশনের বাইবেল-ক্লাসেও যোগ দেন। তিনি তখন স্কুলের ছাত্র, মিশনের পরীক্ষায় বি. এ. ক্লাসের ছাত্রদেরও হারিয়ে দিয়ে তিনি বাংলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এতে তিনি নগদ এক শত টাকা পুরস্কার পেলেন, এই টাকা পেয়ে তাঁর অনেক সুবিধে হয়েছিল। ১৯০৯ সালে তিনি এনট্রান্স পাস করেন —পূর্ববাংলার ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়ে। ইংরেজি বাংলা ও সংস্কৃত এবং অঙ্কে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্রদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন।

বললেন, "আমার স্কুলের শিক্ষকদের মধ্যে অধ্যাক প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত —পরে ইনি কলকাতায় বেথুন কলেজে যোগ দেন, সতীশচন্দ্র মুখার্জি, সংস্কৃতের মহাপণ্ডিত রজনীকান্ত আমিন ও অধ্যক্ষ মথুরামোহন চক্রবর্তীর নামই আজ বেশি করে মনে পড়ছে।"

স্কুল থেকে বেরিয়ে ঢাকা কলেজে তিনি আই.এস-সি. পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন বটে, কিন্তু ফোর্থ সাবজেক্টের নম্বর বাদ দিলে তিনিই পান প্রথম স্থান। তিনি অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে জার্মান ভাষা নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে এ ভাষা শেখাবেন এমন কাউকে তিনি পান না; শেষের দিকে অবশ্য অধ্যাপক ডক্টর নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁকে কিছুদিন পড়ান। এই কারণে তিনি জার্মানে খুব কম নম্বর পান এবং এরই ফলে আই. এস-সি.তে অন্যান্য বিষয় মিলিয়ে প্রথম হলেও তাঁকে তৃতীয় স্থান পেতে হয়; বললেন, "ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ডবলিউ. জে. আর্চবোল্ড আমাদের ইংরেজি পড়াতেন, ডক্টর ওয়াটসন পড়াতেন কেমিস্ট্রি।"

এর পর মেঘনাদ এলেন কলকাতায়। এখান থেকে ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স-সহ প্রথমশ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে তিনি বি. এস্-সি. পাস করেন। এখানে যাঁরা তাঁর অধ্যাপক ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সার্ জগদীশচন্দ্র বসু।

১৯১৫ সালে ফলিত-গণিতে প্রথমশ্রেণীতে তিনি দ্বিতীয় হয়ে এম. এস্‌সি. পাস করেন।

"আমার অন্তরঙ্গদের মধ্যে প্রথমেই ডক্টর নীলরতন ধরের নাম মনে পড়ছে— ইনি আমার চেয়ে দু বছরের সিনিয়র ছিলেন। আর, আমার সহপাঠীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জে, এন. মুখার্জি ও নিখিলরঞ্জন সেন।"

তাঁদের এই ব্যাচই প্রখ্যাত স্কলার হিসাবে গণ্য হয়েছেন। এঁদের মধ্যে চারজনই বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতির পদ অলংকৃত করেছেন— মেঘনাদ সাহা (১৯৩৫), জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ (১৯৩৭), সতেন্দ্রনাথ বসু (১৯৪৪) জে. এন. মুখার্জি (১৯৫১)।

তাঁর ছাত্রজীবনের কথা সাঙ্গ করে সেই প্রসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করলেন বাঘা যতীনের কথা। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবন শেষ হল, এই সময়ে তিনি সংকট ও অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেন। বিপ্লবী যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও পুলিনবিহারী দাসের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল এই কথা পুলিশের কানে যায়, এই জন্যে তিনি ফাইনান্স পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পান না।

বললেন, "আমরা ১১০ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের একটা মেসে তখন থাকি। বাঘা যতীন প্রায়ই সেখানে আসতেন। তাঁর পরনে সব সময় থাকত সাহেবী পোশাক। তিনি আমাকে সব সময় বলতেন বিজ্ঞান নিয়ে লেগে থাকতে, বিপ্লব-আন্দোলনে যোগ না দিতে। একদিনের কথা আজ মনে পড়ে। বাঘা যতীন আমাদের মেস থেকে খাওয়া-দাওয়া সেরে তাঁর আহেরীটোলার আড্ডায় রওনা হয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে পড়ার জন্যে সঙ্গে নিয়ে গেলেন একটা বই। একজন পুলিশ-অফিসার (তাঁর নাম কি-যেন হালদার) বাঘা যতীনকে অনুসরণ করেন যতীন তা টের পান। আহেরীটোলায় গিয়ে

যতীন তাঁকে গুলি করে গা-ঢাকা দেন। পুলিশ-অফিসার মারা যান না, তিনি যতীনের নাম বলে দেন। বাঘা যতীন পলাতক হয়ে উড়িষ্যায় যান। এদিকে আমরা পড়ি সংকটে। যে বইটা তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন, তাতে নাম লেখা ছিল— জ্ঞান ঘোষ। কে এই জ্ঞান ঘোষ, পুলিশ তা হদিশ করতে পারে না; কিন্তু এ-খবর শুনে আমরা ভয়ে-ভয়ে দিন কাটাই। শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ঘোষ যে কে, পুলিশ তা বুঝতে পারে নি, তা না হলে আমাদেরও রেহাই ছিল না।"

একটু থেমে বললেন, "লোকে শের শার নাম করে, যতীন ভোজালি নিয়ে বাঘ মারতেন। তাঁর মামা ডক্টর হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সুরেশ সর্বাধিকারীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কুষ্টিয়ায় এই মামার কাছে যতীন একবার গিয়েছিলেন। সেখানে এক বাঘের সঙ্গে যতীনের সাংঘাতিক লড়াই হয়। বাঘের মস্ত থাবার দাগ ছিল যতীনের উরুতে। সেই থেকেই তার নাম হল বাঘা— বাঘা যতীন।"

এঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল ব'লে ফাইনান্স পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি পেলেন না মেঘনাদ। এতে জীবনে দেখা দিল সংশয় ও অনিশ্চয়তা। এমন সময়ে আহ্বান এল সার্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে।

যে-বিজ্ঞান-কলেজের নিউক্লিয়ার ফিজিক্স গবেষণাগারের তিনি পরিচালক হয়েছেন, সেই বিজ্ঞান-কলেজেই তাঁর অধ্যাপনা-জীবনের হাতে-খড়ি। এম. এস্‌সি. পাস করার পর বছর-তিন কেটে গিয়েছে, ছাত্রজীবনের পর কর্মজীবনে প্রবেশের তিনি পথ খুঁজছেন, এমন সময় সার্ আশুতোষ নবগঠিত বিজ্ঞান-কলেজের পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগে তাঁকে লেকচারার হবার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন। এ হল ১৯১৮ সালের ঘটনা। এখানে এসে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি গবেষণাকার্যে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। পর বছরই তিনি ডি. এস্‌সি. ডিগ্রি লাভ করলেন এবং তার পর-বৎসর প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পেলেন। এই দুই সম্মান তিনি পান রিলেটিভিটি, প্রেশর অব লাইট (বা আলোর ভর) ও অ্যাস্ট্রোফিজিক্স সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার জন্যে। ১৯২০ সালেই তাঁর বিখ্যাত গবেষণা লোকচক্ষুগোচর হয় এবং তাঁর নাম

ছড়িয়ে পড়ে সারা পৃথিবীতে। তাঁর এই গবেষণা 'থিয়োরি অব থারমাল আয়োনাইজেশন' ব'লে খ্যাত হয়েছে; তাপের প্রভাবেও কী-ভাবে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন অণু গঠিত হয় তাঁর এই গবেষণা সেই পদ্ধতি উদ্‌ঘাটন করে। তিনি বিজ্ঞান-জগৎকে স্তম্ভিত করে দেন, তিনি দেখান, তাঁর নবাবিষ্কৃত পদ্ধতি প্রয়োগের দ্বারা তিনি সূর্যের ও নক্ষত্রসমূহের স্বাভাবিক গঠন সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করতে সমর্থ। তাঁর এই আবিষ্কার বিজ্ঞানজগতে তাঁকে সম্মানের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্ব-আবিষ্কার যেমন বিজ্ঞানের একটি মূলসূত্র, মেঘনাদের এই আবিষ্কার তেমনি বিজ্ঞানের একটি মূলসূত্র বলে গণ্য হয়েছে। তাঁর এই আবিষ্কারটি এমনি গুরুত্বপূর্ণ যে, সাড়ে তিন শ বছর আগে, ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে, গ্যালেলিয়োর দূরবীন-আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর এই আবিষ্কারটি পৃথিবীর বড়-বড় দশটি আবিষ্কারের মধ্যে স্থান পেয়েছে।

তাঁর ঐ আবিষ্কারটি কেবল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই নয়, এটি তাঁর জীবন-আবিষ্কারেরই তুল্য হল। জীবনের সংশয় ও অনিশ্চয়তা এবার দূরীভূত হল। এবার তিনি যেন দেখতে পেলেন তাঁর জীবনের নূতন দিগন্ত। সেই বছরই, ১৯২০ সালে, তিনি গেলেন বিলেতে। সেখানে গিয়ে লণ্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়ান্স অ্যাণ্ড টেকনলজিতে প্রফেসর এ. ফাউলারের ল্যাবরেটরিতে প্রায় দেড় বছর, তার পর বার্লিনে প্রফেসর নার্নস্ট-এর ল্যারেটরিতে কিছুদিন গবেষণা করেন। যে-পদ্ধতি তিনি কাগজে-কলমে আবিষ্কার করেছেন, ব্যবহারিক পরীক্ষা দ্বারা সে সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হবার জন্যেই এই ল্যাবরেটরিতে তিনি কাজ করেন।

ভারতবর্ষে ফিরে এসে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হন, কিন্তু কিছুদিন বাদেই, ১৯২৩ সালে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর কাছে আহ্বান আসে। এর পর এক টানা পনর বছর তিনি এলাহাবাদেই অতিবাহিত করেন। এলাহাবাদই হয়ে ওঠে তাঁর দেশ এবং তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র।

যখন তিনি পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের যুবক, সেই সময়ই, ১৯২৭ সালে,

বিজ্ঞানে তাঁর দানের পুরস্কারস্বরূপ তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও বিভিন্ন স্থান থেকে তিনি সম্মানিত পদ লাভ করেন— ফ্রেঞ্চ অ্যাস্ট্রনমিকাল সোসাইটি, বস্টন অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস্ তাঁকে অনারারি ফেলো রূপে নির্বাচন করেন এবং ইণ্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রনমিকাল ইউনিয়ন তাঁকে সদস্যপদে বরণ করেন। ১৯২৭ সালেই তিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে ইতালীয় গভর্নমেণ্ট কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। অ্যালেসান্দ্রা ভোল্টা— বৈদ্যুতিক আবিষ্কারে যাঁর নাম অক্ষয় হয়ে আছে, যাঁর নাম থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি বোঝাতে ভোল্টেজ কথা চালু হয়েছে—মেঘনাদ ইতালীয় সরকারের আমন্ত্রণে কোমোতে গিয়ে তাঁর শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদান করেন ভারতের প্রতিনিধি-রূপে। এই উৎসবের বিস্তারিত বিবরণ তিনি সে সময়ের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় লিখেছেন।

১৯৪৪ সালে ভারত-সরকার ছয় জন বৈজ্ঞানিক দ্বারা গঠিত একটি শুভেচ্ছা-মিশন ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরণ করেন—মেঘনাদ সেই বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একজন ছিলেন। এই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি একটি বিবরণ লেখার জন্যে অনুরুদ্ধ হয়ে একটি রিপোর্ট রচনা করেন, সে রিপোর্ট ভারত-সরকারের পুঁথিশালায় জমা আছে। তিনি সোভিয়েট সরকার কর্তৃকও ১৯৪৫ সালে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এবং ১৯৪৭ সালে নিউটনের ত্রিশতবার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হন।

এলাহাবাদে তিনি স্কুল অব ফিজিক্স নাম দিয়ে পদার্থবিদ্যা শিক্ষাদানের ও গবেষণার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে শিক্ষার মান এত উচ্চ ছিল এবং গবেষণার রীতি এত উন্নত ধরনের ছিল যে, ভারতের বিভিন্ন স্থান— রাজস্থান পাঞ্জাব মহীশূর ইত্যাদি— থেকে দলে দলে ছাত্র এসে এখানে ভর্তি হত। এখানকার অনেক ছাত্র এখন ভারতের বিভিন্ন জায়গায় গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করতে সমর্থ হয়েছেন।

বললেন, "এখান থেকে যাঁরা বেরিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ক-জনের নাম হচ্ছে ডক্টর ডি. এস. কোঠারি, ডক্টর পি. কে. কিচলু, ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার,

ডক্টর জি. আর. তোশনিওয়াল, ডক্টর ডবলিউ. এম. বৈদ্য, ডক্টর বি. এন. শ্রীবাস্তব ; এঁরা সকলেই আজ বিশেষ সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত আছেন।"

এলাহাবাদে দীর্ঘকাল তিনি অতিবাহিত করেন। সার্ তেজবাহাদুর সপ্রু, আচার্য নরেন্দ্র দেও, বিচারপতি সুলেমান, ইকবাল নারায়ণ, ডক্টর তারাচাঁদ —ইত্যাদি স্বনামধন্য ব্যক্তিদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসার সুযোগ তাঁর ঘটেছে, এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর বিশেষ বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধ তাঁর বাল্যকাল থেকে। ভারতে বিজ্ঞানের প্রয়োগের দ্বারা কিভাবে সামাজিক উন্নতি সাধিত হতে পারে সেই চিন্তা তিনি করে আসছেন অনেকদিন থেকে। ১৯৩৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সভাপতি হন, সে সময় তাঁর অভিভাষণে এ বিষয়ে সর্বপ্রথম তাঁর অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর এই অভিভাষণে সুফল ফলে। ভারতে ন্যাশনাল ইনস্‌টিটিউট অব সায়ান্স গঠিত হয়। এই ইনস্‌টিটিউট বর্তমানে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির অনুরূপ একটি বৈজ্ঞানিক সভায় পরিণত হয়েছে। তিনি এই ইনস্‌টিটিউটের কর্মতালিকা এবং গঠনতন্ত্র প্রণেতাদের মধ্যে একজন এবং ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত এর প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। ১৯৩৫ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে তিনি এই সায়ান্স ইনস্‌টিটিউটের একটি সভায় নিমন্ত্রণ করেন। "সেদিনই তাঁর সঙ্গে আমি প্রথম মিলিত হই। সে সময়ে আমি তাঁকে ভারতে শিল্প-প্রসারের ও জাতীয় পরিকাল্পনার বিষয় বলি।"

এই বছর তিনি বিজ্ঞান-কলেজের বন্ধুর সহযোগিতায় 'সায়ান্স অ্যাণ্ড কালচার' নামে একটি বৈজ্ঞানিক মাসিক পত্রিকা বের করেন। আধুনিক সমাজের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানকে কিভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে জনসাধারণের কাছে সেই কথা সহজ ও সরল ভাষায় বলাই এই পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্যে। ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী এককালীন এক হাজার টাকা এই পত্রিকা প্রকাশের জন্যে দান করেন। বললেন,"এতে আমি ও আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা ভারতের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধানের উপায়ের প্রস্তাব রূপে অনেক প্রবন্ধ লিখেছি। তার মধ্যে অনেক বিষয় ছিল, যেমন দামোদর-

উপত্যকার সংস্কার, উড়িষ্যার উন্নয়ন, খাদ্য ও দুর্ভিক্ষ, ভারতের জাতীয় গবেষণা সমিতি, নদী-উপত্যকা উন্নয়ন ইত্যাদি। এইসব প্রবন্ধের দিকে অনেকেরই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এবং তার ফলও ভালোই হয়। বর্তমানে ভারতে অনেক উন্নয়ন-পরিকল্পনায় হাত দেওয়া হয়েছে।"

১৯৩৯ সালে এলাহাবাদ থেকে তিনি কলকাতায় ফিরে আসেন। এবং কলকাতায় বিজ্ঞান-কলেজে তিনি পদার্থবিদ্যার পালিত অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। এখানে এসে তিনি তাঁর স্বাভাবিক উদ্যম ও উৎসাহে কাজ আরম্ভ করেন। ভারতে আণবিক গবেষণার উদ্যোগের মূলে অধ্যাপক সাহা। তাঁরই উৎসাহে এখানে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নূতন গবেষণাগারে তরুণ গবেষকগণ তাঁর তত্ত্বাবধানে কাজ করে চলেছেন।

বিজ্ঞানের সর্বদিকে তিনি সমান উৎসাহী। কি করলে ভারতে বিজ্ঞান-চর্চার সুবিধে হতে পারে, তার জন্যে তিনি সব সময় সচেষ্ট ; এবং সর্বদিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি আছেই। বিজ্ঞান-কলেজে বিভিন্ন বিভাগের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য তিনি সর্বদা যত্নবান।

তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য। এখানে সদস্য হিসাবে তিনি শিক্ষকদের ও বিশ্ববিদ্যালয়-কর্মীদের সুখসুবিধা-বিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে থাকেন। বিজ্ঞানের সাধনা নিয়ে আছেন, কিন্তু মানুষের কাছ থেকে নিজেকে আড়ালে সরিয়ে যে রাখেন নি, তাঁর কর্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে এইটেই প্রমাণিত হয় সুস্পষ্টভাবে।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণানের নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে যে বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশন নিযুক্ত হয়, মেঘনাদ ছিলেন সেই কমিশনের অন্যতম সদস্য। এর ফলে তাঁর জীবনে একটি অপূর্ব সুযোগ দেখা দেয়। তিনি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা চাক্ষুষ দেখে আসবার সুযোগ পান।

১৯২৭ সাল থেকে মেঘনাদ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়ান্সের আজীবন সদস্য। ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি এই অ্যাসোসিয়েশন পুনর্গঠনের জন্যে মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের নিকট থেকে এর প্রসারের জন্যে অর্থ বরাদ্দের ব্যবস্থা করেন। এখন এই

অ্যাসোসিয়েশন যাদবপুরে নিজের জন্যে বিরাট গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করে কাজ করে চলেছে।

বলছিলাম, বিজ্ঞানের সাধনা নিয়েই তিনি আত্মমগ্ন, তবু মানুষের কথা তিনি ভুলে থাকেন না। এর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে তাঁর ছাত্রজীবনেও। ১৯১৪ সালে যখন দামোদরের প্রবল বন্যা হয়, মেঘনাদ তখন এম. এস্‌সি-র ছাত্র। তখন তিনি আর্তত্রাণের জন্যে কৃষ্ণকুমার মিত্রের দ্বারা গঠিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীতে যোগ দেন। ১৯২৩ সালে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র যখন বেঙ্গল রিলিফ কমিটি গঠন করেন, ডক্টর মেঘনাদ তখন ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্রের অন্যতম সহযোগী। ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের প্রাথমিক সাহায্যদানের জন্যে ইস্টবেঙ্গল রিলিফ কমিটি নাম দিয়ে তিনি একটি সঙ্ঘ গঠন করেন।

কিন্তু মানুষের জীবন বড় অনিশ্চিত। দৃঢ় ও নিশ্চিত পদক্ষেপে যে-জীবন ক্রমশ এগিয়ে চলে দুরূহ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করতে করতে, হঠাৎ কখন্ স্তব্ধ হয়ে যায় সেই পদপাত।

বিনামেঘে বজ্রপাতের মতই মৃত্যু ঘটেছে মেঘনাদের।

ভারতের লোকসভার তিনি সদস্য হয়েছিলেন, এবং ভারতের পরিকল্পনা-কমিশনের মেম্বর।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬, ৩রা ফাল্গুন ১৩৬২ বঙ্গাব্দ— দিল্লীতে তিনি আকস্মিক-ভাবে পরলোকগমন করেন। তাঁর এ মৃত্যুকে বলা যায় মর্মান্তিক মৃত্যু।

সেদিন প্রাতে দিল্লীর রাষ্ট্রপতি-ভবনে পরিকল্পনা-কমিশনের বৈঠক। এই বৈঠকে যোগদান করার জন্যে তিনি সকাল দশটার সময় ট্যাক্সি-যোগে রাষ্ট্রপতি-ভবনে যাচ্ছিলেন। ইরানের শাহের সেদিন দিল্লীতে আসার কথা; তাঁর সম্বর্ধনার জন্যে রাষ্ট্রপতি-ভবনের কাছে খুব ভিড় ছিল। এইজন্যে মেঘনাদ ট্যাক্সি থেকে নেমে পদব্রজে উক্ত ভবনের দিকে যাচ্ছিলেন। কয়েক পা এগিয়েই তিনি অজ্ঞান হয়ে রাস্তার উপরে পড়ে যান। কাছেই যাঁরা দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁরা তাঁকে ধরাধরি করে পাশের লনে নিয়ে যান। এঁদের মধ্যে একজন চিনতে পারেন মেঘনাদকে। তিনি তাঁকে ওয়েলিংটন হাঁসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বছর কয়েক আগে থেকে তিনি রক্তের চাপে ভুগছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থই ছিলেন।

সেই দিন দ্বিপ্রহরে তাঁর মৃতদেহ বিমান-যোগে কলকাতায় আনা হয়। এবং কেওড়াতলা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার জীবন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তিনি অতি দীন ও নগণ্য অবস্থা থেকে নিজের কর্মের ও মনীষার দ্বারা এই উচ্চাবস্থায় পৌঁছেছেন। গবেষণাগারের নিভৃতে ব'সে তিনি সাধনা করেছেন বটে, কিন্তু মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ ও দুর্দশা সম্বন্ধে তিনি এতটুকু উদাসীন নন।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, জ্বলন্ত সূর্য থেকে সামান্য একটি নগণ্য খণ্ড একদিন বিক্ষিপ্ত হয়ে পাক খেতে শুরু করে এবং ক্রমশ শীতল হতে হতে এই পৃথিবী গড়ে উঠেছে। মেঘনাদও তেমনি একটি অগ্নি-গোলকের মত তাঁর অসামান্য প্রতিভার তীব্র তেজ নিয়ে ছাত্রজীবন থেকে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কর্মজীবনে; তার পর নানাভাবে পাক খেতে খেতে অভিজ্ঞতার বাতাসে শীতল হয়ে এই মনীষীর রূপে দেখা দিয়েছেন। তিনি তাই বৈজ্ঞানিক মহলেই নয়, সর্বত্র বন্দনীয়।

আইনস্টাইন, লর্ড রাদারফোর্ড, অধ্যাপক রাসেল ইত্যাদি বিদেশী বৈজ্ঞানিকেরা মেঘনাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রীত ও উল্লসিত হয়ে তাঁর সম্বন্ধে অনেক উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি করেছেন। তখন মেঘনাদ বয়সে অতি তরুণ এবং পরাধীন ভারতের একজন নাগরিক। সেকালের সেই ভারতে বাস ক'রে বিদেশীর দৃষ্টি যে তিনি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন, এটা কেবল তাঁর নয়, সমগ্র ভারতের এবং ভারতবাসীর সৌভাগ্য।

১৯১৭ থেকে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে আরম্ভ করেন; ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত পঞ্চাশটির বেশি এ রকমের প্রবন্ধ তিনি প্রকাশ করেন। তার পর তিনি যেসব প্রবন্ধ লেখেন, তার সংখ্যাও সামান্য নয়। এ ছাড়া আছে অন্যান্য সতীর্থ ও সহকর্মীদের সহযোগে লিখিত নিবন্ধাদি। সে এক সুদীর্ঘ তালিকা।

তাঁর রচনাদি বেশির ভাগই বিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন পত্রে ও পত্রিকায় ছড়ানো

আছে, তাঁর ষষ্টিপূর্তি উপলক্ষে তাঁর ছাত্ররা সেইসব রচনার একটি সংকলন প্রকাশ করেছেন।

একটা পিন্ পড়লে শব্দ পাওয়া যায়, এমনি নিঃশব্দ ঘর। মাঝে-মাঝে টেলিফোনে ঘণ্টা বেজে উঠছে। শব্দহীন পদপাতে দু-একজন ছাত্র আসছেন, দু-একটি কথা সেরে চলে যাচ্ছেন। নিউক্লিয়ার ফিজিক্স— একটি কেন্দ্রীয় শাঁসকে ঘিরে রয়েছে অণুর গুচ্ছ; এখানেও তেমনি এই অধ্যাপককে ঘিরে আছে একটি ছাত্রগোষ্ঠী।

ধীরে ধীরে নেমে এলাম নীচে। নির্জন রাস্তা অতিক্রম ক'রে সদর সড়কে এসে পড়লাম। সারকুলার রোড। চমকে উঠলাম মটোরের হর্নে। সামনে তাকিয়েই দেখি, বিদ্যুৎ-গতিতে ছুটে চলে গেল একটা ক্ষুদে মটোর-গাড়ি। ঘণ্টা বেজে উঠল ট্রামের। হঠাৎ এক নীরবতার রাজ্য থেকে এসে পড়লাম কোলাহলের জগতে।

রচিত গ্রন্থাবলী

The Principle of Relativity.

Treatise on Heat.

Treatise on Modern Physics.

Junior Text Book of Heat with Meteorology.

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

আইনস্টাইনের নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যে নাম পৃথিবীময় ছড়ানো, বসু-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স-খ্যাত সেই বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথের মেজাজটা একেবারে বাঙালী মেজাজ। বৈঠক পেলে যেন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। ছোটকে ছোট, ক্ষুদ্রকে ক্ষুদ্র জ্ঞান নেই— এক বৈঠকে ব'সে প্রাণ খুলে কথা বলতে পারেন। সে কথায় বিজ্ঞানের জটিলতা নেই, জ্ঞানের গরিমা নেই, সে কথা অকপট বৈঠকী কথা। যেন বৈঠকের সকলেই তাঁর সমান জ্ঞানী, কিংবা তিনি যেন বৈঠকের আর-পাঁচজনের মতই সাধারণ একজন।

এইভাবেই কথা বলছিলেন বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ। দুধ-সাদা চুল মাথায়, চোখে পুরু কাঁচের চশমা, গায়ে জালি গেঞ্জি। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে কথা বলছেন। মাঝেমাঝে দু-একজন গবেষক-ছাত্র মোটা বই খুলে এসে পাশে দাঁড়াচ্ছেন, বইয়ে উঁকি দিয়ে তাঁদের কথার জবাব দিয়ে দিচ্ছেন ওরই মধ্যে।

বললেন, "জীবনবৃত্তান্ত জানতে চাও? আমার জীবন অতি সাধারণ জীবন। কিছুই নেই এ জীবনে। পাঁচজনে জেনে খুশি হবার মত কোনোই উপকরণ নেই।"

বললাম, "তবু। আপনার বাল্যকালের কথা।"

হেসে উঠলেন, বললেন, "বুঝেছি। তুমি চাও কবিতা।"

কবিতা চাইনি। কিন্তু জীবন কি সত্যিই কবিতা নয়? জীবনের যত দ্বন্দ্ব, সে তো জীবনেরই ছন্দ; জীবনের যত সাধনা সে তো কবিতা-আরাধনাই। কাটাকুটি-করা কাব্যের পাতা থেকে যেমন প্রকৃত কবিতাটিকে সন্তর্পণে তুলে নিতে হয়, জীবনের অনেক আঁকিবুঁকি-কাটা পাতা থেকেও তো তেমনি আসল জীবনটা আলাদা করেই নিতে হয়। ঝরঝরে ছাপা কাব্য পাঠ করতে হয়তো আরাম লাগে, কিন্তু কবির হাতের কাটাকুটি-করা পাতাটা দেখায় একটি বাড়তি খুশি আছে। সেই পাতাটা দেখার জন্যে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

বললেন, "এখন যেখানে হরিণঘাটা, আমার দেশ তারই লাগোয়া গ্রামে ছিল, কাঁচরাপাড়ার কাছাকাছি। কলকাতাতেও গোয়াবাগানে আমাদের বাড়ি ছিল একটা; আমার মামার বাড়িও ছিল কলকাতায়। এখন মামার সে বাড়ি নেই—তার উপর দিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ চলে গিয়েছে। আমি বাল্যকাল থেকে কলকাতারই বাসিন্দে, আমাকে তাই বলতে পার"— হেসে বললেন, "ক্যালকেশিয়ান।"

যখন বাল্যকালে কলকাতায় তাঁর জীবন কেটেছে, তখন কলকাতার চেহারা ছিল আলাদা। এত বড় বড় রাস্তাও ছিল না, রাস্তায় এমন পীচ ঢালাও ছিল না, এমন অদৃশ্য নালাও ছিল না। তখন রাস্তার গায়ে ছিল নর্দমা। কলকাতায় চলত ঘোড়ায় টানা ট্রাম।

গ্রামে দারুণ ম্যালেরিয়া, তার ভয়ে গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় থাকতে হল। কিন্তু নিজেদের গোয়াবাগানের বাড়িতে নয়, একটা ভাড়াবাড়িতে।

তাঁর ঠাকুরদা সরকারি চাকরি করতেন, চারদিকে সফর করে বেড়াতে হত তাঁকে। একবার এমনি সফরে গিয়ে হঠাৎ তিনি মারা যান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সব গোলমাল হয়ে গেল। সত্যেন্দ্রনাথের পিতার উপর সব দায়িত্ব পড়ল।

বললেন, "বেশ অসুবিধেতেই পড়া গিয়েছিল। তার উপর কলকাতায় নিজেদের বাড়ি থাকা সত্ত্বেও ভাড়াবাড়িতে থাকতে হল; কেননা, আমাদের বাড়িতে ভাড়াটে ছিলেন আগে থেকেই। বাড়িভাড়া পাওয়া যেত মাসে হয়তো পাঁচ টাকা। এইভাবে টানাটানির মধ্যে জীবন আরম্ভ করা গেল।"

ছাত্রজীবনও আরম্ভ হল সেই সঙ্গে। তাঁর বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। প্রথমে অন্য দু-একটি স্কুলে কয়েক বছর পড়ে অবশেষে হিন্দু স্কুলে এসে ভর্তি হলেন অষ্টম মান শ্রেণীতে। ১৯০৮ সালে এনট্রান্স দেবার কথা ছিল; কিন্তু বয়স কম থাকায় পর-বৎসর, অর্থাৎ ১৯০৯ সালে, এনট্রান্স পাস করেন। এ সময়ে হয়তো তাঁর বয়স এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বললেন, "এনট্রান্সে আমি হই ফিফথ্, জামতারা স্কুলের দুটি ছাত্র ফার্স্ট

ও থার্ড হয়েছিল। এদের সঙ্গে পরে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়— এদের একজন থাকত শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে, তার বাড়িতে খুব যেতাম।"

হিন্দু স্কুল থেকে পাস করে ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বললেন, "ওটা ছিল যেন একটা নিয়ম। হিন্দু স্কুল থেকে পাস করে প্রেসিডেন্সিতেই ভর্তি হতে হয়— এই রকমই আমরা জানতাম।"

একটু থেমে হেসে বললেন, "প্রেসিডেন্সিতে এসে বিপদে পড়ে গেলাম। তখন ওখানে তিনজন সাহেব প্রফেসার। এঁদের কোন্‌টি যে কে, রোজ গোলমাল হয়ে যেত। সব সাহেবের মুখ আমাদের চোখে একই রকম ঠেকত।"

এই গোলমাল আর বিপদ ডিঙিয়ে তিনি এফ. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করলেন। এই সময় থেকেই তাঁর জীবনে দীপ্তি দেখা দিতে শুরু করল বলা যায়। এই দীপ্তি ক্রমশ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল। ১৯১৩ সালে গণিতে অনার্স-সহ তিনি প্রথম-বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বি. এ. পাস করলেন। বি. এ. পাস করে তিনি প্রেসিডেন্সিতেই মিশ্র-গণিতে এম. এ. পাঠ শুরু করেন। তার পর ১৯১৫ সালে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাস করেন।

১৯৫৩ সালের ২রা মে, ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ১৯এ বৈশাখ, শনিবার, বেলা দুপুর। সায়ান্স কলেজের সুপ্রশস্ত ঘরে বসে তাঁর কথা শুনছি। বৃহৎ টেবিলের চারধারে বসে আছেন কয়েকজন প্রবীণ শ্রোতা। তাঁদের মধ্যে একজন সত্যেন্দ্রনাথের প্রায়-সমবয়সী, কিন্তু তিনিও সত্যেন্দ্রনাথের প্রথম অধ্যাপক-জীবনের ছাত্র— মাত্র এক বছর নাকি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তিনি পড়েছেন ১৯২০ সালে। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে এই কথা নিয়ে একটু পরিহাস করলেন।

বললেন, "এম. এ. পাস করার পর ভাবছি কী করা যায়। একটা কাজকর্ম সংগ্রহ করা দরকার। তখন সায়ান্স কলেজের এই বিল্ডিং সবে উঠেছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর কেমিস্ট্রির ডিপার্টমেণ্ট নিয়ে তখন এখানে আছেন। এতে সকলের ধারণা হয় যে, সমস্ত বিল্ডিংটাই বুঝি কেমিস্ট্রির জন্যে হয়েছে।

কিন্তু আমরা এখানে এসে অনেকটা হানাই দিলাম। কিছু দিন আগে স্যর্ আশুতোষ আমাদের ডেকেছিলেন। তাঁকে বললাম, 'এখানে ফিজিক্সের ডিপার্টমেণ্টও তো খোলা যায়।' তিনি বললেন, 'কে পড়াবে। তোরা পারবি?' বললাম, 'পারব।' আশুতোষ বললেন, 'তার আগে তাহলে তোদের এক বছর পড়ে নিতে হবে।' এই বলে তিনি একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করলেন। আমরা এসে ঢুকলাম এখানে। কী উৎসাহ তখন। এইসব ঘর নিজে হাতেই মাপজোপ করে ফিজিক্সের ডিপার্টমেণ্ট তৈরি করেছি।"

নিজে হাতে গড়া সেই ডিপার্টমেণ্টের এখন তিনি প্রধান— হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব ফিজিক্স, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রথমজীবনে এসে যেখানে গড়েছিলেন তাঁর তপস্যার কেন্দ্র, জীবনের শেষের দিকে এসে পুনরায় তাকেই করেছেন সাধন-কেন্দ্র। যে জিনিস 'যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে' সেই জিনিস প্রত্যহ তিনি দান করে করে পূর্ণ থেকে পূর্ণতর করে তুলছেন তাঁর ভাণ্ডার।

১৯২১ সাল পর্যন্ত তিনি এইখানে ছিলেন। তার পর যান ঢাকায়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে। ষাট লাখ টাকা ঢেলে গড়ে তোলা হচ্ছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়। কর্তৃপক্ষের হাতে অনেক টাকা, তাই মোটা টাকার গ্রেডে নেওয়া হচ্ছে অধ্যাপক। সত্যেন্দ্রনাথ পদার্থবিজ্ঞানের রীডার-পদ নিয়ে ১৯২১ সালে ঢাকায় গেলেন। ওদিকে দালান তুলতেই অনেক টাকা খরচ হয়ে গেল; তখন কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, তাঁদের পুরানো স্কিম তাঁরা সংশোধন করবেন। গ্রেড কমিয়ে দেওয়া হবে। সত্যেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য অধ্যাপক এতে রাজি হলেন না। তাঁরা বললেন যে, যাঁদের নতুন নেওয়া হবে, তাঁদের এই নতুন স্কিম অনুযায়ী নেওয়া হোক, পুরাতনেরা পুরাতন গ্রেডেই থাক্। কিন্তু তা নাকি সম্ভব নয়। তাই, চারদিক বজায় রেখে সত্যেন্দ্রনাথকে একটা প্রস্তাব দেওয়া হল, বলা হল, সংশোধিত গ্রেড তিনি গ্রহণ করুন, কর্তৃপক্ষ নিজেরা খরচ করে তাঁকে ইউরোপে পাঠাবেন। শুভ প্রস্তাব। সত্যেন্দ্রনাথ রাজি হলেন। এদিকে কর্তৃপক্ষ হুঁশিয়ার। খরচপত্র করে যাঁকে তাঁরা বিদেশে

পাঠাচ্ছেন, বলা যায় না, তাঁর 'প্রবাসে দৈবের বশে জীব-তারা যদি খসে এ-দেহ আকাশ হতে', তাহলে তো খেদের অন্ত থাকবে না, সব খরচপত্র ভস্মে ঘী ঢালারই অনুরূপ হবে; তাই তাঁরা সত্যেন্দ্রনাথের জীবন বীমা করালেন, প্রিমিয়াম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষই দেবেন এবং অঘটন কিছু ঘটলে টাকাটাও পাবেন বিশ্ববিদ্যালয়। এই হল রফা। জীবনবীমা করার সময় তাঁর প্রকৃত বয়স জানা দরকার হল— তাঁর পিতা জানালেন তাঁর জন্ম ১৮৯৪ সালে, ১৩০১ বঙ্গাব্দ। তাঁর বিদেশযাত্রার দিন আগতপ্রায়। এমন সময় জার্মানী থেকে বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনের কাছ থেকে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে একটা চিঠি পেলেন। তখন ১৯২৪ সাল।

বললেন, "এতে আমার খুব সুবিধে হয়ে গেল। সেই চিঠি কর্তৃপক্ষকে দেখালাম। আমার বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা আরও পাকা হল। আমার একটা পেপার জার্মান ভাষায় অনুবাদিত হয়ে সেখানকার একটা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আইনস্টাইন সেই পেপারটি পড়ে খুশি হন এবং আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে ওই চিঠি দেন।"

১৯২৪ সাল। তিনি বিদেশে গেলেন। প্রথমে গিয়ে নামলেন ফ্রান্সে, প্যারিসে। এখানে সিলভাঁ লেভির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হল। লেভি তখনও শান্তিনিকেতনে আসেননি, কিন্তু ফরাসি-প্রবাসী অনেক ভারতীয়ের সঙ্গে তখন তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠপরিচয়, বৈজ্ঞানিক দেবেন্দ্রমোহন বসু এঁদের অন্যতম। এই পরিচয়ের সূত্রেই সত্যেন্দ্রনাথেরও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়।

বললেন, "যেসব বৈজ্ঞানিকের তখন খুব নাম ও প্রতিষ্ঠা তাঁদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে খুব আগ্রহ হল। সিলভাঁ লেভির কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে দেখা করলাম মাদাম কুরীর সঙ্গে। কুরী তখন বৃদ্ধা। বৃদ্ধরা স্বভাবতঃই কথা একটু বেশি বলেন। কুরী আমাকে পেয়েই অনর্গলভাবে কথা বলতে লাগলেন। বললেন, আমি যদি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে ইচ্ছা করে থাকি তাহলে সর্বপ্রথম আমাকে ফরাসি ভাষা শিখে নিতে হবে, কেননা তা না হলে তাঁর কথা আমি বুঝতে পারব না, আমার কথাও তিনি বুঝতে পারবেন না— এতে কাজের ভীষণ অসুবিধে হবে। তিনি এমনভাবে একটানা

বলে যেতে লাগলেন যে, তার মাঝে একটু ফাঁক পেলাম না যে বলি, ফরাসি ভাষা আমি জানি।"

ফরাসি ভাষা তখন সত্যেন্দ্রনাথের ভালোভাবেই জানা ছিল। যখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র তখন ইউনিভার্সিটির কাছে ফরাসি ভাষা শেখার একটা ক্লাস হত, এখানে তিনি নিয়মিত যেতেন। তার পরেও এ-ভাষা চর্চা করেছেন। শ্যামবাজারের মোড়ে এক ফরাসি দম্পতি থাকতেন, তাঁরাও ফরাসি শেখাতেন, সত্যেন্দ্রনাথ এঁদের কাছেও ফরাসি শিখেছেন। এইভাবে ভাষা তাঁর রপ্ত হয়ে যায়।

বললেন, "তার উপর আমি তো সবুজপত্রের দলের একজন ছিলাম। যদিও লিখিনি কখনো। সেই সূত্রে প্রমথ চৌধুরীর লাইব্রেরিতে বসে বিস্তর ফরাসি বই পড়েছি। কিন্তু দেখ, মাদাম কুরীকে এই কথাটা জানাবারই সুযোগ পেলাম না।"

ফ্রান্স থেকে তিনি যান জার্মানিতে। সেখানে গিয়ে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় খুব। তাঁর দৌলতে, সত্যেন্দ্রনাথ যেন সগর্বে জানালেন, জার্মানিতে অনেক কিছু দেখার সুযোগ তিনি পেয়েছেন। যেসব জায়গায় সাধারণের এবং বিদেশীর প্রবেশ নিষেধ এমন অনেক সরকারি দপ্তরের ভিতরে গিয়ে তিনি দেখে এসেছেন সব।

বললেন, "আর পেয়েছি বই। আইনস্টাইনের লেখা একটা চিঠি নিয়ে ওখানকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে যখন খুশি এবং যে বই খুশি নিয়ে আসতে পেরেছি। তিনি সে দেশের একজন অধ্যাপক মাত্র, কিন্তু তাঁর একটা চিঠিকেই সে দেশের গবর্নমেণ্ট কতটা মর্যাদা দিত— দেখে খুব ভালো লাগত।"

একটু থেমে কৌটো থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে বললেন, "আমাদের ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে কিছুদিন আগে আমি একটা বই চেয়েছিলাম। তাঁরা জানালেন যে, এটা রেয়ার বই, ইশু করার নিয়ম নেই। আর, জানো তো, আমাদের এই ন্যাশনাল লাইব্রেরির গবর্নিং বডির আমি একজন মেম্বার।"

তাঁর এ কথায় কোনো আক্ষেপ বা অনুযোগের সুর ছিল না। কিন্তু তাঁর কথাটা শুনে আমার মনের মধ্যেই আক্ষেপ আর অনুযোগ গুঞ্জন

করে উঠল। যে আসনে একদা আসীন ছিলেন আচার্য হরিনাথ দে, যাঁর মত বহুভাষাবিৎ সুপণ্ডিত পাওয়া দুষ্কর, যিনি নিজেই ছিলেন একটা গ্রন্থাগারের অনুরূপ, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যাঁকে বলেছেন 'সেকেন্দ্রিয়ার গ্রন্থশালা', এখন সে আসনে বসার উপযুক্ত লোক নেই। আমাদের জীবনের মান সর্বক্ষেত্রেই কতটা নেমে গিয়েছে, তাই মনে হল। এইভাবে চলতে থাকলে ন্যাশনাল লাইব্রেরি হয়তো শেষ-বেশ গ্রন্থশালা আর থাকবে না, হয়ে উঠবে বইয়ের একটা বিরাট গুদাম মাত্র।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বিশ্ববিখ্যাত একজন বৈজ্ঞানিক। কিন্তু তিনি কেবল বৈজ্ঞানিক নন। কয়েকটি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান-অর্জনের স্পৃহা তাঁর প্রবল। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ যৌবনকাল থেকে, এই অনুরাগের জন্যই সবুজপত্র-গোষ্ঠীর মধ্যেও তাঁকে পাওয়া গিয়েছে। ল্যাবরেটরির সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যেই তিনি নিজেকে সর্বদা আবদ্ধ রাখেননি। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন তাই চারদিকে নূতন অভিজ্ঞতা খুঁজে বেড়িয়েছে।

বলেছি, তাঁর মেজাজ বৈঠকী মেজাজ। তাস ও পাশায় তাই তাঁর আকর্ষণ খুব বেশি। দর্শন সাহিত্য সুকুমার-শিল্প ও সংগীতের প্রতিও তাঁর আকর্ষণ কম নয়। বাল্যকালে তাঁর সেতার বাজাবার অভ্যাস ছিল।

পদার্থবিজ্ঞানে গাণিতিক যুক্তি প্রয়োগই অধ্যাপক বসুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। বসু-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্ ব'লে যে পদ্ধতিটি বিশেষভাবে পরিচিত সেই বসু-স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় দান। ১৯২৪ সালে প্ল্যাঙ্কস্ ল অ্যাণ্ড দি লাইট কোয়ান্টাম হাইপথেসিস্ নামে তাঁর যে পেপারটি প্রকাশিত হয়, এবং আইনস্টাইনের দৃষ্টি সর্বপ্রথম পড়ে যার উপর, সেই পেপারটিই তাঁকে কেবল ভারতবর্ষে নয়, ইউরোপেও প্রখ্যাত করে তোলে এবং তিনি পৃথিবীর প্রথমশ্রেণীর বিজ্ঞানীদের অন্যতম রূপে পরিগণিত হন। এই সময়ে যখন তিনি ইউরোপে যান, তখন বহু গণ্যমান্য বিজ্ঞানী তাঁকে অভিনন্দন জানান। তাঁরা আরও বিস্মিত হন, যখন তাঁরা জানতে পারেন যে, এমন-একটি গুরুত্বপূর্ণ পেপারের যিনি রচয়িতা তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সের একজন যুবক মাত্র।

তাপ পেলে সব জিনিসেরই আয়তন বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ ভিন্ন ধাতুতে গড়া। এই আন্তরিকতার উত্তাপে এবং অভিনন্দনের তাপে তাঁর আয়তন বাড়্‌ল না, তিনি সমান বিনয়ী সমান নম্র সমান নির্বিকার এবং সমান বৈঠকীই রয়ে গেলেন।

তাপের দ্বারা আয়তন বৃদ্ধি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা বিজ্ঞান ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট দান। একটা লোহার পাত উত্তপ্ত করলে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে সেটা বেড়ে যায়। কিন্তু তার এই বৃদ্ধিটা ঘটে কী করে? তাপে কি তাহলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু ফেঁপে ওঠে? ছোলা জলে ভেজালে সেগুলি যেমন মোটা হয়, সেই রকম? তা নয়, অণুরা স'রে যায় তফাতে তফাতে। সব অণু নাকি সমান সমান দূরে সরে দাঁড়ায় না; এর মধ্যেও নাকি ভেদ আছে। অণুরা স'রে দাঁড়ায় এবং তাদের মধ্যে একটা গতির বৃদ্ধি সঞ্চার হয়, এইজন্যে একে বলা হয় থারমোডাইনামিক্স। সত্যেন্দ্রনাথের গবেষণা এই থারমোডাইনামিক্সের প্রসারের পথে অনেক সহায়তা করেছে। আইনস্টাইন সত্যেন্দ্রনাথের এই পেপার অনুবাদ করেছেন এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথের এই নূতন গবেষণার পূর্বে এই পদ্ধতিটি ম্যাক্সওয়েল-বল্‌জম্যান স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ নামে পরিচিত ছিল— এই বিজ্ঞানীদ্বয় পদার্থের অণুকে একেবারে পৃথক পৃথক ভাবে ধরতেন, যেন তাপ পেলে অণুগুলি আলাদা আলাদা ভাবে তাদের উত্তপ্ত আচরণ আরম্ভ করে দেয়। সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নূতন পদ্ধতিতে অণুর এই স্বাতন্ত্র্যটি অস্বীকার ক'রে দেখালেন যে, এরা এক-একটা গুচ্ছে ঘোরাফেরা করে, একেবারে স্বতন্ত্র ও একক ভাবে নয়, অণুরও ক্ষুদ্র একটি অংশ যে প্রোটন— তিনি তার উপর তাঁর এ পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনলেন বলা যায়।

এর পর বিজ্ঞানীদ্বয় ফেরমি ও ডিরাক অধ্যাপক বসুর উদ্ভাবিত এই সূত্র ধ'রে কাজ আরম্ভ করলেন। তাঁরা তাপের প্রভাব নিয়ে গবেষণা না ক'রে করলেন আলোর প্রভাব নিয়ে। অধ্যাপক বসুর সূত্রটি তাঁরা আলোর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখলেন যে, সব ক্ষেত্রে সমান ফল ফলছে না। কোনো-একটি পদার্থ থেকে আলো যখন আমাদের চোখে এসে পৌঁছয়, তখন কি জলের মত আলোর একটা ধারা তৈরি হয়ে আমাদের চোখে এসে ধাক্কা দেয়, না,

কতকগুলি অণুতে নূতন কাঁপন শুরু হওয়ায় আলোর উৎপত্তি হয়? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, অণুতে অণুতে নূতন কম্পন জাগে, সেই কম্পন হয়ে ওঠে আলো। ফেরমি ও ডিরাক এই অণু নিয়ে কাজ করলেন। তাঁরা দেখলেন, অধ্যাপক বসুর পদ্ধতি জোড়-সংখ্যক বস্তু সংখ্যায় (even mass number) ঠিক ঠিক খাটছে, বিজোড় সংখ্যায় নয়। যে যে ক্ষুদে অণুতে অধ্যাপক বসুর সূত্রটি খাটছে বৈজ্ঞানিক ডিরাক তাঁর নবরচিত গ্রন্থে অধ্যাপক বসুর নাম অনুযায়ী সেই সেই ক্ষুদে অণুর নাম দিয়েছেন— বোসোন।

বিদেশে সফর শেষ ক'রে তিনি ফিরে আসেন। ঢাকায় যান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি রীডারের পদ থেকে ক্রমশ পদার্থবিজ্ঞান-বিভাগের প্রধান হন— হেড অব দি ডিপার্টমেণ্ট অব ফিজিক্স। সেখানেই ছিলেন অনেকদিন। তারপর ১৯৪৫ সালে ফিরে আসেন কলকাতায়। কলকাতার বিজ্ঞান-কলেজই হয় তার কর্মকেন্দ্র।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পড়ে। ১৯৪৪ সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসের সাধারণ সভাপতি নির্বাচিত হন; ১৯৪৮-৫০ সালে ভারতের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়ান্সের চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৫১ সালে তিনি ইউনেস্কোর একটি জরুরি কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য প্যারিসে যান। বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রচার ও প্রসারের জন্য গঠিত বঙ্গীয়-বিজ্ঞান-পরিষদের তিনি সভাপতি; বাংলার জনগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিতরণের উদ্দেশ্যে তাঁর উদ্যোগে 'জ্ঞান-বিজ্ঞান' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকায় মাঝে-মাঝে তিনিও প্রবন্ধাদি লেখেন; বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলি অতি সহজ ও সরলভাবে ব্যক্ত করাই তাঁর রচনার বিশেষত্ব।

সাধারণত তাঁর রচনার মধ্যে কোনো জটিলতা থাকে না। তাঁর গবেষণামূলক পেপারেও এই বিশেষত্ব দেখা যায়। তাঁর এইসব রচনার দ্বারা কেবল যে ছাত্রেরাই উপকৃত হন এমন নয়, যাঁরা স্কলাররূপে খ্যাত হয়েছেন তাঁরাও সত্যেন্দ্রনাথের রচনা থেকে অনেক উপকার পেয়েছেন এবং গবেষক-ছাত্ররা পেয়েছেন পথনির্দেশ।

১৯৫৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ ইউরোপ-গমন করেন। আপেক্ষিক তত্ত্বের কতকগুলি জটিল গাণিতিক সমীকরণের পূর্ণ সমাধান করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এই বিষয়ে তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে আইনস্টাইন ও ডাবলিনের অধ্যাপক স্রডিঞ্জারের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ হয়। তাঁর এই গবেষণা-বিষয়ে লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ বিদেশের বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক স্রডিঞ্জার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, আপেক্ষিক তত্ত্বে এমন কতকগুলি জটিল গাণিতিক সমীকরণ আছে যার পূর্ণ সমাধান প্রায় অসম্ভব। অধ্যাপক বসু সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

বুডাপেস্ট জেনেভা প্যারিস জুরিখ প্রাগ ইত্যাদি স্থানে গিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিকগণের সঙ্গে তাঁর এই গবেষণা-বিষয়ে আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন ল্যাবরেটরি পরিদর্শন করেন।

১৯৫৫ সালে ফ্রান্সের কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইনডাস্ট্রিয়াল রিসার্চের আমন্ত্রণে সত্যেন্দ্রনাথ ফ্রান্সে গিয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটি তাঁকে ফেলো নির্বাচিত করেছেন। আনুষ্ঠানিক ভাবে এই ফেলোশিপ গ্রহণের জন্যে তিনি প্যারিস হয়ে লণ্ডন যান।

ইংলণ্ডে দুটি উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয় সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে। এর একটি হচ্ছে জন নেপিয়ারের (১৫৫০-১৬১৭) লগারিদ্‌ম্‌, অপরটি উইলিয়ম হার্ভের (১৫৭৮-১৬৫৭) মানবদেহে রক্তসঞ্চালন। এ ছাড়াও সৌরজগৎ সম্বন্ধে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩), গ্যালিলিয়োর (১৫৬৪-১৬৪২), ও কেপলারের (১৫৭১-১৬৩০) আবিষ্কার-সমূহ ইংলণ্ডের শিক্ষিত সমাজে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করে। এই রকম যখন আবহাওয়া, সেই সময়ে, ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি, লণ্ডনের এক কাফিখানায় বসে কয়েকজন উৎসাহী যুবক স্থির করলেন, তাঁরা এইসব নতুন আবিষ্কার নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করবেন। রয়াল সোসাইটির সূত্রপাত এই দিন থেকে। এর কিছুদিন পরে অক্সফোর্ডেও অনুরূপ একটি আলোচনা-চক্র গড়ে ওঠে। বছর কয়েক পরে অক্সফোর্ডের আলোচনা-চক্রের সভ্যদের লণ্ডনে আসতে হয়।

এর ফলে লণ্ডনের মূল চক্রটির শক্তিবৃদ্ধি হল। এবার আনুষ্ঠানিক ভাবে সমিতি-স্থাপনের কথা উঠল। দ্বিতীয় চার্লসের পৃষ্ঠপোষকতায় দুই বছর পূর্বে গঠিত সমিতি রাজকীয় সনদ লাভ করল ১৬৬২ সালে। সমিতির নাম হল—দি রয়াল সোসাইটি অব লণ্ডন ফর প্রোমোটিং ন্যাচরাল নলেজ। কিন্তু পুরো নামটি সকলের জানা নেই, রয়াল সোসাইটি নামেই এর পরিচয়। এই সোসাইটির দু রকম সভ্য আছে— সাধারণ সভ্য ও বিদেশী সভ্য। বিদেশী সভ্যের সংখ্যা খুব কম। ভারত স্বাধীনতা-লাভের পূর্বে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে এগারো জন বিভিন্ন সময়ে ফেলো নির্বাচিত হন, ভারত ইংলণ্ডের অধীন থাকায় তাঁরা সাধারণ সভ্য রূপেই নির্বাচিত হন। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতালাভের পর স্থির হল, ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের আর সাধারণ সভ্য করা চলে না। এইজন্য দশ বছর কোনো ভারতীয় বৈজ্ঞানিক এই সম্মান পান না। অবশেষে সোসাইটির কর্মকর্তারা স্থির করেন, ভারত যখন কমন-ওয়েলথ-ভুক্ত দেশ তখন আর ঐ বাধানিষেধের প্রয়োজন নেই। মাঝখানে এই বাধা না ঘটলে সম্ভবত সত্যেন্দ্রনাথ অনেক পূর্বেই এই গৌরব লাভ করতেন।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর দানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৫৪ সালে ভারত-সরকার তাঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথকে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছেন। এবং ১৯৫৮ সালে তাঁকে এমারিটস প্রফেসর রূপে মনোনীত করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

১৯৫৬ সালের ১লা জুলাই সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (ভাইস-চ্যান্সেলার) পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের বিজ্ঞান ও বঙ্গভাষার যুগপৎ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিজ্ঞানগ্রন্থ 'বিশ্বপরিচয়' উৎসর্গ করেছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে।

সত্যেন্দ্রনাথ এখনো কঠোর শ্রম ক'রে থাকেন। পদার্থবিদ্যার তিনি অধ্যাপক, কিন্তু গণিত ও রসায়নের গবেষক-ছাত্ররাও তাঁর কাছ থেকে সাহায্য ও সহায়তা লাভ ক'রে থাকেন। তাঁর স্বভাবের মধ্যে এমন অমায়িকতা এবং

হৃদ্যতা আছে যে, ছাত্রদের কাছে তিনি প্রিয় অধ্যাপকরূপে গণ্য হতে পেরেছেন।

তিনি রাষ্ট্রপতির মনোনয়নে কাউন্সিল অব স্টেটের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

বসু ও আইনস্টাইন নাম একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়ে থাকে, আধুনিক ফিজিক্সের যে-কোনো পাঠ্যপুস্তকে বসু-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিকস্‌এর উল্লেখ আছে। এইজন্যে সত্যেন্দ্রনাথকে বলা হয়ে থাকে বাংলার আইনস্টাইন।

বললেন, "বাল্যজীবনের কথা তো বললাম। আমার আর-একটা পরিচয় আছে— আমি আইনস্টাইনের ছাত্র।"

শ্রদ্ধা যে করতে না জানে, সে কারো শ্রদ্ধা পায় না। নিজের অধ্যাপকের প্রতি তাঁর তাই গভীর শ্রদ্ধা আছে, এইজন্যেই তিনিও সম্ভবত তাঁর ছাত্রদের এবং আমাদের মত সাধারণের কাছে এতটা শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছেন।

দশ-বারো জন ছাত্র এসে ঘিরে দাঁড়াল তাঁকে। তিনি ধীরে ধীরে উঠলেন। তাদের সঙ্গে চললেন। ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দা, লম্বা বারান্দা পার হয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ির গায়ে ছাত্র-পরিবৃত হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "বলেছিলাম না, আমার জীবনে কোনোই বিশেষ উপকরণ নেই। এখন দেখ, এ দিয়ে যদি তোমার কোনো কাজ হয়।"

তিনি ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলেন। আমি নেমে এলাম সিঁড়ি বেয়ে নীচে। বিজ্ঞান-কলেজের বড় গেট পার হয়ে বড় রাস্তায়। বৈশাখের রোদ লেগে পীচের রাস্তা গলে গেছে। মন গলাতে রোদ দরকার হয় না, দরকার হয় অকপট আন্তরিকতা। সেই আন্তরিকতার এলাকা থেকে এসে দাঁড়ালাম উত্তপ্ত রৌদ্রে।

রচিত গ্রন্থাবলী

Warmegleichgewicht im Stralungsfeld nei Answesenheit von Materie. (Heat Equilibrium in Radiation Field in Presence of Matter.)

Zeitschrift fur Physik. 27. 384. 1924.

Plancks Gasetz und Lichtquantan hypothese. (Planck's Law & the Light Quantum Hypothesis).

Zeitschrift fur Physik. 26. 178. 1924.

Les identites de divergence dans la nouvelle, theorie unitarie.

Comptes rendus des seances de l' Academic des Sciences t. 236. p. 1333. seance du 30 mars 1953

The Affino connection in Einstein's New Unitary Field Theory,

Annals of Mathematics.

যদুনাথ সরকার ॥ এই গ্রন্থের প্রায় অর্ধেক মুদ্রিত হওয়ার পর আচার্য যদুনাথ সরকার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫, ১৯ মে ১৯৫৮, সোমবার, তাঁর কলকাতার লেক টেরেসের গৃহে করোনারি থ্রম্বসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে অকস্মাৎ লোকান্তরিত হন।

যদুনাথের শেষজীবন শোকসন্তপ্ত জীবন। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্বৃত্তের হাতে নিহত হন; এবং তাঁর দ্বিতীয় পুত্র, কনিষ্ঠ কন্যা, ও দুই জামাতাও অল্পকালের ব্যবধানে মারা যান।

সম্ভবত শান্তিলাভের বাসনাতে তিনি তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থাদি ও পুথিপত্রের মধ্যে আত্মসমাহিত ছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাঁর বিরাট গ্রন্থসংগ্রহ জাতির উদ্দেশ্যে দান করেছেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এগুলি 'যদুনাথ সরকার সংগ্রহ'-নামে পৃথক ভাবে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ॥ ১৯৫৮ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক সম্বর্ধিত হন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য ॥ ১৯৫৮ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ভারত সরকার ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে বিশেষ বৃত্তি দ্বারা সম্মানিত করেছেন। তাঁদের সঙ্গে ইনিও এই সম্মান লাভ করেন।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য। শ্রীরাজশেখর বসু। শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ॥ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে ১৯৫৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের অন্যান্য প্রদেশের এবং ভারতের বাহিরের যেসব মনস্বীকে ডক্টরেট উপাধি দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে এঁরা তিনজনও আছেন।

এই উপলক্ষ্যে আমাদের জীবনী-তালিকার অন্তর্গত আর যাঁরা এই উপাধি পেয়েছেন তাঁদের বিষয়ে গ্রন্থমধ্যে যথাস্থানে উল্লিখিত আছে, যথা, শ্রীনন্দলাল বসু, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী, ও শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু।

শ্রীনন্দলাল বসু ॥ বিশ্বভারতী থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি ১৯৫১ সাল থেকে আজীবন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারিটস প্রফেসর নিযুক্ত হয়েছেন। ১৯৫৫ সালে ভারত-সরকার এঁকে 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেছেন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ॥ ১৯৫৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে এমারিটস প্রফেসর রূপে নির্বাচিত করেছেন।

এই বৎসরই ইনি নূতন সম্মানে ভূষিত হন। ভারতসরকার কর্তৃক জাতীয় অধ্যাপক পদে বৃত হন। স্বনির্বাচিত যে-কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত থেকে গবেষণাকার্যে আত্মনিয়োগ করা হচ্ছে জাতীয় অধ্যাপকের কাজ। ইতিপূর্বে এই সম্মান লাভ করেছেন ডক্টর সি ভি. রমণ।

উল্লেখপঞ্জী

প্রথম প্রকাশ

জীবনকথাগুলি প্রথমে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এখানে প্রথম প্রকাশের তারিখ দেওয়া হল—

আনন্দবাজার পত্রিকা

যোগেশচন্দ্র রায়	২৬ আগস্ট ১৯৫২॥১০ ভাদ্র ১৩৫৯
চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য	১৩ জানুয়ারি ১৯৫৩॥২৯ পৌষ ১৩৫৯
বসন্তরঞ্জন রায়	১৮ নভেম্বর ১৯৫২॥২ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯
শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	২১ অক্টোবর ১৯৫২॥৪ কার্তিক ১৩৫৯
যদুনাথ সরকার	৪ নভেম্বর ১৯৫২॥১৮ কার্তিক ১৩৫৯
শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরানী	৩০ জুন ১৯৫৩॥১৬ আষাঢ় ১৩৬০
শ্রীসুনয়নী দেবী	১৪ জুলাই ১৯৫৩॥৩০ আষাঢ় ১৩৬০
শ্রীসরলাবালা সরকার	৪ আগস্ট ১৯৫৩॥১৯ শ্রাবণ ১৩৬০
শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ	২ জুন ১৯৫৩॥১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০
হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩॥১৫ ভাদ্র ১৩৬০
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩॥২৯ ভাদ্র ১৩৬০
শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য	৭ অক্টোবর ১৯৫২॥২১ আশ্বিন ১৩৫৯
শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪ নভেম্বর ১৯৫৩॥৮ অগ্রহায়ণ ১৩৬০
শ্রীক্ষিতিমোহন সেন	২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৫২॥৭ আশ্বিন ১৩৫৯
শ্রীরাজশেখর বসু	৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫২॥২৪ ভাদ্র ১৩৫৯
অনুরূপা দেবী	১০ নভেম্বর ১৯৫৩॥২৪ কার্তিক ১৩৬০
শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়	২৪ মার্চ ১৯৫৩॥১০ চৈত্র ১৩৫৯
সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	৩০ ডিসেম্বর ১৯৫২॥১৫ পৌষ ১৩৫৯
শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু	১৮ আগস্ট ১৯৫৩॥১ ভাদ্র ১৩৬০
শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ	২৭ জানুয়ারি ১৯৫৩॥১৩ মাঘ ১৩৫৯
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগচী	১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩॥২৭ মাঘ ১৩৫৯
শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত	১৩ অক্টোবর ১৯৫৩॥২৬ আশ্বিন ১৩৬০
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার	২১ এপ্রিল ১৯৫৩॥৮ বৈশাখ ১৩৬০

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন	৭ এপ্রিল ১৯৫৩॥২৪ চৈত্র ১৩৫৯
শ্রীসুশীলকুমার দে	১৬ জুন ১৯৫৩॥২ আষাঢ় ১৩৬০
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৩॥১২ আশ্বিন ১৩৬০
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার	১০ মার্চ ১৯৫৩॥২৬ ফাল্গুন ১৩৫৯
শ্রীনীলরতন ধর	৫ মে ১৯৫৩॥২২ বৈশাখ ১৩৬০
মেঘনাদ সাহা	২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩॥১২ ফাল্গুন ১৩৫৯
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু	১৯ মে ১৯৫৩॥৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০

দেশ

শ্রীনন্দলাল বসু	২৮ নভেম্বর ১৯৫৩॥১২ অগ্রহায়ণ ১৩৬০

অপর দুইটি জীবনকথা

শ্রীবিধানচন্দ্র রায়

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই বইতে প্রথম মুদ্রিত হল।

সংযোজন

গ্রন্থটি মুদ্রিত হবার পর কিছুদিন গত হওয়ায় কিছু-কিছু তথ্য যোগ করার আবশ্যক দেখা দিয়েছে ; এবং অনেকে ইতিমধ্যে লোকান্তরিতও হয়েছেন। এখানে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হল—

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩ জানুয়ারি ১৯৫৯, ২৮ পৌষ ১৩৬৫, হরিচরণ পরলোকগমন করেন। লেখকের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ হয় শান্তিনিকেতনে এর কয়েকদিন আগে— ২৮ ডিসেম্বর ১৯৫৮ তারিখে।

যদুনাথ সরকার

১৯ মে ১৯৫৮, ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫, যদুনাথ পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীগণ তাঁর বিরাট গ্রন্থসম্ভার জাতির উদ্দেশে দান করেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এগুলি 'যদুনাথ সরকার সংগ্রহ' নামে পৃথক ভাবে রক্ষিত আছে।

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

১৯৫৮ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ-কংগ্রেস কর্তৃক সংবর্ধিত হন।

১২ আগস্ট ১৯৬০, ২৭ শ্রাবণ ১৩৬৭, ইন্দিরা দেবী পরলোকগমন করেন।

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'রবীন্দ্রস্মৃতি' ১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয়।

সুনয়নী দেবী

২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬২, ১১ ফাল্গুন ১৩৬৮, রাত্রি ১২টা ৩৫ মিনিটে সুনয়নী দেবীর মৃত্যু ঘটে।

সরলাবালা সরকার

১ ডিসেম্বর ১৯৬১, ১৫ অগ্রহায়ণ ১৩৬৮, সরলাবালা ইহলোক ত্যাগ করেন।

:হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ

ভারতের দশম বার্ষিক প্রজাতন্ত্র-দিবসে, ২৬ জানুয়ারি ১৯৬০, ভারত সরকার হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ মহাশয়কে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ অগস্ট তারিখে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের যে পাঁচজন মনীষীকে ভারতের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার দান করেন, হরিদাস তাঁদের একজন। একটি সনদ সহ একটি সম্মানসূচক পরিচ্ছদ এবং জীবৎকালে প্রতি বৎসর দেড় হাজার টাকা হচ্ছে এই পুরস্কার।

মহাভারতের যে নয়টি খণ্ড প্রকাশ বাকি ছিল ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তা প্রকাশ সম্পূর্ণ হয়।

মহাভারতের এই বাংলা অনুবাদ-কার্যের জন্য ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে শততম রবীন্দ্রজয়ন্তী বর্ষে হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুরস্কার লাভ করেন।

২৬ ডিসেম্বর ১৯৬১, ১০ পৌষ ১৩৬৮, হরিদাস পরলোকগমন করেন।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে জগত্তারিণী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেন।

বিধুশেখর ভট্টাচার্য

১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতপূর্তি উপলক্ষে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯৫৮ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারত সরকার ভারতের কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিতকে বিশেষ বৃত্তি দ্বারা সম্মানিত করেন; বিধুশেখর ছিলেন তাঁদের একজন।

৪ এপ্রিল ১৯৫৯, ২১ চৈত্র ১৩৬৫, বিধুশেখর ইহলোক ত্যাগ করেন।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রশতপুর্তি-বর্ষে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ সমাবর্তনে এঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দান করেন।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সংগীত-নাটক আকাদমির ফেলো নির্বাচিত হন।

২৮ জুলাই ১৯৬৩, ১১ শ্রাবণ ১৩৭০, বিষ্ণুপুরে ইনি পরলোকগমন করেন।

ক্ষিতিমোহন সেন

১৯৬১ সালে Hinduism নামে এঁর একটি ইংরাজি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১২ মার্চ ১৯৬০, ২৮ ফাল্গুন ১৩৬৬, ক্ষিতিমোহন ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাজশেখর বসু

রাজশেখরের পিতৃনিবাস নদীয়া জেলার উলা-বীরনগর। জন্মস্থান মাতুলালয়—বর্ধমানের বামুনপাড়া। পিতা চন্দ্রশেখর বসু সুপণ্ডিত ছিলেন, দার্শনিক তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন।

রাজশেখর প্রথম স্থান অধিকার করে রসায়নে এম. এ. পাস করেন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে।

১৯৫৫ সালে তিনি 'রবীন্দ্রস্মৃতি' পুরস্কার পান তাঁর 'কৃষ্ণকলি' গ্রন্থের জন্য।

১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবর্ষপুর্তিতে ডক্টরেট উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজশেখর-রচিত গ্রন্থতালিকায় এই তিনটি গ্রন্থ যোগ হবে—

চলচ্চিন্তা।	প্রবন্ধসংগ্রহ।	বঙ্গাব্দ ১৩৬৫
চমৎকুমারী।	গল্পসংগ্রহ।	বঙ্গাব্দ ১৩৬৬
পরশুরামের কবিতা।	কবিতাসংগ্রহ।	শকাব্দ ১৮৮২

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজশেখরকে ডক্টরেট উপাধি দান করেন। এই বৎসরই তিনি 'আনন্দীবাঈ' গ্রন্থের জন্য সাহিত্য-আকাদমির পুরস্কার পান।

২৭ এপ্রিল ১৯৬০, ১৪ বৈশাখ ১৩৬৭, রাজশেখরের মৃত্যু ঘটে।

বিধানচন্দ্র রায়

একটি সংশোধন: পৃ ১৭২, ছত্র ১৪—'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' স্থলে 'ভারতচন্দ্র রায় তাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্যে' হবে।

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের প্রজাতন্ত্রদিবসে বিধানচন্দ্র 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। এই বিষয়ে তিনি বলেন, "'রত্ন'টা তোরা নিয়ে যা, 'ভারত'টা আমারই থাক্।"

১ জুলাই ১৯৬২, ১৬ আষাঢ় ১৩৬৯, বিধানচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

শ্রীনন্দলাল বসু

বিশ্বভারতী থেকে অবসর গ্রহণের পর ১৯৫১ সাল থেকে আজীবন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমারিটস প্রফেসর নিযুক্ত হন। ১৯৫৫ সালে ভারত-সরকার 'পদ্মবিভূষণ' উপাধি দিয়ে ভূষিত করেন।

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

১৯৫৮ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক সংবর্ধিত হন।

মৃত্যু— ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩, ২৩ ভাদ্র ১৩৭০।

শ্রীদেবেন্দ্রমোহন বসু

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রশতপূর্তি-বর্ষে বিশেষ সমাবর্তনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন।

শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

১৯৫৯ সালের ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা-দিবসে রাষ্ট্রপতি ভারতবর্ষের যে সাতজন পণ্ডিতকে রাষ্ট্রীয় সম্মানপত্র দান করেন, গোপীনাথ তাঁদের একজন।

যোগেন্দ্রনাথ বাগচী

মৃত্যু— ৫ মে ১৯৬০, ২২ বৈশাখ ১৩৬৭।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত

অতুলচন্দ্রের জন্মতারিখ নিয়ে দুই-একটি পত্রিকায় কিছু আলোচনা হয়েছে, তাঁরা বলেছেন যে, এই গ্রন্থে মুদ্রিত তারিখটি ঠিক নয়। কিন্তু তাঁর জন্মতারিখ (১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ, ১২৯৪ বঙ্গাব্দ) অতুলচন্দ্রই আমাকে দেন। গ্রন্থটি প্রকাশের পরেও তিনি কিছুকাল জীবিত ছিলেন, এবং এই সময়ে তিনি এই গ্রন্থটি নিয়ে কয়েকবার আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন, কিন্তু ঐ তারিখ পরিবর্তনের কথা ওঠেনি। এই জন্যে এই গ্রন্থে তারিখটি পরিবর্তন করা হল না।
১৯৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতপূর্তি উপলক্ষে অতুলচন্দ্র ডক্টরেট উপাধি দ্বারা ভূষিত হন।
১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১, ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৬৭, রাত্রি ২টা ৫৫ মিনিটে অতুলচন্দ্র পরলোকগমন করেন।

সুরেন্দ্রনাথ সেন

৩০ অক্টোবর ১৯৬২, ১৩ কার্তিক ১৩৬৯, সুরেন্দ্রনাথ ইহলোক ত্যাগ করেন।
মৃত্যুর কিছুকাল আগে, ৬ জুন ১৯৬০ তারিখে, তাঁর গৃহে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থাদি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে সমর্পণ করেন। তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ৩৬২০। এর মধ্যে ২৩০৭টি ইউরোপীয়

ভাষায় এবং অবশিষ্টগুলি অধিকাংশ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় রচিত। এই সংগ্রহের মধ্যে ইতিহাস-গ্রন্থই সবচেয়ে বেশি— ৯৫১টি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৫৫ সালে ইনি 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ করেন, গ্রন্থমধ্যে এর উল্লেখ আছে। ১৯৬৩ সালে ইনি 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন।

শ্রীনীলরতন ধর

১৯৫৯-৬০ সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে নীলরতন মূল সভাপতি হন।

১৯৫৯ সালে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের গুণী-সংবর্ধনায় সংবর্ধিত।

এঁর রচিত গ্রন্থতালিকায় যোগ হবে—

জমির উর্বরতাবৃদ্ধির উপায়। ঐ ১৯৫৯

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

সত্যেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে—১৩০০ বঙ্গাব্দ।

১ জুলাই ১৯৫৬ তারিখে সত্যেন্দ্রনাথ বিশ্বভারতী বিদ্যালয়ের উপাচার্য-পদে অধিষ্ঠিত হন গ্রন্থ মধ্যে এর উল্লেখ আছে; ঐ পদে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এঁকে ডক্টরেট উপাধি দান করেন।

১৯৫৮ ডিসেম্বরে জব্বলপুরে অনুষ্ঠিত নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের ৩৪তম অধিবেশনে মূলসভাপতি-পদ অলংকৃত করেন।

এই বছরই, ১৯৫৮ সালে, ভারতসরকার কর্তৃক তিনি ভারতের জাতীয় অধ্যাপক-পদে বৃত হন।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রজন্মশতপূর্তি-বর্ষে বিশেষ সমাবর্তনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সত্যেন্দ্রনাথকে 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে ভূষিত করেন।